দেশ-দেশান্তর

নারায়ণচন্দ্র চন্দ

দেশ-দেশান্তর

নারায়ণচন্দ্র চন্দ

অশোক পুস্তকালয়
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ

৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, অশোক পুস্তকালয়ের পক্ষ থেকে শ্রীঅশোককুমার বারিক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৬৫।৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, নিউ মহামায়া প্রেসের পক্ষ থেকে শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না কর্তৃক মুদ্রিত।

মা ও তাঁর নাতনী জবা এবং হাস্নুকে

যা বলতে চাই

বিচিত্র এই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের লোকের বাস। তাদের আচার-ব্যবহারে, খাদ্যে, পরিচ্ছদে, বাসগৃহ-রচনায়, জীবন-যাপনে কত না পার্থক্য! অথচ সবাই নিজ নিজ পরিবেশে সুখেই আছে। প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তারা বসবাস করছে। জগৎ-জোড়া মানুষের সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে হ'লে তাদের দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হ'তে হবে। বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে কিশোরদের পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে এই বই লেখা।

স্বাধীনতা লাভের পর নব ভারত বিশ্বে রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থা জানা থাকলে তাদের সমস্যা ও ভারতের ভূমিকা বোঝা কতকটা সহজ হবে। এ বইতে তাই এশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধান প্রধান দেশ ও দেশবাসীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান, দেশের সম্পদ, জনসংখ্যা, জীবনযাপন-রীতি প্রভৃতির ভিতর দিয়ে বাস্তব পরিচয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। রাশিয়ার বিবরণ ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে দেবার পরিকল্পনা আছে। পরবর্তী খণ্ডে থাকবে ইউরোপ ও আমেরিকার কথা।

নব-প্রবর্তিত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবন-যাত্রা আলোচনার কথা আছে। প্রকৃতই, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অন্ততঃ মোটামুটি পরিচয় না থাকলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে পৃথিবী-জোড়া মানুষ যখন এক মানব-সমাজ গঠন করতে চলেছে, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও দেশবাসীর সঙ্গে পরিচয়ের ভিতর দিয়ে কিশোরদের মনের প্রসারতা বাড়ানো আবশ্যক। এই বিষয়টি এতদিন আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্য-সীমানার মধ্যে ছিল না। তার ফল যে ভাল হয়নি তাতে সন্দেহ নাই। বিশ্বের দেশগুলি সম্বন্ধে ছাত্রদের সাধারণ জ্ঞানের অল্পতা নিতান্তই শোচনীয়।

এই পুস্তকের কতকগুলি ছবি পুত্র নবম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ নয়নরঞ্জনের আঁকা। বিভিন্ন দেশের মানুষের জীবন-যাত্রার ছবি বাস্তব বিষয় অবলম্বনে সে এঁকেছে। এতে উৎসাহ দেবার জন্যই সেগুলির গুণাগুণের বিচার না ক'রে ছবিগুলি বইতে স্থান দেওয়া হয়েছে। যাদের জন্য লেখা তাদের কৌতূহল এবং পৃথিবীর মানুষকে জানার বাসনা জাগাতে পারলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করবো ॥

জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল
স্বাধীনতা দিবস
১৩৬৪

ন. চ.

সূচীপত্র

বসুন্ধরা

আমাদের এই জীবধাত্রী বসুন্ধরা বড়ই বিচিত্র! কোথাও তুষার-মুকুট-পরা পর্বতশৃঙ্গ নীল আকাশে মাথা উঁচু ক'রে যুগ যুগ ধ'রে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে; কোথাও বিস্তৃত শ্যামল মাঠ, তাতে যেন সবুজ মখমল বিছানো। কোথাও নিবিড় অরণ্য, তার মধ্যে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না, আবার কোথাও বৃক্ষলতা-তৃণ-শূন্য প্রান্তর; যতদূর চোখ যায় কেবল ধূধূ বালু। কোথাও নীল সমুদ্রের অশান্ত মাতামাতি, আবার কোথাও কেবল জমাট-বাঁধা বরফ; তরঙ্গরাশি যেন কার আদেশে মুহূর্তে নিশ্চল হ'য়ে গেছে!

সূর্যের অগ্নিময় দেহ থেকে জন্মলাভ ক'রে পৃথিবী বহু লক্ষ বৎসর শূন্যে আবর্তন করতে করতে ক্রমে শীতল হ'য়ে উদ্ভিদ ও জীবের বাসের উপযোগী হয়েছে। কত যুগ যুগ ধ'রে চলেছে জীবের ক্রম-বিকাশ। এ-সবই সম্ভবপর হয়েছে এইজন্য যে, সূর্যনন্দিনী ধরিত্রী নিয়মিত ছন্দোময়ভাবে রবি-প্রদক্ষিণ ক'রে চলেছে। পৃথিবীর মেরুদণ্ড একটি নির্দিষ্ট হেলানভাবে অবস্থান করার ফলে ধরাপৃষ্ঠে ঋতু-পরিবর্তন ঘটে; আবার এরই ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে দেখা দিয়েছে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানুষ তার বিচিত্র জীবনধারা গ'ড়ে তুলেছে। মানুষ পৃথিবীর যে অঞ্চলেই বাস করুক না, সে প্রকৃতির প্রভাবের বাইরে যেতে পারে না; মাটি, জল ও বাতাসের সঙ্গে তার জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। জলবায়ু নির্ধারণ করে মানুষের পরিচ্ছদ, খাদ্য, বাসগৃহ, জীবনযাপন-প্রণালী; জলবায়ু নির্ভর করে সূর্যকিরণ ও বৃষ্টিপাতের ওপর। এক কথায় বলা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা সেখানকার জলবায়ু এবং পারিপার্শ্বিক দ্বারাই পরিচালিত। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভিন্ন

রকমের জলবায়ু এবং পরিবেশ সেখানকার অধিবাসীদের খাদ্যে, পোষাক-পরিচ্ছদে, বাসগৃহে কেমন বৈচিত্র্য এনেছে তা লক্ষ্য করলে বিস্মিত হ'তে হয়। কল্পনায় আমরা পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে চললেম। আমাদের সঙ্গী হবে কে ?

বিভিন্ন মণ্ডল

পৃথিবীর মেরুদণ্ড সমতলের সঙ্গে ২৩½ ডিগ্রী কোণ ক'রে অবস্থান করে এবং সর্বদা এই অবস্থায় থেকে দৈনিক ২৪ ঘণ্টায় একবার পাক ঘোরে, আর ৩৬৫ দিন সোয়া ছয় ঘণ্টায় সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসে। নিজ মেরুদণ্ডের ওপর দৈনিক আবর্তনের ফলে হয় দিনরাত্রি ; সূর্য-প্রদক্ষিণের ফলে হয় ঋতু-পরিবর্তন। বিষুবরেখা থেকে উত্তরে ২৩½ ডিগ্রী কর্কট ক্রান্তি এবং দক্ষিণে ২৩½ ডিগ্রা মকর ক্রান্তি পর্যন্ত সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। এই অঞ্চল সূর্যের তাপ বেশী-মাত্রায় পাওয়ার ফলে উষ্ণ এবং এখানে বৃষ্টিপাত বেশী। এটা উষ্ণমণ্ডল।

কর্কট ক্রান্তির উত্তরে ও মকর ক্রান্তির দক্ষিণে ৬৬½ ডিগ্রা পর্যন্ত স্থানে সূর্যকিরণ পড়ে তেরচা ভাবে। এই অঞ্চলকে বলা হয় নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল। উত্তর গোলার্ধে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রী অক্ষাংশের উত্তরে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে এর দক্ষিণে মেরুবিন্দু পর্যন্ত স্থানে বৎসরে ছয় মাস সূর্যকিরণ পড়ে না এবং অন্য ছয় মাস সূর্য অস্ত যায় না। ছয় মাস একটানা রাত এবং ছয় মাস একটানা দিন। সূর্যকিরণ পড়ে খুবই তেরচা ভাবে—তাতে উষ্ণতা তীব্র হয় না। রাত্রিতে শীত হয় অত্যন্ত তীব্র। এই অঞ্চলকে বলে হিমমণ্ডল।

সূর্য থেকে যেমন পৃথিবীর উৎপত্তি, তেমনি সূর্যই জীবজগতের এবং উদ্ভিদজগতের পরিপোষক। যেখানে যে পরিমাণ সূর্যের তাপ সেখানে সেই পরিমাণে উষ্ণতা এবং সমুদ্রের অবস্থান অনুকূল থাকলে সেই পরিমাণ বৃষ্টিপাত।

ঘুরে দেখি নানা দেশ

প্রথম অধ্যায়

তুন্দ্রা অঞ্চল

রূপ-গন্ধ-শব্দময়ী পৃথিবীর সর্বশেষ উত্তর প্রান্ত থেকে মানস-যাত্রা সুরু করি। হিমমণ্ডল, চির-অচল হিমের আলয়। কবি বর্ণনা করেছেন—

মহামেরুদেশ, যেখানে লয়েছে ধরা
অনন্ত কুমারীব্রত, হিমবস্ত্রপরা,
নিঃসঙ্গ নিঃস্পৃহ, সর্ব-আভরণহীন।
যেথা দীর্ঘ রাত্রি-শেষে ফিরে আসে দিন
শব্দশূন্য সঙ্গীতবিহীন, রাত্রি আসে,
ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে
অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মত।

জল জমে বরফ হ'য়ে আছে। মাঝে মাঝে বরফের স্তূপ উঁচু পাহাড়ের মত, শুভ্র চোখ-ধাঁধানো। এগুলি ভাসমান; যতখানি ওপরে দেখা যায় তার আটগুণ রয়েছে জলের মধ্যে। ভাসতে ভাসতে এগুলো সাগরের দিকে চলে যায়, তারপর ক্রমে উষ্ণ জলের সংস্পর্শে এসে গলে মিলিয়ে যায় সাগরের সঙ্গে।

উত্তর-মেরুদেশ থেকে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে এসে দেখতে পাই এক বিশাল ভূখণ্ড, যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল ধবধপে সাদা; তুষারে ঢাকা গ্রীণল্যাণ্ড। গাছপালা, মাটির চিহ্ন নাই কোথাও। কোথাও সবুজ কিছু নজরে পড়ে না ব'লেই কি এর নাম দেওয়া শ্যামলভূমি! এখানে এস্কিমোদের বাস। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তারা এই হিমের রাজ্যে বাস করে। এখানে যা মেলে তাই তাদের জীবন-ধারণের উপকরণ।

দীর্ঘ ছয় মাস রাত্রি। এ সময় সূর্য দেখা না গেলেও অপূর্ব দীপ্তিময় মেরুজ্যোতির ঝালর আকাশে ঝলমল করে, অন্ধকার হাল্‌কা হ'য়ে যায়। শীতের সময় বরফের স্তূপ বড় বড় ইটের মত আকারে কেটে নিয়ে বানানো হয় গোলগম্বুজের মত ঘর। একটা সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। এ ঘরকে বলা হয় ইগ্‌লু। বাইরে জমাট বরফ কিন্তু ঘরের ভিতর অদ্ভুত রকম আরামদায়ক। মেঝেতে পুরু ক'রে চামড়া বিছানো, সীল মাছের চামড়া। গোলাকৃতি ছাদের গা দিয়েও চামড়া-মোড়া, যাতে চুইয়ে জল গায়ে না পড়ে। ঘরের মধ্যে মৃদু প্রদীপ জ্বলে। পাথর খুঁড়ে বাটির মত করা, তাতে সীলমাছ কিংবা সিন্ধুঘোটকের চর্বি দিয়ে প্রদীপ তৈরি করা হয়, কয়েক টুক্‌রা শ্যাওলা চর্বির মধ্যে ভাসে; এগুলিই সলতে। প্রদীপে আলো কম হ'লেও ঘর গরম রাখে।

ইগ্‌লুর ভিতরে দেওয়ালের ধার দিয়ে লম্বা বেঞ্চের মত উঁচু বেদী, তাতে চামড়ার আস্তরণ। এগুলি বসার আসন ও শোবার চৌকি। দেওয়ালের ধার দিয়ে সাজানো দেখতে পাওয়া যাবে নানা ধরনের অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি—তীর-ধনুক, লম্বা বর্শা, হার্পুন, চামড়ার ফিতা-লাগানো চাবুক।

বরফের দেশে এস্কিমোরা কি খেয়ে বাঁচে? শস্য উৎপাদনের কোন প্রশ্নই সেখানে ওঠে না। সেখানে যা মেলে তাই তাদের খাদ্য, তা দিয়েই হয় পরিচ্ছদ ও গৃহস্থালীর জিনিস। সেখানকার সমুদ্রে আছে সীলমাছ আর সিন্ধুঘোটক। এস্কিমোরা বর্শা, তীর-ধনুক বা হার্পুন দিয়ে শিকার করে। এদের চর্বি ও কাঁচা মাংস হ'ল এস্কিমোদের খাদ্য। এস্কিমো কথাটির মানেই কাঁচা মাংস ভক্ষণকারী। সীল ও সিন্ধুঘোটকের চামড়া দিয়ে হয় পোষাক, বিছানা, ছাদের ভিতরের দিকের ছাউনী, জুতা, মোজা, ডিঙ্গি-নৌকা, গরমের দিনের তাঁবু। চর্বি দিয়ে আলো

জ্বালানো হয়; প্রিয় খাদ্যও তাই। সীলের হাড় দিয়ে তৈরি হয় শ্লেজ-গাড়ির কাঠামো, শিকারের অস্ত্রশস্ত্র, ছোটদের খেলনা, মেয়েদের গহনা। কুকুর এদের প্রিয় গৃহপালিত জন্তু। এগুলি শুধু শিকারের সহায় নয়, তাদের গাড়ি টানার কাজেও লাগে।

উত্তর-মেরু সাগরের মধ্যে নীচু উপকূলভাগ নিথর বরফেই বারো মাস আচ্ছন্ন থাকে না। তুন্দ্রা অঞ্চলে যখন দিন সুরু হয় অর্থাৎ ছয় মাস ধ'রে দিগন্ত-রেখায় সূর্য দেখা যায় তখন বরফ গলতে থাকে। এস্কিমোদের মধ্যে তখন নূতন ধরনের কাজের সাড়া প'ড়ে যায়। বরফের ঘর ইগ্‌লু ছেড়ে তারা চামড়ার তাঁবুতে বাস করতে থাকে। তখন পরিবারের সকল লোকজন, আসবাবপত্র নিয়ে শিকারের সন্ধানে বের হয়।

উদ্ভিজ্জ

শীতকালে শুধু বরফ, তার মধ্যে ঘাসের চিহ্ন থাকে না কোথাও। যেন শীতল মরুভূমি। কিন্তু গ্রীষ্মে ছোট ছোট ঝোপগাছ জন্মে। ক্ষুদে আকারের পাইনগাছ, ফারগাছ, এক রকম ছোটজাতীয় ঘাস তুন্দ্রা অঞ্চলে সাদা প্রান্তরে সবুজের ছোপ্ লাগায়। এই সময় শ্যাওলা-জাতীয় এক প্রকার ঘাস ও ছোট ছোট ফুলের গাছ জন্মে প্রচুর। প্রকৃতিতে যেন রঙ বদলের পালা। সাদার পরে সবুজ ও বিচিত্র বর্ণের ফুলের অল্পকালস্থায়ী সমারোহ। এখানে কোন প্রকার চাষ-আবাদ সম্ভবপর নয়।

জীবজন্তু

এ অঞ্চলে যেমন খাদ্য মেলে তাতে কেবল কষ্টসহিষ্ণু প্রাণীই বাঁচতে পারে। গ্রীষ্মে যখন ঘাসে প্রান্তর সবুজ হ'য়ে ওঠে, তখন বল্গা হরিণের দল আসে উত্তর আমেরিকার দিক থেকে। খরগোস আসে দলে দলে। খাদ্যের সন্ধানে আসে ভালুক, নেকড়ে বাঘ, খেঁকশিয়াল। বুনো হাঁস আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। গ্রীষ্মকালে তুন্দ্রা অঞ্চলে মশার বড়ই উপদ্রব

হয়। সমুদ্রের উপকূলে পাওয়া যায় তিমি, সিন্ধুঘোটক, সীল ও নানাজাতীয় মাছ।

মানুষ

তুন্দ্রা অঞ্চলে মানুষ স্থায়িভাবে কোথাও বসবাস করতে পারে না। কারণ শিকার ক'রে তাকে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয় এবং শিকারের সন্ধানে তাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হয়। এস্কিমোরা তাই যাযাবর। ইউরেশিয়ার ল্যাপ্‌রাও এমনি বিচরণশীল ও মাংসভোজী।

বাসগৃহ

শীতকালে বাসের জন্য বরফের ঘর ইগ্‌লু ব্যবহৃত হয়। গ্রীষ্মে ব্যবহার করা হয় চামড়ার তাঁবু। এগুলি হাল্‌কা এবং সহজেই ভাঁজ ক'রে এক স্থান থেকে অন্যত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।



এস্কিমোদের ঘর ইগ্‌লু ও নৌকা কায়াক্

খাদ্য ও জীবিকা

মাছ ও পশু-শিকার এস্কিমোদের জীবিকার উপায়। গ্রীষ্মে কতক অঞ্চলে বল্গা হরিণের দল আসে; এদের সন্ধানে এবং সীলমাছ শিকারের জন্য তারা সপরিবারে স্থানান্তরে যায়। কতক লোক এখন

বল্গা হরিণ পুষতে আরম্ভ করেছে। বল্গা হরিণ তাদের শ্লেজ-গাড়ি টানার কাজেও লাগানো হয়। এর মাংসে হয় খাদ্য, চামড়ায় হয় পোষাক এবং অন্ত্র দিয়ে হয় সেলাই-এর সূতা ও বাঁধার দড়ি। হরিণের শিং চূর্ণ ক'রে নিয়ে এরা ওষুধরূপে ব্যবহার করে।

এস্কিমোরা চামড়া দিয়ে যে নৌকা তৈরি করে, তা খুবই হাল্‌কা। একে বলা হয় কায়াক্। হাড়ের কাঠামোর ওপর চামড়ার ছাউনী, মাঝখানে গোল ফাঁকা জায়গায় বসে বৈঠার মত লাঠি দিয়ে নৌকা চালানো হয়। এগুলি সহজেই উল্টে যেতে পারে কিন্তু চালক এমনভাবে ভারসাম্য রাখে যে, উল্টে গেলে সে টাল্ সামলে আবার নৌকা সোজা ক'রে নেয়; হাল্‌কা ও চামড়ার তৈরি ব'লে ডুবে তলিয়ে যাওয়ার ভয় নাই। বড় ধরনের কায়াক্‌ও অনেক সময় ব্যবহার করা হয়। এগুলিকে বলা হয় উমিয়াক্। উত্তর আমেরিকার কতক ব্যবসায়ীর উদ্যমে আজকাল মোটর-বোট এস্কিমোদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। এটি হয়েছে তাদের শখের এবং কাজেরও বটে। যদিও তীর-ধনুক ও বর্শা এখনো এস্কিমোদের প্রধান অস্ত্র, তবু রাইফেল এবং অন্যান্য অস্ত্রও এখন তারা ব্যবহার করতে শিখেছে; এগুলির প্রসার দিন দিন বেড়ে চলেছে।

বৈশিষ্ট্য

এস্কিমোরা যে অবস্থার মধ্যে বাস করে তাতে তাদের কাছ থেকে দৈহিক পরিচ্ছন্নতা বেশী আশা করা যায় না। কাঁচা মাংস আর চর্বি তাদের খাদ্য। ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে চর্বি লেগে থাকলে অন্য কেউ তা চেটে পরিষ্কার ক'রে দেয়, আমাদের মত মুখ ধোওয়ার অভ্যাস তাদের নাই; আর জল মানেই শক্ত জল অর্থাৎ বরফের খণ্ড।

এস্কিমোরা সাধারণত শান্ত প্রকৃতির, অল্পে সন্তুষ্ট এবং উদার। এক এক পরিবার আত্মীয়-স্বজন নিয়ে একত্রে বাস করে। এদের

পোষাক চামড়া দিয়ে তৈরি। মেয়েরা হাতে সেলাই ক'রে এগুলি বানায়। কাঁচা চামড়া দাঁত দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে নরম ক'রে নিলে পোষাক মোলায়েম হয়। দাঁতে চিবিয়ে চামড়া কোমল করা মেয়েদের একটি আনন্দদায়ক কাজ ; চর্বি চুষে পায় সুস্বাদ, পোষাক তৈরি ক'রে পায় শিল্পসৃষ্টির তৃপ্তি। শীতকালে ব্যবহারের জন্য মাথা-ঢাকা বড় টুপি ভালুক বা বন্য হরিণের চামড়া দিয়ে তৈরি করা হয়। ছোট শিশুকে তার মা একটি চামড়ার থলির মধ্যে রেখে পিঠে ক'রে নিয়ে বেড়ায়। এস্কিমোদের মধ্যে লেখা বা পড়ার চর্চা নাই। এদের ভাষা অন্যের পক্ষে আয়ত্ত করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ জিভের আগা দিয়ে উচ্চারিত আওয়াজ এক-একটি শব্দ ; উচ্চারণের সামান্য তারতম্যে শব্দের পৃথক পৃথক অর্থ হয়। তবে কতক এস্কিমো অন্যান্য লোকের সংস্পর্শে এসে কিছু কিছু অন্য ভাষা, যেমন ইংরাজি, রুশ ও ডেনিস শিখেছে। বর্তমানে এস্কিমোদের সংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল

বৃক্ষহীন সুমেরু অঞ্চল পার হ'য়ে দক্ষিণ দিকে এলে নজরে পড়ে নানাজাতীয় গাছ। প্রথমে ছোট ; দক্ষিণ দিকে যতই এগিয়ে যাওয়া যাবে ততই বড় এবং ঘন বন। সুমেরু বৃত্তের দক্ষিণ দিক ঘিরে শীতল বনাঞ্চল। এই অঞ্চলের বনভূমি জলবায়ুর তারতম্যের ফলে প্রধান তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত—মোচাকৃতি বৃক্ষের বন, পাতা-ঝরা বৃক্ষের বন এবং চিরহরিৎ বৃক্ষের বন। প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে যে অঞ্চলে যেমন গাছপালা জন্মে, যেমন ফসল ফলে বা যেমন জীবজন্তু বাস করে, সেই সব অবলম্বন ক'রেই সেখানকার মানুষ নিজেদের কর্ম ও জীবিকা

সংগ্রহের ব্যবস্থা করছে। মানুষও অন্যান্য প্রাণীর মতই প্রকৃতির সন্তান; অন্য জীবের চেয়ে তার বুদ্ধি বেশী। তারই বলে সে নিজের জীবনযাত্রায় যথাসাধ্য সুখ-সুবিধা ও আরাম আনার চেষ্টা করেছে।

মোচাকৃতি বনভূমি

তুন্দ্রা ছেড়ে দক্ষিণ দিকে আসতে প্রথমে চোখে পড়ে যে রকম গাছপালা, তা হ'ল ছোট আকারের মাথা-সরু ঝাউজাতীয় গাছ। পাতাগুলি স্ঁচের মত চিকণ; গাছের শিকড় মাটির নীচে অনেক দূরে চলে যায়। শীতকালে মাটিতে বরফের স্তর জমে। দীর্ঘ শিকড় দিয়ে অনেকটা নীচে থেকে রস সংগ্রহ করতে হয় গাছকে। পাইন, ফার ও লার্চ জাতীয় গাছই প্রধান।

জলবায়ু

গ্রীষ্মকাল উষ্ণ; তখন তাপমাত্রা ওঠে প্রায় ৭০ ডিগ্রী এবং শীত অত্যন্ত তীব্র—তাপমাত্রা তখন শূন্য ডিগ্রীরও নীচে নেমে যায়। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয় সামান্য। মোচাকৃতি বনাঞ্চলে কোমল লোমওয়ালা জীব যথেষ্ট সংখ্যায় বাস করে। উন্মুক্ত স্থানে দেখতে পাওয়া যায় হরিণ, ভালুক প্রভৃতি। কানাডার উত্তর অঞ্চলে এই বনভূমিতে এবং তার কাছাকাছি যারা বাস করে, তাদের প্রধান উপজীবিকা হ'ল বন থেকে এই সব জীবজন্তু ধরা। এস্কিমো ও রেড্ ইণ্ডিয়ান্‌রা প্রতি বছর প্রায় ৪০ লক্ষ জীবজন্তুর চামড়া সংগ্রহ করে। রূপালি খেঁকশিয়াল, ভালুক, সেবল্, আরমিন প্রভৃতির কোমল লোমযুক্ত চামড়া গরম ও সৌখিন পরিচ্ছদ করতে শীতের দেশের লোকেরা ব্যবহার ক'রে থাকে।

কাঠসংগ্রহ

এই মোচাকৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষের অঞ্চলেই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী নরম কাঠ পাওয়া যায়। এই কাঠ দিয়ে প্রধানত প্যাকিং বাক্স ও

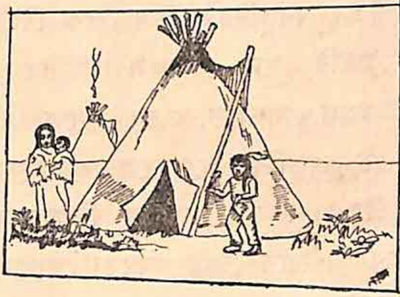
কাগজ তৈরির মণ্ড করা হয় ; অন্যান্য কাজেও ব্যবহৃত হয়। বনাঞ্চল থেকে কাঠ কেটে লোকালয়ে নিয়ে আসা এক বড় সমস্যা। কারণ, ইউরেশিয়া ও উত্তর আমেরিকার বেশীর ভাগ বড় বড় নদী বরফাচ্ছন্ন সুমেরুর দিকে প্রবাহিত। কাজেই শীতকালে নদীগুলি যখন জমাট হ'য়ে শক্ত হ'য়ে যায়, তখন বন থেকে কাঠ কেটে স্লেজ-গাড়িতে ক'রে বরফের ওপর দিয়ে টেনে আনার সুবিধা। বৃটিশ কলম্বিয়া এবং কানাডার পূর্বাঞ্চলে কাঠ কেটে নদীতে ভাসিয়ে কাঠের কারখানায় নিয়ে আসা হয়। কোন কোন অঞ্চলে জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন ক'রে কাঠ বহন ক'রে আনার কাজে তা লাগানো হয়। এ ছাড়া যেখানে সুবিধা আছে সেখানে ট্রেন ও মোটর-গাড়িও চলে।

রেড্ ইণ্ডিয়ান্

এস্কিমোদের মত রেড্ ইণ্ডিয়ান্গণ-ও শিকারী কিন্তু তারা শিকার করে ভিন্ন রকম অঞ্চলে। উত্তর আমেরিকার শীতল বনাঞ্চলে এদের বাস। এখানে লম্বা পাইন, ফার ও বার্চ গাছের বনভূমি ; এগাছগুলি যেখানে শীতকালে প্রচণ্ড শীত সেখানে জন্মে। এই বনকে বলা হয় শীতল বন ; কারণ শীতের সময় ভূমি জমাট বরফে ঢেকে যায়।

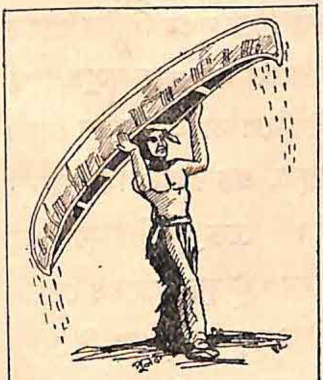
এস্কিমোদের মত শিকার ক'রে খাদ্য সংগ্রহ করতে হ'লেও রেড্ ইণ্ডিয়ান্দের জীবন অতখানি কষ্টকর নয় ; কারণ বনে প্রচুর কাঠ, তা দিয়ে আগুন করা, বাসস্থান করা এবং শিকারের উপকরণ তৈরি করা সহজসাধ্য ; তা ছাড়া বনে আছে বহু জীবজন্তু—এ-সব শিকার ক'রে সহজেই খাদ্য সংগ্রহ করে। পশুর মাংস খায়, চামড়া দিয়ে পোষাক তৈরি করে। কোমল লোমযুক্ত চামড়া দিয়ে চমৎকার শীতের পোষাক তৈরি হয় ; তাই শীতপ্রধান সভ্যদেশে এ-সবের খুব চাহিদা। রেড্ ইণ্ডিয়ান্রা ভালুক, সিলভার ফক্স, সেবল প্রভৃতি প্রাণী শিকার করে। মাংস তারা খায়, আর সুন্দর চামড়াগুলি বিক্রি করে বেশ চড়া দামে।

শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়াতে হয় ব'লে রেড্ ইণ্ডিয়ান্‌রা এক জায়গায় স্থায়ী হ'য়ে বসবাস করতে পারে না। তাই তাদের স্থায়ী বাড়ী-ঘরও নাই, আছে চামড়ার তাঁবু। একে বলে উইগ্‌ওয়াম। চার-পাঁচটি লম্বা খুঁটির আগা একত্র ক'রে বেঁধে গোড়ার অংশ মাটিতে পুঁতে দিলেই সাময়িক ঘর হ'য়ে গেল। ছাউনী চামড়ার, তার ওপর কেউ কেউ ছবি ও নক্সার কারুকার্য করে।



রেড্ ইণ্ডিয়ান্‌দের তাঁবু

শীতকালে যখন প্রান্তর ও বনভূমি বরফে ঢাকা থাকে, তখন কুকুরে-টানা স্লেজ-গাড়িতে ক'রে রেড্ ইণ্ডিয়ান্‌রা অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্যত্র যাতায়াত করে। তাদের পরিবার-পরিজন সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। মেয়েরা তাঁবু খাটানো ও অন্যান্য কাজকর্ম করে; পুরুষদের প্রধান কাজ শিকার করা।



রেড্ ইণ্ডিয়ান্ নৌকা মাথায় ক'রে নিয়ে চলেছে।

গ্রীষ্মকালে যখন বরফ গলতে থাকে, তখন রেড্ ইণ্ডিয়ান্‌রা চলাফেরা করার জন্য এক রকম নৌকা ব্যবহার করে। এগুলি এস্কিমোদের কায়াকের মত চামড়া দিয়ে তৈরি নয়; শীতল বনে যে বার্চগাছ জন্মে তার বাকল দিয়ে প্রস্তুত। রেড্ ইণ্ডিয়ান্‌রা এই ক্যানো বা নৌকা চালাতে খুব পটু। নদীতে তো চালাতে পারেই, এমন কি পাহাড়ের গা বেয়ে যে জলপ্রপাত বেগে প্রবাহিত হয় তার ধারার ওপর দিয়েও ক্যানো চালিয়ে নেয়।

এ নৌকাগুলি হাল্‌কা ; তাই একখানা নৌকা একাই অনায়াসে মাথায় ক'রে নিয়ে যেতে পারে।

প্রেইরি অঞ্চলের রেড্‌ ইণ্ডিয়ান্‌

শীতল বনভূমির দক্ষিণ দিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে তৃণভূমি। প্রেইরি নামে এ অঞ্চল পরিচিত। কতক রেড্‌ ইণ্ডিয়ান্‌ শীতল বন অঞ্চলে বাস করে, কতক থাকে এই প্রেইরি অঞ্চলে। এক সময়ে এই তৃণভূমিতে দলে দলে বহু বাইসন্‌ চ'রে বেড়াত। রেড্‌ ইণ্ডিয়ান্‌রা তীর-ধনুক দিয়ে বাইসন্‌ শিকার করতো। মাংস হ'ত তাদের খাদ্য, চামড়া দিয়ে তৈরি করতো পোষাক-পরিচ্ছদ আর তাঁবুর ছাউনী, খুর গালিয়ে বানাত আঠা, হাড় দিয়ে তৈরি করতো অস্ত্র এবং হাতল আর অন্ত্র দিয়ে হ'ত সূতা ও দড়ির কাজ।

রেড্‌ ইণ্ডিয়ান্‌রা অনেকে একসঙ্গে দলবদ্ধ হ'য়ে বাস করতো ; থাকতো তাদের চামড়ার তাঁবু বা উইগ্‌ওয়ামে। বুনো বাইসন্‌ শিকার করতে দলে ভারী হ'লেই সুবিধা। শত শত তাঁবু খাটিয়ে এক স্থানে থাকতো ; শিকারের সন্ধানে কখনও বা দল বেঁধে অন্যত্র গিয়ে নূতন শিবির স্থাপন করতো। তারা খুব অতিথিপরায়ণ। ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য মজুত রাখা তাদের রীতি নয়। নিজেদের যা থাকে সবাই মিলে তা ভাগ ক'রে নেয়। তাদের শিকারের প্রধান অস্ত্র হ'ল তীর-ধনুক, এক রকম লম্বা ধরনের দা ; একে বলে টোমাহক্‌ আর বড় ছুরি। রেড্‌ ইণ্ডিয়ান্‌রা খুব সাহসী আর নির্ভীক। শিকার করতে যেমন পটু যুদ্ধ করতেও তেমনি উৎসাহী। শত্রুর প্রতি এরা অত্যন্ত নির্দয় কিন্তু বন্ধু-বান্ধব এবং শিশুদের খুব ভালবাসে। আনন্দ-উৎসব করার সময় এরা দলবদ্ধ হ'য়ে নাচে।

শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার সময় রেড্‌ ইণ্ডিয়ান্‌দের রূপ হয় অপরূপ। চেহারা ভয়ঙ্কর করার জন্য এরা লাল, কাল, হলদে রঙ দিয়ে নিজেদের শরীর চিত্রিত করে, গলায় পরে শত্রুর মাথার খুলি। মানুষের মাথার

হাড় তাদের বিজয়চিহ্ন, বীরত্বের প্রতীক। এগুলি তারা কখনো কখনো গলায় মালা ক'রে পরতো কিংবা তাঁবুর বাইরে ঝুলিয়ে রাখতো। যার যত বেশী মাথার খুলি থাকতো সে ততবড় বীর। এরা চুলের মধ্যে পাখীর পালক গুঁজে রাখতো। দলপতি পরতো ঈগল পাখীর রঙিন পালক দিয়ে তৈরি চমৎকার টুপি।

প্রথমে রেড্ ইণ্ডিয়ান্‌রা পায়ে হেঁটে শিকার করতো। পরে শ্বেতাঙ্গরা যখন আমেরিকাতে ঘোড়া নিয়ে যায়, ক্রমে তারা ঘোড়া ব্যবহার করতে শেখে। রেড্ ইণ্ডিয়ান্‌রা ঘোড়ায় চড়তে খুব ওস্তাদ। গদি না ক'ষে ঘোড়ার খালি পিঠেই এরা সওয়ার হ'য়ে বসে। ক্রমে ক্রমে এদের মধ্যে রাইফেল ও অন্যান্য আধুনিক অস্ত্র এবং লোহার তৈজসপত্র ব্যবহারের প্রচলন হয়েছে।

প্রেইরি অঞ্চলের রেড্ ইণ্ডিয়ান্‌রা এখন আর আগের মত সারা তৃণাঞ্চল ঘুরে বেড়ায় না। তাদের বাসের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা আছে। একে বলা হয় রিজার্ভস্; এখানে কেবল রেড্ ইণ্ডিয়ান্‌রাই বাস করতে পারে। এদের জীবনযাত্রায় কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটলেও পূর্বের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। এরা কোট এবং পায়জামা পরে; নরম চামড়ায় তৈরি আরামদায়ক জুতাকে বলে মোকাসিন। পোষাক-পরিচ্ছদ পুতির দানা আর সজারুর কাঁটা দিয়ে অলঙ্কৃত। রেড্ ইণ্ডিয়ান্‌রা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু। শরীরে যতই ব্যথা বা যন্ত্রণা হোক কখনো তারা কাঁদে না। ছোটদেরও স্বভাব এই রকম। কাঁদা বা দুঃখ প্রকাশ করা তারা অপমানকর ব'লে মনে করে।

পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের যে অংশ উষ্ণ মণ্ডলের কাছাকাছি, সেখানে সারা বছর বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার জলবায়ুও তাই অপর অংশ থেকে পৃথক। এরূপ স্থানে তাই বনে এবং ফসলে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

উত্তর আমেরিকার উপকূলভাগ, পশ্চিম ইউরোপ, এশিয়ার উত্তর-পূর্ব উপকূলের কিছু অংশ, তাস্‌মানিয়া, নিউজিল্যাণ্ডের সাউথ আইল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ চিলির কিছু অংশে এই রকম বনভূমি আছে। ওক, এল্‌ম, বিচ, লাইম, পপ্‌লার প্রভৃতি এখানকার বৈশিষ্ঠ্যপূর্ণ স্বাভাবিক গাছ। এই অঞ্চলের জলবায়ু আরামপ্রদ এবং জমি উর্বর। চাষ-আবাদ ক'রে নানাবিধ ফল ও শস্য উৎপাদন করা এ অঞ্চলের মানুষের প্রধান উপজীবিকা। গম, ওট, বার্লি, আখ, নানাজাতীয় শাক-সব্‌জি, আপেল, ন্যাসপাতি, কুল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তৃণ অঞ্চলে মেষপালন একটি বড় ব্যবসায়।

মাছ ধরা

এই অঞ্চলের কোন কোন স্থানে এত বেশী সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায় যেমন আর কোথাও মেলে না। ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে সমুদ্র অগভীর। এখানে এক প্রকার ছোট ছোট জলজ উদ্ভিদ প্রচুর জন্মে ; তা মাছের একটা প্রধান খাদ্য। এই অঞ্চলকে বলা হয় কাণ্টনেণ্টাল শেল্‌ফ। মাছ ধরা এবং তা খাদ্যরূপে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করা আজকাল একটা লাভজনক ব্যবসায়।

এই অঞ্চলে খনিজ দ্রব্যও মেলে যথেষ্ট। জলবায়ু লোককে করে পরিশ্রমী। জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক সম্পদের গুণ এই অঞ্চলে আধুনিক সভ্যতার প্রসার ঘটেছে। শ্বেতাঙ্গরা এ সম্পদের সদ্ব্যবহার ক'রে সমৃদ্ধ জীবন গ'ড়ে তুলেছে।

চিরহরিৎ বনভূমি অঞ্চল

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ৩০ থেকে ৪৫ ডিগ্রীর মধ্যে স্থলভাগে এক বিশেষ ধরনের উদ্ভিজ্জ জন্মে। এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এই যে, শীতকালে বৃষ্টি হয়, গ্রীষ্মকাল বৃষ্টিবিহীন। এরূপ জলবায়ু ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু

নামে পরিচিত। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল ছাড়াও যে সকল স্থানে এইরূপ শুষ্ক গ্রীষ্ম ও শীতকালীন বৃষ্টি দেখা যায় তা হ'ল ক্যালিফোর্নিয়া, মধ্য চিলি, আফ্রিকার সর্বদক্ষিণ অংশ, অস্ট্রেলিয়ার পার্থ্ ও এডেলেডের চারপাশে কিছু অঞ্চল এবং নিউজিল্যাণ্ডের উত্তর অংশ।

মানুষ ও তার উপজীবিকা

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর এলাকায় প্রধান উৎপন্ন ফসল আঙুর, কমলা লেবু, জলপাই প্রভৃতি ফল এবং গম। অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে জার এবং কারি নামক এক প্রকার খুব শক্ত কাঠ জন্মে; এ কাঠ রেল লাইনের স্লিপার এবং জাহাজের ডক্ তৈরিতে কাজে লাগে। এ অঞ্চলে ভাল তৃণভূমি না থাকায় পশুপালনের বিশেষ সুবিধা নাই; পালিত পশুর মধ্যে ছাগলের সংখ্যা বেশী, কারণ ছাগল অল্প ঘাসের অঞ্চলেও বাঁচতে পারে।

এ অঞ্চলের লোকের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। বিশেষ ক'রে আঙুর চাষ ও গমের চাষ। আঙুর থেকে মদ উৎপাদন পৃথিবীর আর কোন অঞ্চলে এত বেশী হয় না। এ ছাড়া অন্যান্য ফলের চাষ ক'রে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তা রপ্তানি করা হয়। ক্যালিফোর্নিয়া, জাফা, সেভিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার কমলালেবু, কেপ্ টাউনের আঙুর, স্পেনের জেরেজ অঞ্চলে উৎপন্ন আঙুর থেকে তৈরি শেরি এবং পোর্তুগালের পোর্ট নামক মদ পৃথিবীতে সুপরিচিত।

এ অঞ্চলে মুল্‌বেরি নামক গাছে রেশম-কীট পালিত হয়। ইতালি, স্পেন এবং ফ্রান্সের কিছু অংশে রেশম উৎপাদন প্রধান শিল্প।

তৃতীয় অধ্যায়

নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির অঞ্চল

সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি থেকে বিষুবরেখার দিকে এগিয়ে যেতে মহাদেশের অভ্যন্তরভাগে বিস্তীর্ণ তৃণাঞ্চল দেখা যায়। সর্বত্র একই রকম ভূমির প্রকৃতি এবং একই প্রকার জলবায়ু না হওয়ায় তৃণাঞ্চলের অবস্থা সর্বত্র সমান নয়। কোথাও ঘন প্রচুর তৃণ শত শত মাইল জুড়ে আছে, কোথাও বা তৃণের বৃদ্ধি খুব কম, ভূমি প্রায় মরুসদৃশ। পৃথিবীর যে যে অংশে এই ধরনের তৃণভূমি আছে তা ইউরেশিয়ায় স্টেপস্, উত্তর আমেরিকায় প্রেইরি, দক্ষিণ আমেরিকায় পাম্পাস্, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভেল্ড্ এবং দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় ডাউন্স্ তৃণক্ষেত্র নামে পরিচিত।

জলবায়ু

কতকগুলি প্রাকৃতিক কারণে মহাদেশের মধ্যভাগে বিরাট অঞ্চল জুড়ে তৃণভূমির স্বৃষ্টি হয়েছে। সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত হওয়ায় সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাব এ-সব অঞ্চলে অনুভূত হয় না এবং বাতাস শুষ্ক ব'লে মেঘ গঠিত হয় না। ফলে জলবায়ু হয় চরমভাবাপন্ন অর্থাৎ শীতকালে অত্যন্ত শীত, তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রার নীচে নেমে যায়; গ্রীষ্মকালে রীতিমত গরম পড়ে। তখন তাপমাত্রা হয় ৮০ ডিগ্রীর মত। শীতকালে মহাদেশের অভ্যন্তরভাগে বায়ুর চাপ বেশী হওয়ার ফলে বায়ুর প্রবাহ হয় স্থলভাগ থেকে বাইরের দিকে। গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের দিক থেকে মেঘবাহী বাতাস দেশের ভিতরের দিকে আসতে থাকে কিন্তু যতই দেশের অভ্যন্তরে আসে ততই বাতাস শুষ্ক হ'তে থাকে; অবশেষে খুব সামান্য পরিমাণমাত্র বৃষ্টি দেবার মত আর্দ্রতা

থাকে। কাজেই বসন্ত বা গ্রীষ্মকালে ৫ থেকে ২০ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টি হয় না। সারা বছরে বৃষ্টির পরিমাণ এইটুকুই।

উদ্ভিজ্জ

শীতকালে যে বরফ পড়ে বসন্তে তা গলতে সুরু করে। এর আর্দ্রতার ফলে দ্রুত ঘাস গজিয়ে ওঠে এবং প্রান্তর যেন সবুজ আস্তরণে ঢেকে দেয়। বিচিত্র বর্ণের ফুলের সমারোহ ঘটে। তখন যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল সতেজ সবুজ ঘাস আর ফুলের মেলা। দিগন্ত-জোড়া পটে যেন বিরাট কোন শিল্পীর অপূর্ব শিল্পকলার নিদর্শন। আবার শীত আসে; ফুল ম্লান হ'য়ে ঝ'রে যায়; প্রান্তর শ্যামলতা হারিয়ে ক্রমে ধূসর হ'য়ে আসে এবং অবশেষে তুষারে ঢাকা প'ড়ে শুভ্র রূপ ধারণ করে। এরূপ অঞ্চলে জল-মাটির দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হ'য়ে বড় গাছ বাঁচতে পারে না। এ প্রধানত তৃণের দেশ।

অধিবাসী ঃ স্টেপস্ অঞ্চল

পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের তৃণ অঞ্চলগুলিতে যারা বাস করে, তাদের সকলের জীবনযাত্রা-প্রণালী একই রকম নয়। কারণ, কতক হ'ল আদিম বাসিন্দা যারা দলবদ্ধ হ'য়ে যাযাবর জীবন যাপন করে; কতক অঞ্চলে সভ্য শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলেছে। এশিয়ার স্টেপস্ তৃণ অঞ্চলে কল্কার, কিরঘিজ, কালমুক্স্ প্রভৃতি যাযাবর জাতির বাস। এদের জীবন প্রকৃতির ঋতু-পর্যায়ের সঙ্গে বাঁধা; শীতে একরকম, গ্রীষ্মে অন্যপ্রকার।

স্টেপস্ অঞ্চলে শীত দীর্ঘকাল স্থায়ী। তখন বরফের স্তর পড়ে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে আর ঝড় বয় প্রবল বেগে। সে অবস্থায় কৃষিকাজ করা সম্ভবপর নয়। এপ্রিল মাসে তুষার গলতে সুরু করে এবং অল্প-দিনের মধ্যেই সবুজ ঘাস ও নানা রঙের ফুলে প্রান্তর ছেয়ে যায়।

২

কিন্তু দিন যতই বড় হ'তে থাকে সূর্যের তাপ ততই বাড়ে; বৃষ্টিপাত হয় না। কাজেই গ্রীষ্মের মাঝামাঝি ঘাস শুকিয়ে যায়, সমগ্র অঞ্চল শুষ্ক পিপাসার্ত মরুভূমির রূপ ধারণ করে।

স্টেপস্ অঞ্চলের কিরঘিজ ও কালমুক্স্ যাযাবরদের প্রধান অবলম্বন তাদের পালিত পশু—বিশেষ ক'রে ঘোড়া, উট, ভেড়া, ছাগল ও গরু। দুধ, ছানা, পনীর, মাংস তাদের খাদ্য; পশুর চামড়া ও পশম দিয়ে তাদের পরিচ্ছদ তৈরি হয়। গ্রীষ্মকালে ব্যবহারের তাঁবু চামড়া দিয়ে প্রস্তুত করা হ'য়ে থাকে; এগুলিকে বলা হয় ইয়াটস্।



কিরঘিজ জাতির লোক ও তাদের তাঁবু

শীতকালে চামড়ার ঘরে বাস করা কষ্টকর হয়, সেজন্য শুক্না ঘাসের ছাউনী তৈরি ক'রে মাটি দিয়ে তা লেপে দেয়। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ঘোড়ায় চড়তে পটু।

গোবি মরুভূমির অঞ্চলে বাস করে মোঙ্গলীয় কল্‌কার যাযাবর জাতি। কিরঘিজদের মত এদেরও ঘোড়া, উট, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি প্রধান সম্পদ। এরা দলবদ্ধ হ'য়ে বাস করে; দলপতিকে সবাই মান্য করে; নিজেদের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা ক'রে দেয় দলপতি। প্রতিটি পরিবার নিজ নিজ ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, উট প্রভৃতির তদারক করে। এগুলি যার যত বেশী সংখ্যায় সে ততবড় ধনী। কোন কোন পরিবারের পালিত পশুর সংখ্যা দশ হাজার পর্যন্ত। পুরুষেরা ঘোড়ায় চ'ড়ে এ-সব প্রাণী চরিয়ে বেড়ায়, আবার সন্ধ্যায় আস্তানায় নিয়ে এসে সমবেত করে। তাঁবু তৈরি, তাঁবু খাটানো, খাবার তৈরি করা—এ-সবই মেয়েদের কাজ। আগুনে ঝলসানো মাংস, দুধ, দুধ-পচানো কল্‌কারদের প্রধান খাদ্য। দুধ পচিয়ে যে খাদ্য তৈরি হয় তাকে বলে কুমিস্। স্টেপস্ অঞ্চলের যাযাবরদের কাছে এটি খুব প্রিয়। এই যাযাবররা চা খুব ভালবাসে, খায়ও প্রচুর পরিমাণে। কল্‌কাররা খুব অতিথি-বৎসল। বাড়ীতে কোন অতিথি এলে তার সেবার জন্য দরকার হ'লে নিজেদের খাবার এবং অন্য সব-কিছুও তারা হাসিমুখে দিয়ে দেয়। হারাণো পশুর খোঁজে অন্য দলের লোক যদি এদের দলে এসে অতিথি হয়, তবে তাকে তারা খুব সমাদর করে।

তৃণ অঞ্চলে পশুপালন

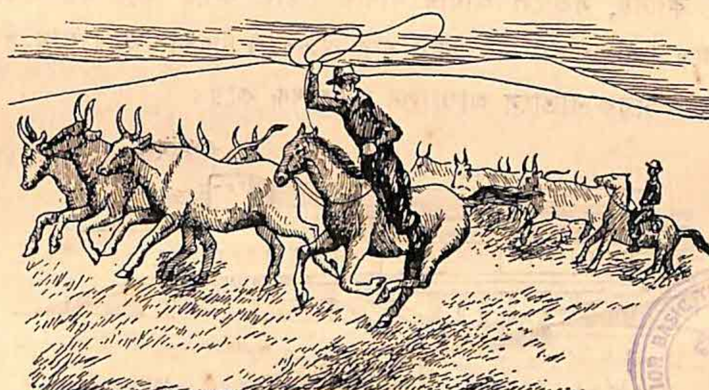
এশিয়ার তৃণ অঞ্চলে যাযাবর জাতির লোকেরা সপরিবারে বাস করে। প্রকৃতির বৈচিত্র্যের সঙ্গে মিল রেখে নিজেদের জীবনযাত্রা তারা নির্বাহ করে। কিন্তু উত্তর আমেরিকার প্রেইরি এবং দক্ষিণ আমেরিকার পাম্পাস অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গ লোকেরা পশুপালনের ব্যবসায় গ'ড়ে তুলেছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে বিস্তৃত অঞ্চলে বসবাসের সুবিধা ক'রে নিয়ে তারা গো-মেষ পালন, পশম সংগ্রহ, মাংস সংরক্ষণ ও বিদেশে রপ্তানি প্রভৃতির সুব্যবস্থা করেছে। যে হাজার হাজার মাইল-জোড়া স্থানে কখনও

কিছু উৎপন্ন হ'ত না এবং যা মানুষের কোন কাজেও লাগতো না, সেখানে গরু-মেষের চারণক্ষেত্র হয়েছে। প্রেইরি অঞ্চলে এরূপ পশুপালন ক্ষেত্রকে বলে র‍্যাঞ্চ, দক্ষিণ আমেরিকায় একে বলা হয় এস্‌ট্যান্‌সিয়া।

প্রেইরির গোচারণ-ক্ষেত্র

প্রেইরিতে গাছ চোখে পড়ে না, কেবল ঘাস আর ঘাস—দিগন্ত-জোড়া ঘাসে-ঢাকা প্রান্তর। এর মধ্যে অনেকখানি এলাকা নিয়ে এক-একজন পশুপালন ক্ষেত্র স্থাপন করেছে। এর মালিককে বলা হয় র‍্যাঞ্চার। কেউ কেউ হাজারেরও বেশী গাভী ও ষাঁড়ের মালিক। গরুগুলি মাঠে চ'রে বেড়ায়; তাদের তদারক করে গোপালক। এদের বলা হয় কাউবয়। গোপালকরা ঘোড়ায় চ'ড়ে ঘুরে ঘুরে গরুকে দলবদ্ধ ক'রে রাখে যাতে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে হারিয়ে না যায়। এরা অশ্ব-চালনায় এমন পটু যে, পূর্ণবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলার সময় অনায়াসে মাটিতে পড়ে-থাকা রুমাল কুড়িয়ে নিতে পারে; অনেকে লাগাম না ধ'রে ঘোড়ার পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে পূর্ণবেগে ছুটাতে পারে। কাউবয়রা ঘোড়াকে খুব ভালবাসে, যত্ন করে। ঘোড়া তাদের নিত্য-সঙ্গী, কিন্তু প্রথম সওয়ার নেওয়ার সময় অশ্ব এবং আরোহীর মধ্যে রীতিমত 'লড়াই' চলে। সতেজ জোয়ান ঘোড়ার পিঠে যখন প্রথম আরোহী চ'ড়ে বসে, তখন সে তাকে ফেলে দেবার জন্য কখনও পিছনের পা শূন্যে ছুঁড়তে থাকে, সামনের দুই পা শূন্যে তুলে সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়, কখনও বেগে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ থেমে পড়ে যাতে সওয়ার ছিটকে পড়ে পিঠ থেকে। কিন্তু কিছুতেই যখন পিঠের আরোহীকে ফেলতে পারে না, তখন কিছুদিনের মধ্যে সে সওয়ার নিতে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ে। অবশেষে ঘোড়া ও তার মালিকের মধ্যে যেন প্রীতির সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে।

কাউবয়দের পোষাক প্রায় সকলেরই এক রকম। তারা ঘোড়ায় চড়ার উপযোগী ব্রিচেসের সঙ্গে মেষের চামড়ার ঢাক্‌না পরে ; তার সঙ্গে থাকে চওড়া ঢেউ-তোলা টুপি এবং রঙিন সার্ট, শক্ত চামড়ার বেল্ট্‌ এবং পুরু জুতা। এদের হাতে থাকে লম্বা দড়ি—তার এক প্রান্তে ফাঁস্‌ লাগানোর মত ক'রে গিট্‌ দেওয়া। একে বলা হয় ল্যাসো। এই ল্যাসো ছুঁড়ে দিয়ে কাউবয় গরু বা ঘোড়াকে সহজেই ধ'রে ফেলতে পারে। গরু ও ঘোড়া যখন আলগা চ'রে বেড়ায় তখন আট্‌কানোর প্রয়োজন হ'লেই ল্যাসো ছুঁড়ে দিয়ে মাথা বা পা বেঁধে ফেলা হয় ;



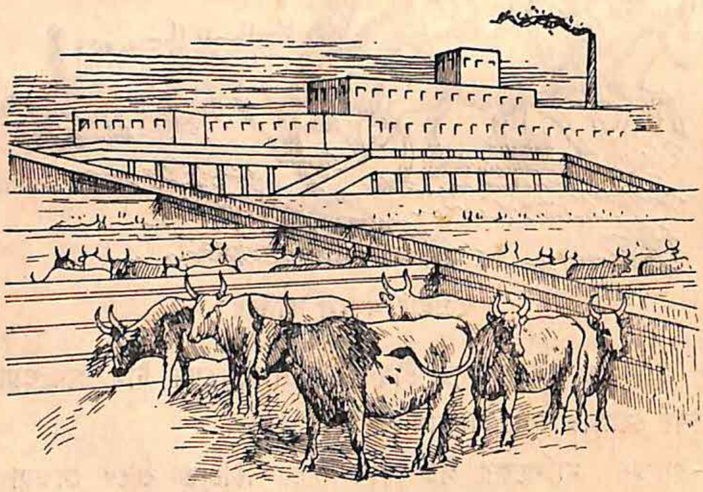
প্রেইরি অঞ্চলে কাউবয়

তখন সুরু হয় দুই পক্ষের ভীষণ টানাটানি, যেন টাগ্‌-অব-ওয়ার। কাউবয় ঘোড়ার ওপর থাকায় জয় হয় তারই।

এক-একজন মালিকের গরু দাগ দিয়ে চিহ্নিত ক'রে দেওয়া হয় যাতে অন্যদলের সঙ্গে মিশে গেলেও খুঁজে বের করা যায়। দাগানোর সময় গরুগুলিকে ল্যাসো দিয়ে আট্‌কিয়ে মাটিতে শুইয়ে লোহা গরম ক'রে র‍্যাঞ্চারের ছাপ দিয়ে দেওয়া হয়। এই সময় কাউবয়দের খুব পরিশ্রমের কাজ পড়ে। কাউবয়রা যেমন সাহসী তেমনি শক্তিশালী।

তারা ষাঁড়ের শিং দু'হাত দিয়ে ধ'রে তাকে মাটিতে ফেলে স্থির ক'রে রাখতে পারে। প্রেইরিতে ষাঁড়ের সঙ্গে কুস্তি লড়া একটি আমোদ-জনক খেলা। এ খেলা বিপজ্জনকও বটে কারণ বুনো বলিষ্ঠ ষাঁড়গুলির লম্বা এবং ধারালো শিং হয়। কিন্তু কাউবয়দের কৌশল ও সাহসের কাছে এরা পরাভূত।

গরুগুলি পূর্ণবয়স্ক হ'লে কাউবয়রা বিক্রি করার জন্য এগুলি অনেক দূরের হাটে নিয়ে যায়। মাঠের পর মাঠ পার হ'য়ে শহরের হাটে যেতে অনেক দিন লাগে। তখন এরা ফাঁকা মাঠের মধ্যেই আগুন জ্বালিয়ে রাত কাটায়, সকালে আবার খাবার তৈরি ক'রে নিয়ে গরুর পাল চালিয়ে রওনা হয়; এই সময় তারা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে আর দীর্ঘ চামড়ার চাবুক বাতাসে আস্ফালন ক'রে শব্দ করে।



আর্জেন্টিনার মাংসের কারখানা

শহরে গরুগুলি অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রি হ'য়ে যায়। এদের অধিকাংশ বড় বড় শহরে নিয়ে হত্যা ক'রে টিনে-ভর্তি খাবার মাংস প্রস্তুত করা হয়। দক্ষিণ আমেরিকার পাম্পাস অঞ্চল থেকেও এমনি টিনে-ভর্তি

মাংস পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানির জন্য কারখানা আছে। দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা এ বিষয়ে অগ্রণী।

শহরের কাজ শেষ ক'রে কাউবয়গণ নিজেদের এলাকায় ফিরে আসে। ফেরার সময় বেশী দেরী হয় না। তাদের ছেলেমেয়ে ও অন্যান্য পরিজনরা তাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য উৎসুক হ'য়ে থাকে। পশুপালন ক্ষেত্রের কাছাকাছি এসে তারা উল্লাসে চীৎকার ক'রে চাবুক দিয়ে শব্দ ক'রে আনন্দ করতে করতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে। প্রিয়জনদের জন্য নানা উপহার তারা শহর থেকে কিনে আনে। এ সময়টা তাদের কাছে খুব আনন্দদায়ক।

জ্ঞাতব্য

১। মহাদেশের অভ্যন্তরে সরলবর্গীয় বনভূমি ও ৩৫ ডিগ্রী অক্ষাংশের মধ্যেই পৃথিবীর বিশাল তৃণ অঞ্চল অবস্থিত।

২। এই অঞ্চল বিস্তীর্ণ, সমতল ও বৃক্ষহীন।

৩। এই অঞ্চলের জলবায়ু চরম অর্থাৎ শীতকালে তীব্র শীত, গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরম। সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত স্থানে এইরূপ মহাদেশীয় জলবায়ু হ'য়ে থাকে।

৪। এই অঞ্চলে ঘাস ও বুনো ফুল প্রচুর এবং স্বাভাবিকভাবেই জন্মে।

৫। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এরূপ তৃণভূমির ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। তৃণভূমি অঞ্চল উত্তর আমেরিকায় প্রেইরি, দক্ষিণ আমেরিকায় পাম্পাস্, এশিয়ায় স্টেপস্ এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভেল্ড নামে পরিচিত।

৬। তৃণ অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা যাযাবর। পশুর খাদ্যের সন্ধানে তারা এই অঞ্চলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।

৭। যাযাবরদের স্ত্রীলোকেরা পুরুষের চেয়ে বেশী কাজ করে।

৮। শ্বেতাঙ্গরা তৃণ অঞ্চলের অনেক জায়গা জুড়ে গো-মেষাদি পশুর পালনক্ষেত্র রচনা করেছে এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে শস্য উৎপাদনেরও ব্যবস্থা করেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

উষ্ণ মরু অঞ্চল

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল থেকে বিষুবরেখার দিকে এগিয়ে গেলে এক নূতন ধরনের জলবায়ু, নূতন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সেই অনুসারে মানুষের নূতন রকম জীবনযাত্রা দেখতে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে বৃষ্টি নাই, জলের একান্ত অভাব ; ভূমি শুষ্ক শ্যামলতাবিহীন।

বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বে ২০ থেকে ৩০ ডিগ্রী অক্ষাংশে বিশাল ভূখণ্ডের পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে শুষ্ক মরুভূমি অবস্থিত দেখা যায়। সকল মহাদেশে মরুভূমিগুলির আয়তন সমান নয় ; কোথাও ছোট, কোথাও হাজার হাজার মাইলব্যপী। দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা মরুভূমির একদিকে আণ্ডিজ পর্বত ও অন্যদিকে পশ্চিম উপকূলের মধ্যে সংকীর্ণ দীর্ঘ ফালি ; দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমি দেশের অভ্যন্তরে বিস্তৃত। অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম দিক থেকে পূবে মহাদেশের অর্ধেকের বেশীর ভাগই মরু অঞ্চল। উত্তর গোলার্ধে কলোরেডো ও মেক্সিকোর মরুভূমি, উত্তর আফ্রিকার সাহারা, আরবের মরুভূমি এবং ভারতের থর মরুভূমি বিরাট অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করছে।

জলবায়ুর অবস্থা

মরু অঞ্চলের জলবায়ু শুষ্ক এবং তীব্র। বাতাসে আর্দ্রতা না থাকায় বৃষ্টিপাত হয় না। যে-কোন অঞ্চলে বৃষ্টিপাত নির্ভর করে সমুদ্র-সান্নিধ্য ও বায়ু-প্রবাহের ওপর। সমুদ্রের দিক থেকে যদি মেঘরাশি ভাসিয়ে নিয়ে বাতাস দেশের দিকে আসে, তবে তা থেকে বৃষ্টিপাত হ'য়ে থাকে। কিন্তু মরু অঞ্চলের বায়ু-প্রবাহ স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের দিকে যায়। আবার যেখানে সমুদ্রের দিক থেকে বাতাস আসে স্থলের দিকে—যেমন চিলির আটাকামা মরুভূমি অঞ্চলে—সেখানে উপকূল দিয়ে শীতল

সামুদ্রিক স্রোত প্রবাহিত থাকায় শীতল শুষ্ক বাষ্পবিহীন বাতাস উষ্ণ মরুর ওপর দিয়ে বয়ে যায়। মরু অঞ্চল তাই বৃষ্টিধারা থেকে বঞ্চিত। কখনও চার-পাঁচ বছরে একবার সামান্য মাত্রায় বৃষ্টি পড়ে। দিনে প্রচণ্ড গরম, আবার রাত্রিতে তেমনি প্রচণ্ড শীত। কোন কোন অঞ্চলে দুপুরে তাপমাত্রা ওঠে ১৮০ ডিগ্রী, রাত্রিতে নেমে যায় শূন্য ডিগ্রীরও নীচে। এইরূপ গরম ও ঠাণ্ডার পরিবর্তনের ফলে পাথর প্রসারিত ও সংকুচিত হ'তে থাকে এবং অবশেষে ফেটে চূর্ণ হ'য়ে যায়। মরু অঞ্চলে দিনের বেলায় মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজের মত শব্দ ক'রে পাথর ফেটে যায়। বড় বড় টুক্‌রাগুলি পাহাড়ের পাদদেশে পড়ে, ক্ষুদ্র অংশ বাতাসের বেগে চালিত হ'য়ে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। বড় টুক্‌রাগুলি উত্তাপে চূর্ণ হ'য়ে ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। এইভাবে উষ্ণ মরু অঞ্চলে পাথর বালুস্তূপে রূপান্তরিত হ'তে থাকে।

উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু

মরুভূমির মধ্যে গাছপালা জন্মে না কিন্তু প্রান্তদেশ দিয়ে যেখানে মাঝে মাঝে সামান্য পরিমাণ বর্ষণ হয়, সেখানে অল্পসময়ের মধ্যে সবুজ ঘাসের স্তর জেগে ওঠে কিন্তু তা থাকে অতি অল্পদিন। মরুভূমির ধার দিয়ে এক রকম গাছ জন্মে যা অল্প পরিমাণ জল পেলেই বাঁচতে পারে; এদের শিকড় হয় খুব দীর্ঘ, পাতা ও কাণ্ড ফোলা যাতে জল ধ'রে রাখতে পারে, আর এর ওপর এক রকম মোমের মত পদার্থের আস্তরণ থাকে যাতে জল বাষ্প হ'য়ে যেতে না পারে।

মরুভূমির মাঝে মাঝে আছে মরূদ্যান। এখানে ছোট বা বড় আকারের জলাশয় থাকে, মাটির নীচে জলও খুব বেশী দূরে নয় ব'লে সতেজ গাছপালা জন্মে। কোন কোন মরূদ্যান ছোট একটি জলাশয় বা কূপকে ঘিরে কিছুসংখ্যক খেজুরগাছ নিয়ে গঠিত; কতক আছে শত শত বর্গমাইল বিস্তৃত। সাহারা মরুভূমির তাফিলেট ও ফিগিস্‌ মরূদ্যান

খুব বড়। মরূদ্যানে খেজুরগাছই প্রধান। কোথাও কোথাও আবাদ ক'রে ধান, গম, তূলা, তামাক, আখ, আঙুর, জলপাই প্রভৃতি উৎপন্ন করা হয়।



মরূদ্যান

উষ্ণ মরু অঞ্চলে জীবজন্তুর সংখ্যা খুবই কম। উটই এখানকার প্রধান জীব এবং মরুভূমির পক্ষে বিশেষ উপযোগী ; কারণ অল্পপরিমাণ খাদ্যে এবং বিনা জলে এরা অনেক দিন পথ চলতে পারে। উটের পেটের মধ্যে জল জমা ক'রে রাখার একটা পৃথক কুঠুরীর মত আছে ; একবার পূর্ণমাত্রায় জল নিয়ে উট ২০।২১ দিন একাদিক্রমে মরুভূমির মধ্যে চলতে পারে। উটের পায়ের পাতা কতকটা চ্যাপ্টা হওয়ায় বালুর মধ্যে পুতে যায় না। উট শুধু যে মরুভূমিতে মালপত্র এবং যাত্রীবহনের জন্যই ব্যবহৃত হয় তা নয় ; উটের দুধ পুষ্টিকর খাদ্য, এর পশম দিয়ে তৈরি হয় জামা-কাপড়, তাঁবুর ছাউনী, চামড়া দিয়ে হয় জুতা ও অন্যান্য জিনিস ; শুক্‌না মল ঘুঁটের মত জ্বালানিরূপে ব্যবহার করা হয়। উটকে বলা হয় 'মরুভূমির জাহাজ'। উট ছাড়া মরুবাসীদের জীবনযাত্রা চলে না।

মরুভূমির লোক

মরু অঞ্চলে যারা বাস করে তাদের চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—যেমন (১) শিকারী, (২) যাযাবর, (৩) মরূদ্যানবাসী ও (৪) বাইরে থেকে আগত বাসিন্দা। এদের প্রত্যেকের জীবনযাত্রা পৃথক রকমের। মরুভূমির প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে মিল রেখে এরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জীবন যাপন করে।

শিকারী ঃ বুশম্যান

দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমির প্রান্তসীমায় বুশম্যানরা বাস করে। এখানে মরুর সীমান্ত অঞ্চলে যথেষ্ট শিকার মেলে। তা-ই হত্যা ক'রে এদের জীবনধারণ চলে। এরা খাটো, গায়ের রঙ ঈষৎ হলদে বা পিঙ্গল; খুব কর্মঠ এবং কষ্টসহিষ্ণু। এরা স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করে; শিকার করার সময় সুবিধার জন্য কয়েকটি ক'রে পরিবার একত্রিত হয় এবং এই সময় হয় তাদের উৎসবের অনুষ্ঠান।

সরু নল চাটাইএর মত ক'রে বুনে বুশম্যানরা ঘর তৈরি করে; অনেক সময় মাটিতে গর্ত ক'রে তাতেই বাস করে। বাসনপত্রের বিশেষ ব্যবহার নাই। মাটির পাত্র কিংবা উটপাখীর ডিমের খোসা বাটির মত ব্যবহার করে। শুক্‌না কাঠ ঘষে এরা আগুন জ্বালায়।

বুশম্যানরা খুব নিপুণ শিকারী। তীর-ধনুক এদের অস্ত্র। নলের আগায় ধারালো পাথরের টুক্‌রা লাগিয়ে তীর বানায়। তীরের ফলায় বিষ মাখিয়ে দেয়। আত্মরক্ষার জন্য ছোট গদার মত হাতিয়ার আর গাছের মূল খুঁড়ে তোলার জন্য খন্তার মত অস্ত্র এরা ব্যবহার করে। উইএর ডিম এদের কাছে খুব প্রিয় খাদ্য। এগুলি বুশম্যানদের ভাত। খন্তার মত অস্ত্র দিয়ে ঢিবি খুঁড়ে এরা ডিম সংগ্রহ করে। শিকার না পাওয়া গেলে সাপ, টিক্‌টিকি, কেঁচো, পিঁপড়ে, উই ইত্যাদি খেয়ে প্রাণধারণ করে।

বুশম্যানদের স্ত্রীলোকেরা ঝোপ-জঙ্গলে গিয়ে সন্তান প্রসব করে। সন্তানকে তিন বছর বুকের দুধ খাইয়ে পালন করে। তিন বছরের মধ্যে আর সন্তান হ'লে তৎক্ষণাৎ তাকে মেরে ফেলে।

বুশম্যান পুরুষ প্রায় উলঙ্গ থাকে; স্ত্রীলোকেরা কোমরের সামনে ও পিছনে পশুর চামড়া ছোট পট্টির মত ঝুলিয়ে রাখে।

যাযাবর

সাহারা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম মরুভূমি। এর আয়তন ভারতবর্ষের প্রায় ছয়গুণ। ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের বালুকারাশি দিগন্তে বিস্তৃত। প্রান্তর সমতল নয়। ছোট-বড় বালুর ঢিবি সমুদ্রের ঢেউ-এর মত দেখায়। কোথাও গাছপালার চিহ্ন নাই, কেবল স্থানে স্থানে ছোট ঘন কাঁটার ঝোপ। এগুলি উটের খাদ্য। উটের মুখের ভিতর দিকটা খুব শক্ত ব'লে অনায়াসে কাঁটাগাছ খেতে পারে।

মরুভূমির মধ্যে দিনে প্রচণ্ড গরম। মধ্যাহ্নে সমস্ত আকাশ তাম্রবর্ণ ধারণ ক'রে যেন গলিত অগ্নি বর্ষণ করতে থাকে; বালু উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে। সেই সঙ্গে প্রবলবেগে বাতাস বয়; বাতাসের বেগে রাশি রাশি বালু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে স্তূপীকৃত হয়। সমগ্র প্রান্তরময় যেন তাণ্ডব নৃত্য চলতে থাকে। মরুভূমি জলহীন, মমতাহীন।

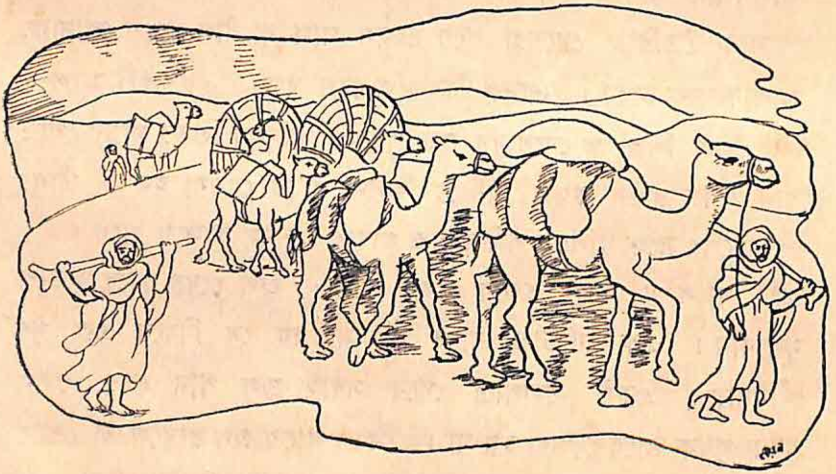
সুদুর্গম দূরদেশ,
পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ,
মহাপিপাসার রঙ্গভূমি। রৌদ্রালোকে
জ্বলন্ত বালুকারাশি সূচি বিঁধে চোখে।
দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশয্যা 'পরে
জ্বরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে প'ড়ে
তপ্তদেহ, উষ্ণশ্বাস বহ্নিজ্বালাময়,
শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ নির্দয়।

মরুভূমির মধ্যে দিনের বেলায় যেমন অগ্নি-ঢালা উত্তাপ, রাত্রিতে তেমনি তীব্র শীত। প্রকৃতি এমন নির্দয় যে মরু অঞ্চলে শস্য উৎপাদন বা মানুষের বসবাস সম্ভবপর নয়। তবে মরুভূমি অতিক্রম ক'রে বণিকের দল বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে যাতায়াত করে ; এরা আরব যাযাবর। পরিবারের সমস্ত লোকজন সঙ্গে নিয়ে, উটের পিঠে বাণিজ্যের সামগ্রী বোঝাই ক'রে মরুভূমি পার হ'য়ে এরা এক মরূদ্যান থেকে অন্য মরূদ্যানে ঘুরে বেড়ায়।

আরব যাযাবররা বলিষ্ঠ ও দুর্দান্ত। এদের অধিকাংশের গায়ের রঙ কালো, চুল কালো, উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চোখ। প্রত্যেকে পরে পুরু লম্বা আলখাল্লা, মাথায় ঘোমটার মত বড় ঢাক্‌নি। উটের লোম দিয়ে পোষাক তৈরি। মেয়েরা পরে উজ্জ্বল লাল বা নীল রঙের পোষাক, আপাদমস্তক ঢাকা। এদের তাঁবুগুলি বেশ বড়। এর দুইটি অংশ— এক অংশ শিশু ও মেয়েদের জন্য পৃথক। তাঁবুর ভিতর মাদুর পেতে তার ওপর রঙিন কম্বল বিছিয়ে বিছানা ক'রে নেওয়া হয়। তাঁবুর দেওয়ালের সঙ্গে থলিতে পরিচ্ছদ ও খাবার জিনিস ঝুলিয়ে রাখে।

রুটি, মাংস ও খেজুর এদের প্রধান খাদ্য। জল এদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। এক ফোঁটাও যাতে নষ্ট না হয় সে বিষয়ে এরা খুব হুঁসিয়ার। একই জলপাত্র থেকে সবাই জল পান করে, ঢেলে পৃথক পৃথক ভাবে দেওয়া হয় না। কোন পাত্রে জল রাখলে তা ভেঙে জল প'ড়ে যেতে পারে ; এইজন্য উটের চামড়া দিয়ে তৈরি থলিতে জল রাখা হয়। জল ঈষৎ লবণাক্ত, তাতে উটের চামড়ার গন্ধ। কিন্তু মরুবাসীদের কাছে তা যেন জীবনদায়িনী সুধা। কখন পথের মধ্যে জল ফুরিয়ে গেলে উট-চালক উটের গলার মধ্যে দীর্ঘ সরু লাঠি চালিয়ে তার পেটের ভিতরকার জলের থলি থেকে জল বমি করিয়ে বের ক'রে নেয় এবং তাই পান ক'রে গলা ভিজায়।

যাযাবররা মরুভূমির মধ্যে যখন রাত্রি কাটায় তখন কতক থাকে তাঁবুর মধ্যে, কতক বাইরে জমা-ক'রে-রাখা মালপত্রের কাছে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমায় ; কাছেই আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়। অতি প্রত্যুষে, সূর্য উদয় হওয়ার অনেক আগেই যাত্রীদল আবার পথ চলতে সুরু করে। প্রখর সূর্যকিরণ বালুকাময় প্রান্তরে যখন আগুনের মত ঝ'রে পড়ে, দিগন্তে দেখা যায় মরীচিকা, মনে হয় যেন কিছুদূরে স্বচ্ছ নির্মল জল টলমল করছে, জলাশয়ের ধারে যেন গাছের সারি ; তার ছায়া পড়েছে কম্পমান সুশীতল জলের ওপর ! কিন্তু এ-সবই মিথ্যা, চোখের ধাঁধা মাত্র।



সাহারা মরুভূমির ভিতর দিয়ে চলেছে যাযাবর দল

মরুভূমির ভিতর ধূলি-ঝড় বড়ই ভয়ংকর। রাশি রাশি তপ্ত বালি তীব্রবেগে ছুটে আসে। এই সময় নাক-মুখ ঢেকে বালির মধ্যে আশ্রয় না নিলে রক্ষা নাই। উট বালির মধ্যে নাক ডুবিয়ে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে থাকে, পথিকরাও চামড়ার থলির মধ্যে ঢুকে আত্মরক্ষা করে।

মরূদ্যানের অধিবাসী

স্বচ্ছ নির্মল জলপূর্ণ জলাশয় ঘিরে সতেজ খেজুরগাছের সারি, কাছেই দুই-একখানা সবুজ মাঠ; মাটির কোঠাঘর, ছাদগুলি তার সমতল। এই হ'ল মরূদ্যানের রূপ। মরুভূমির মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য যারা যাতায়াত করে মরূদ্যান তাদের কাছে পরম প্রিয় আশ্রয়। এখানে তারা পায় পানীয় জল ও খাদ্য। মরূদ্যানের অধিবাসীরা যাযাবরদের কাছে জিনিস বেচে কেনে; তাদের জীবনযাত্রার প্রবাহকে সচল রাখে এই চলমান যাযাবরের দল।

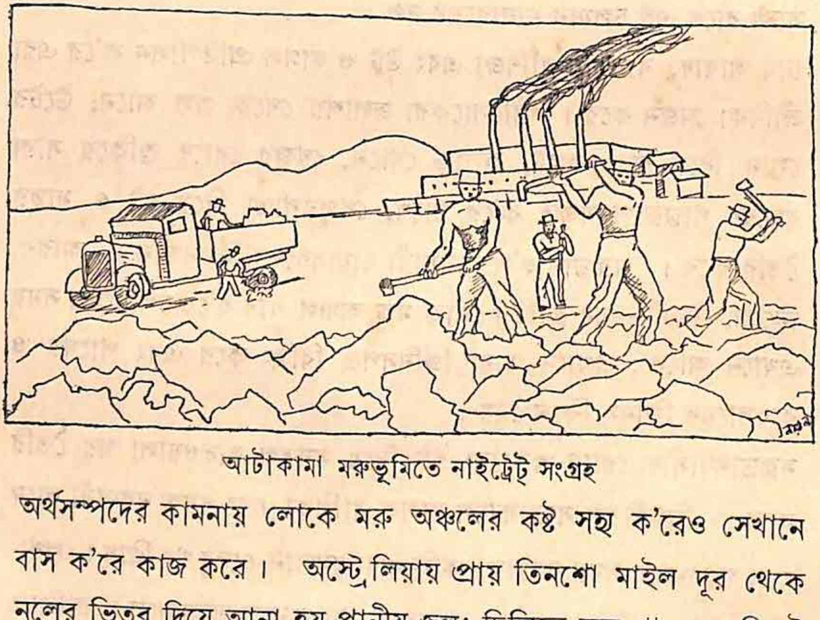
চাষ-আবাদ, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং উট ও ছাগল প্রতিপালন ক'রে এরা জীবিকা অর্জন করে। স্ত্রীলোকেরা জলাশয় থেকে জল আনে, উটের লোম দিয়ে সূতা কাটে, কাপড় বোনে, খেজুর রোদে শুকিয়ে সারা বছরের খাদ্যরূপে মজুত ক'রে রাখে, খেজুরপাতা দিয়ে চট ও মাদুর তৈরি করে। মরূদ্যান হ'ল ব্যবসায়ী যাযাবরদের মিলনস্থান। আরব, নিগ্রো, য়িহুদী—সব জাতির লোক মরু অঞ্চল পার হ'য়ে চলাচলের সময় এখানে আসে; এখানে তারা জিনিসপত্র বিক্রি করে এবং পাথেয় ও ব্যবসায়ের জিনিস কিনে নেয়।

মরূদ্যানবাসীরা রোদে-শুকানো ইট দিয়ে সমতল ছাদওয়ালা ঘর তৈরি করে। স্নিগ্ধশীতল সন্ধ্যাকালে বালক-বালিকা এবং বয়স্ক নরনারী ছাদে বসে গল্পগুজবে সময় কাটায়। কফি এবং ধূমপান এদের খুব প্রিয়। লেখা-পড়ার প্রচলন বিশেষ নাই। লোকেরা গল্প শুনতে ভালবাসে। রাত্রিতে অনেকে ছাদে নিদ্রা যায়। মরূদ্যানে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। অনেক বয়স্ক ব্যক্তি জীবনে কখনও বৃষ্টিপাত দেখেনি, বরফ যে কেমন তা জানে না।

বাইরে থেকে আগত বাসিন্দা

মরু অঞ্চলে যারা স্বাভাবিকভাবে বাস করে তারা এখানকার অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে নিজেদের জীবনধারণের ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে।

এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থা তাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু বিভিন্ন মরু অঞ্চলের খনিজ সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে যে সকল শ্বেতাঙ্গ এই দুর্গম প্রান্তরে বাস করে, তারা আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সরবরাহের চেষ্টা করে। চিলির আটাকামা মরুভূমিতে নাইট্রেট্ সার পাওয়া যায়। বৃষ্টিপাতের অভাবে মাটি শুকিয়ে নাইট্রেটে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরার খনি পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় সোনার খনিও এমনি ঊষর অঞ্চলে অবস্থিত।



আটাকামা মরুভূমিতে নাইট্রেট্ সংগ্রহ

অর্থসম্পদের কামনায় লোকে মরু অঞ্চলের কষ্ট সহ্য ক'রেও সেখানে বাস ক'রে কাজ করে। অস্ট্রেলিয়ায় প্রায় তিনশো মাইল দূর থেকে নলের ভিতর দিয়ে আনা হয় পানীয় জল; চিলিতে জল, খাদ্য, সব-কিছুই আনা হয় বাইরে থেকে। এখানকার বাসিন্দাদের জীবন অস্বাভাবিক, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই ক'রে তারা যেন সাময়িকভাবে টিকে' রয়েছে।

জ্ঞাতব্য

১। উষ্ণ মরুভূমি বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বে বৃহৎ স্থলভাগের পশ্চিমাংশে অবস্থিত দেখতে পাওয়া যায়। এদের অবস্থান ২০ ডিগ্রী এবং ৩০ ডিগ্রী অক্ষাংশের মধ্যে।

২। এই অঞ্চলে বায়ুর প্রবাহ স্থলভাগ থেকে জলভাগের দিকে ব'লে বৃষ্টিপাত হয় না।

৩। বেশীর ভাগ মরুভূমির বালু পাথরচূর্ণ কণা। প্রবল শীত ও গরমে সংকোচন-প্রসারণের ফলে পাথর ফেটে চূর্ণ হ'য়ে যায়।

৪। মরুভূমির গাছপালা মাংসল ; এদের পাতায় মোমের মত চক্‌চকে পদার্থ থাকায় গাছের দেহস্থ জল বাষ্প হ'য়ে যেতে পারে না।

৫। যেখানে বালির অল্প নীচে জলের স্তর থাকে সেখানে মরূদ্যান গ'ড়ে ওঠে। কতক মরূদ্যান খুব ছোট, কতক বেশ বড়।

পঞ্চম অধ্যায়
উষ্ণ তৃণ অঞ্চল

উষ্ণ মরুভূমি অঞ্চল ছেড়ে ক্রমশঃ বিষুবরেখার দিকে এগিয়ে গেলে কাঁটা ঝোপগাছ ও ছোট ছোট ঘাসগুচ্ছ থেকে ক্রমে দীর্ঘ তৃণময় অঞ্চল দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে এখানে-ওখানে গাছও চোখে পড়ে। ঘাস প্রায় ৮।১০ ফুট দীর্ঘ হয়। যতই বিষুব অঞ্চলের কাছাকাছি যাওয়া যায়, ততই গাছের সংখ্যা বাড়তে থাকে। গাছপালার পরিমাণ দেখেই বুঝা যায়, আমরা বৃষ্টিহীন অঞ্চল ছেড়ে ক্রমে বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের দিকে এগিয়ে চলেছি। এই উষ্ণ তৃণময় অঞ্চল সাভানা নামে পরিচিত। বিভিন্ন মহাদেশে এরূপ বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে : দক্ষিণ আমেরিকায় ওরিনকো নদীর অববাহিকায় ল্যানোস্, ব্রেজিলে ক্যাম্পোস্, অস্ট্রেলিয়ায় ডাউনস্ এবং আফ্রিকায় সাভানা। আফ্রিকার তৃণ অঞ্চলই সবচেয়ে বড়। সাহারার দক্ষিণ অংশে পশ্চিম উপকূল থেকে আবিসিনিয়া পর্যন্ত এবং বিষুবরেখা অতিক্রম ক'রে দক্ষিণে প্রসারিত হ'য়ে রোডেসিয়া ও এ্যাঙ্গোলার তৃণ অঞ্চলের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

জলবায়ুর অবস্থা

নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্য প্রায়ই লম্বভাবে কিরণ দেয়, এজন্য এখানে উত্তাপ বেশী। সূর্যতাপে বাতাস হাল্কা হ'য়ে ওপরের দিকে উঠে যায়। যতই ওপরে ওঠে বাতাস ততই শীতল ও ভারী হ'য়ে আবার নীচে নেমে আসে। এইভাবে বাষ্পবাহী উষ্ণ বায়ু শীতল হ'য়ে বৃষ্টিপাত করে। আফ্রিকার সাভানা বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকে বিস্তৃত। সূর্য যখন উত্তর অংশে থাকে তখন সেখানে বর্ষাকাল, দক্ষিণে জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক; আবার সূর্য যখন দক্ষিণ অংশে যায় তখন সেখানে গ্রীষ্ম, উত্তর অংশে বৃষ্টিপাত কম। বছরে সূর্যকে দুইবার বিষুবরেখা অতিক্রম করতে দেখা যায়; তাই সাভানা অঞ্চলে দুইবার বর্ষা ও দুইবার শীত ঋতু। সারা বছরেই তাপমাত্রা বেশ উচ্চ; গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা গড়ে ৮০ থেকে ৯৯ ডিগ্রী, শীতকালে ৭০ ডিগ্রী।

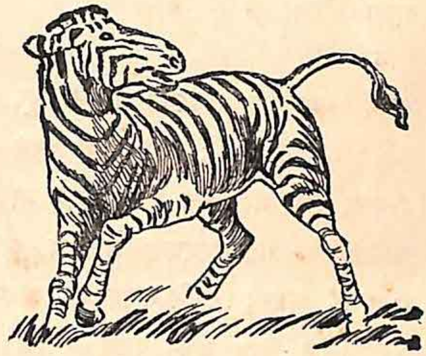
উদ্ভিজ্জ

সাভানা অঞ্চলে সারা বছর সমানভাবে বৃষ্টিপাত হয় না ব'লে বড় গাছ জন্মে না। বর্ষাকালে গাছপালা খুব তাড়াতাড়ি বড় হ'য়ে ওঠে কিন্তু শীতকালে যখন বৃষ্টিপাত খুব কমে যায়, তখন সতেজ সবুজ গাছগুলি শুকিয়ে যায়। গাছের চেয়ে তাই তৃণের প্রাচুর্যই বেশী, কারণ অল্প বৃষ্টিতেই এর বৃদ্ধি সম্ভবপর। হাজার হাজার মাইলব্যাপী তৃণ অঞ্চল নানাজাতীয় তৃণভোজী এবং হিংস্র জীবজন্তুর আবাসভূমি হ'য়ে উঠেছে।

জীবজন্তু

আফ্রিকার সাভানা অঞ্চলে যেমন প্রাণীর বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য এমন আর কোথাও নাই। হরিণ, জেব্রা, জিরাফ, মহিষ দলে দলে চ'রে বেড়ায়। হরিণ ঝাঁকে ঝাঁকে চরে, মাথায় দীর্ঘ শিং। জেব্রা, সাদা-কালোর

ডোরা-কাটা যেন সবাই গায়ে নক্সা-আঁকা গেঞ্জি পরেছে। জিরাফ, বিচিত্র বর্ণের দেহ, লম্বা গলা বাড়িয়ে গাছের মাথা থেকে পাতা খায়; কোথাও সিংহের ডাক শুনলেই প্রাণের ভয়ে হাওয়ার বেগে ছুটতে থাকে। মহিষ, যেমন ভীষণ আকৃতি, তেমনি ভীষণ শিং; দল বেঁধে বিচরণ করে। দলের মধ্যে বাঘ, সিংহ এলে কারো নিস্তার নাই, শিং-এর আগায় আগায় টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে যাবে। তৃণভোজী প্রাণী



জেব্রা

হত্যা ক'রে জীবনধারণ করে সিংহ, চিতাবাঘ প্রভৃতি হিংস্র জীব।



উটপাখী



জিরাফ

পাখীই বা কত রকমের—উটপাখী, ঘোড়ার মত উঁচু, উড়তে পারে না কিন্তু দৌড়ায় প্রায় ঘোড়ারই মত; কেরানী পাখী, মাথায়

তার লম্বা পালক, মনে হয় যেন কানে কলম গুঁজে রেখেছে; সারস, শকুন, ঈগল আর বহু রকমের তিতির, বুনো হাঁস প্রভৃতির রাজ্য এটি।

অধিবাসী

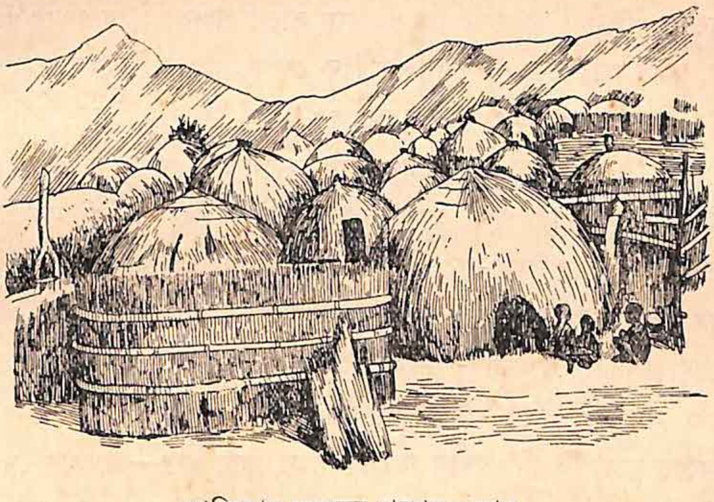
সাভানা অঞ্চলে মানুষের বসতি খুব বিরল, কারণ অধিকাংশ স্থানে ভূমির উর্বরতা কম; শীতকালে যখন বৃষ্টি হয় না তখন জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে না। তাছাড়া শস্য ও পশুর পক্ষে অনিষ্টকর কীট-পতঙ্গের উপদ্রব অত্যন্ত বেশী। উই ও পঙ্গপাল ফসলের শত্রু; সি-সি নামে এক প্রকার বিষাক্ত মাছির আক্রমণ থেকে গৃহপালিত পশু রক্ষা বড়ই কঠিন। এদের দংশনে গরু, ছাগলের মৃত্যু ঘটে।

এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থা এমন যে, কেবল পশুপালন ও কৃষিকার্য ক'রে জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন। স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকে শিকার, কিছু কিছু চাষ-আবাদ এবং পশুপালন—সব রকম উপায়ে জীবনধারণ করে। বা-নিয়ানকোল নামে আফ্রিকার এক জাতি এই উপায়ে জীবনযাপন করে। আলবার্ট হ্রদের পূর্ব অঞ্চলে এদের বাস। এদের আকৃতি দীর্ঘ, চুল মেষের লোমের মত। মাথায় কেবল দুই গুচ্ছ চুল রেখে বাকি সবটা কামিয়ে ফেলে। পরিবারের লোকজন সঙ্গে নিয়ে এরা এক স্থান থেকে অন্যত্র ঘুরে বেড়ায়। এদের ঘর মাটির দেওয়াল বা কাঠের খুঁটির ওপর ঘাসের ছাউনী দিয়ে ঢাকা। বুনো গরুকে এরা নিয়মিত লবণ খাইয়ে বশে আনে এবং দুইয়ে দুধ সংগ্রহ করে। মাংস, দুধ, কলা এদের খাদ্য।

জুলু অধিবাসী

উত্তর-পূর্ব নাটাল অঞ্চলে জুলুদের বাস। এরা কৃষিকার্য ও পশু-শিকার ক'রে জীবিকা নির্বাহ করে। পুরুষেরা তীর-ধনুক দিয়ে বন্য

জীবজন্তু শিকার করে, চাষ-আবাদের কাজ করে স্ত্রীলোকেরা। জুলুদের ঘরগুলি দেখতে কতকটা মৌচাকের মত গোলাকার, ঘাসের ছাউনী; একটিমাত্র ছোট প্রবেশ-পথ। এরূপ ঘরকে বলা হয় ক্রাল্। ঘরের ভিতরে ছাদের সঙ্গে অনেকে ষাঁড়ের মাথায় খুলি ঝুলিয়ে রেখে ঘর সাজায়। এদের বিশ্বাস যে, ষাঁড়ের মাথা অপদেবতার কুদৃষ্টি থেকে তাদের রক্ষা করে।



আফ্রিকার জুলুদের বাসগৃহ—ক্রাল্

ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার সাভানা অঞ্চলেও অনেকে এই ধরনের শিকার ও চাষ-আবাদ ক'রে বাস করে। এই অঞ্চলে বিশেষ ক'রে নিম্নভূমিতে সি-সি মাছির উপদ্রব এত বেশী যে, গৃহপালিত পশু বাঁচানো প্রায় অসম্ভব। সাহারা মরুভূমির প্রান্তসীমায় বাব্লা জাতীয় কাঁটাগাছ প্রচুর জন্মে। এই গাছের ছাল কেটে দিলে যে রস জমে শক্ত হ'য়ে থাকে, তাই হ'ল গাম্ এ্যাকেসিয়া নামে আঠা অর্থাৎ গঁদের আঠা। এ অঞ্চল থেকে যথেষ্ট পরিমাণে আঠা সংগৃহীত হয়।

মৌসুমী অঞ্চল

উষ্ণ মণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত কতকগুলি দেশে প্রতি বছর নিয়মিত সময়ে বৃষ্টিপাতের ফলে সেখানকার বিশিষ্টতা সুস্পষ্টরূপে চোখে পড়ে। এই দেশগুলি হ'ল ভারত, চীন, ইন্দোচীন এবং শ্যাম। এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের ফলেই এখানে বর্ষাকালে প্রচুর বারি-বর্ষণ হ'য়ে থাকে। গ্রীষ্মকালে সূর্যতাপের প্রখরতার জন্য এশিয়ার মধ্যভাগে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। বায়ু তাপে হাল্‌কা হ'য়ে ওপরে ওঠে যায়, তখন ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে বাষ্পবাহী মেঘ সমুদ্রের ওপর দিয়ে দেশের মধ্যে চলে আসে ; ঠিক এইভাবে চীনের দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকেও মেঘ স্থলভাগের দিকে আসে। এর ফলে এই সময় বৃষ্টি হয়। আবার সূর্য যখন বিষুবরেখার দক্ষিণ দিকে লম্বভাবে কিরণ দেয়, তখন উত্তর-পূর্ব দিক থেকে শীতল শুষ্ক বাতাস ভারতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় ; এর ফলে বৃষ্টিপাত হয় না। এই সময় চীনের ওপর দিয়ে উত্তর-পশ্চিমা শীতল ও শুক্‌না বাতাস স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের দিকে বইতে থাকে। বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতা অনুসারে বৎসরের মধ্যে তিনটি প্রধান অবস্থা লক্ষ্য করা যায়—নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত ঠাণ্ডা শুক্‌না আবহাওয়া, মার্চ থেকে মে শুষ্ক এবং উষ্ণ ; অবশিষ্ট পাঁচ মাসে হয় প্রবল বর্ষণ। এ সময় জলবায়ু হয় উষ্ণ ও আর্দ্র। তবে ভারতে এবং মৌসুমী অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলিতে স্থানের উষ্ণতা নির্ভর করে সেখানকার উচ্চতার ওপর, কারণ পাহাড়ের ওপর অবস্থিত স্থানের জলবায়ু শীতল। মৌসুমী অঞ্চলকে বলা হয় গরম ও জলবৃষ্টির দেশ।

উদ্ভিজ্জ

মৌসুমী অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণে যেমন পার্থক্য আছে—কোথাও কম, কোথাও মাঝারি, কোথাও বেশী—তেমনি ভূমির

প্রকৃতি ও অবস্থানে আছে বৈচিত্র্য। উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ থেকে নিম্ন সমভূমি পর্যন্ত সকল প্রকার ভূ-প্রকৃতি এখানে বিদ্যমান। কাজেই বহুবিধ রকমের উদ্ভিদ এ অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের পর্বতময় অংশে দেখা যায় ওক, সিডার প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ, ম্যাগনোলিয়া, রডোডেনড্রন; বৃষ্টিবিরল শুষ্ক অংশে আছে কাঁটাযুক্ত ঝোপগাছ; বৃষ্টিবহুল অংশে বাঁশ, শাল, সেগুন, বট প্রভৃতি বনস্পতির প্রাচুর্য। ব্রহ্মদেশের সেগুন পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট।

জীবজন্তু

মৌসুমী অঞ্চলের বনে বহু রকমের জীবজন্তু বাস করে। এদের মধ্যে প্রধান হ'ল হাতী, গণ্ডার, বাঘ, হায়েনা, হরিণ, বুনো মহিষ প্রভৃতি। পাহাড়ে অঞ্চলে আছে কালো ভালুক, নদীতে আছে অসংখ্য কুমীর, বনে-জঙ্গলে আছে নানাজাতীয় সাপ, পার্বত্য জঙ্গলে আছে বিরাট বিরাট অজগর যা হরিণ ও অন্যান্য প্রাণী ধ'রে খায়; বিষধর সাপও আছে নানা প্রকার।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে গো মহিষ, ছাগল ভেড়া, হাতী ঘোড়া প্রভৃতি প্রধান।

উৎপন্ন ফসল

উষ্ণ মৌসুমী অঞ্চলে ধান, পাট, আখ, পার্বত্য অংশে চা উৎপন্ন হয়। প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে এবং উচ্চ পর্বতশ্রেণী দেশের অভ্যন্তরে মোটামুটি পূর্ব-পশ্চিমে অবস্থিত থাকায় এ অঞ্চল হয়েছে নদীবহুল। নদীগুলি বারো মাস জলপূর্ণ থাকে; তাতে কৃষিকার্যের পক্ষে খুব সুবিধা।

আনারস, কলা, আম, জাম, নারিকেল প্রধান ফল।

এই মৌসুমী অঞ্চল ঘন লোকবসতিপূর্ণ। এখানে দুটি জাতির লোকই সংখ্যায় বেশী—আর্য হিন্দু এবং মোঙ্গলীয়। মোঙ্গলীয়দের মধ্যে চীনা অধিবাসীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। এ দুই জাতির লোকই অতি

প্রাচীনকালেই নিজেদের সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিল এবং বহু শতাব্দীর নানা রাজনৈতিক বিবর্তনের ভিতর দিয়েও তাদের সংস্কৃতির ধারা বহন ক'রে চলেছে। এ দেশগুলি কৃষিপ্রধান ; ভূমি উর্বরা, জলবায়ু লোকবৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল। প্রধানতঃ নদীর তীরে বড় বড় শহর, বন্দর ও সভ্যতার কেন্দ্র গ'ড়ে উঠেছে। চীন এবং ভারতবর্ষ উভয়ই নদীমাতৃক দেশ ; এদের সভ্যতা নদীকেন্দ্রিক এবং নদীর সঙ্গে মানুষের কর্মজীবন নিবিড়ভাবে জড়িত। দেশ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। পলিমাটি-বাহিত নদীস্রোত ভূমিকে উর্বরা করে ; যেখানে জল স্বাভাবিকভাবে মাঠে পোঁছায় না সেখানে জলসেচের সাহায্যে শস্য উৎপাদন করা হয়। নদীপথে চলে ব্যবসায়-বাণিজ্য ; আজকাল নদীর জলধারাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে জমিতে সেচকার্যের সুবিধা এবং জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করার আয়োজন চলেছে।

ভারত ও ভারতবাসী

ভারতবর্ষ এশিয়া মহাদেশের মাঝামাঝি দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী একে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়—উত্তরে দীর্ঘ হিমালয় পর্বতমালা, হিমালয়ের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ সমভূমি এবং তার দক্ষিণে ত্রিভুজাকার মালভূমি দুই দিকে সমুদ্র দিয়ে বেষ্টিত। এর প্রতিটি অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হয়েছে।

ভারতবর্ষ হিমালয় পর্বতের স্নেহপুষ্ট সন্তানের মত। মৌসুমী বায়ু দক্ষিণ ও পশ্চিমের সমুদ্র থেকে যে বাষ্পরাশি দেশের মধ্যে নিয়ে আসে, হিমালয়ে প্রতিহত হ'য়ে তা প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গগুলি সারা বছর তুষারাচ্ছন্ন থাকে। সেইখানেই ভারতের প্রধান নদীগুলির উৎপত্তিস্থল। সমুদ্রের জল মেঘবাহিত হ'য়ে হিমালয়-শীর্ষে বর্ষিত হয় ; তা আবার দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে সমুদ্রে আসার পথে ভূমিকে করে উর্বরা শস্যশ্যামলা, মানুষের কর্মজীবনকে করে সমৃদ্ধ।

দীর্ঘ উচ্চ প্রাচীরের মত হিমালয় ভারতের উত্তর সীমান্ত দিয়ে দণ্ডায়মান না থাকলে মৌসুমী বায়ু যে মেঘ নিয়ে আসে দেশের অভ্যন্তরে, তা থেকে বৃষ্টি হ'ত না এবং দেশের পক্ষে সুজলা সুফলা হওয়ার কোন সম্ভাবনাও থাকতো না। শুধু তাই নয়, শীতকালে উত্তর অঞ্চল থেকে হিমশীতল শুষ্ক বাতাস দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হ'ত ; জলবায়ু হ'ত গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরম, শীতকালে অত্যন্ত শীত।

উত্তর ভারতের সমতলভূমির ওপর দিয়ে প্রধান নদীগুলি প্রবাহিত। এই সমভূমি অঞ্চল ভারতের শস্য-ভাণ্ডার। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সমৃদ্ধি নদীতীরবর্তী অঞ্চলেই গ'ড়ে উঠেছিল। এই অঞ্চল সবচেয়ে বেশী লোকাকীর্ণ।

মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মালভূমি অংশে ভারতের প্রধান খনিজ সম্পদ নিহিত। এখানকার জলবায়ু ভূমির উচ্চতার জন্য কিছুটা স্নিগ্ধ। এ অঞ্চলের অরণ্যে মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায় ; কৃষিযোগ্য ভূমিতে ফসলও ফলে প্রচুর।

হিমালয় পর্বত শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে উত্তর, উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব দিক থেকে ভারতবর্ষকে এশিয়ার অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে। এখানকার জলবায়ু মনোরম ও স্বাস্থ্যপ্রদ ; কৃষি দ্বারা সহজেই খাদ্য উৎপন্ন করা যায়। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোহর। এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় খেয়ে প'রে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে এখানে কঠিন সংগ্রামের সম্মুখীন হ'তে হয়নি। তাই শান্ত উদার নির্মল পরিবেশে ভারতবাসীরা তাদের নিজস্ব সভ্যতা গ'ড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছিল। প্রাচীনকালে ভারতের বাইরে থেকে বিভিন্ন জাতির লোক এখানে এসেছিল। কালক্রমে তারা এদেশের সভ্যতা ও সমাজের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে ভারতীয় হ'য়ে গেছে। ভারত হয়েছে মহামানবের তীর্থক্ষেত্র, প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি।

নব ভারত

ভারতবর্ষে হিন্দু যুগের অবসানের পর প্রায় আট শত বৎসর বিদেশী শাসক এদেশে রাজত্ব করেছে। এই পরাধীনতার যুগে ভারতের শিল্প-সভ্যতার ওপর বিদেশীর প্রভাব পড়েছিল কিন্তু ভারত তার নিজস্ব ভাবধারা হারিয়ে ফেলেনি। ইংরেজ আমলে ভারতবাসী পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। ক্রমে তাদের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের বাসনা প্রবল হ'য়ে উঠতে থাকে ; এর ফলে সুরু হয় বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন। প্রথম দিকে এ আন্দোলন ছিল হিংসাত্মক। দেশপ্রেমিক যুব-সম্প্রদায় বোমা বন্দুক ব্যবহার ক'রে অত্যাচারী শাসককে বিতাড়িত করতে চেয়েছিল কিন্তু নিরস্ত্র দেশবাসীর পক্ষে একাজ সম্ভবপর ছিল না। স্বাধীনতার আন্দোলনকে সাফল্যের পথে নিয়ে আসেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করেন। তাঁর কথা হ'ল—ভারতবর্ষ আমাদের দেশ ; এর শাসন চালনার দায়িত্ব আমাদের। বিদেশীর কোন আইন আমরা মানবো না ; বিদেশীর সঙ্গে সহযোগিতা করবো না ; বিদেশীর পণ্যদ্রব্য ব্যবহার করবো না ; বিদেশীর অত্যাচারের সম্মুখে সম্পূর্ণ অহিংস, শান্ত এবং নির্ভীক থাকবো। গান্ধীজীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতের জনগণ জেগে উঠলো ; বৃটিশের পক্ষে দেশে শাসন-কর্তৃত্ব রাখা সম্ভবপর হ'ল না। দেশত্যাগের পূর্বে ইংরেজ শাসক ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে দিয়ে গেল—এক ভাগ ভারত, অন্য ভাগ পাকিস্তান। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতবাসীর কাছে মহাত্মা গান্ধী জাতির জনকরূপে পূজিত।

ভারত একটি উপমহাদেশ। এর বর্তমান লোকসংখ্যা ৩৫ কোটি ৭০ লক্ষ—পৃথিবীর মানুষের সাত ভাগের এক ভাগ। কেবল চীনদেশ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন দেশে এত বেশী অধিবাসী নাই। ভারত

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম গণতন্ত্র ; এদেশে বয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই ভোটদানের অধিকার আছে। ভোটারের সংখ্যা পৃথিবীর অন্য যে-কোন দেশের চেয়ে বেশী।

উষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত সর্বদক্ষিণ প্রান্ত কন্যা কুমারিকা থেকে ভারত উত্তর দিকে দুই হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরে তুষারমৌলি হিমালয়, দক্ষিণ তিন দিকে ঘিরে সমুদ্র, দেশের মধ্য দিয়ে অসংখ্য জলধারা প্রবাহিত। হিমালয়ের পাদদেশ ও মালভূমি অংশ অরণ্যে আবৃত। বর্ষায় নিবিড় কালো মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়, বারিবর্ষণে ভূমি হয় স্নিগ্ধ শীতল। দিনে নির্মল সূর্যকিরণে দেশ ঝলমল করে ; রাত্রিতে রূপালি জ্যোৎস্নার মায়াজাল।

প্রকৃতির দান

প্রকৃতি ভারতকে সম্পদ ও সৌন্দর্যে ভূষিত করেছে। এদেশে আছে শাল, দেওদার, শিশু, চন্দন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাঠের বন ; বনে, প্রান্তরে, পর্বত-গাত্রে, জলাশয়ে আছে অসংখ্য বিচিত্র বর্ণের পুষ্প ; কতক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করে, কতক সুগন্ধে বাতাস করে মন্থর। দক্ষিণ উপকূলে আছে অসংখ্য নারিকেল কুঞ্জ, আম ও কলা বন। সকল রকম ফলই এদেশে ফলে। এদেশের বটবৃক্ষ একাই যেন একটি বন ; ডাল থেকে শিকড় মাটিতে নেমে আসে বড় বড় থামের মত ; তার সাহায্যে বটগাছ চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়ে বিস্তার করে আপন মহিমা।

গ্রীষ্মের খরতাপে মাঠের ঘাস শুকিয়ে ওঠে, ঝোপজঙ্গল শীর্ণ বিবর্ণ হ'য়ে যায়। গাছপালা, পশুপক্ষী, মানুষ সবাই বৃষ্টিধারার জন্য উন্মুখ হ'য়ে থাকে। এমন কালে দক্ষিণ দিকের সমুদ্র থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ গুরুগম্ভীর গর্জনে দেশের মধ্যে চলে আসে এবং সুশীতল বারিধারায় তৃষ্ণার্তকে করে তৃপ্ত। প্রকৃতির মধ্যে নবজীবনের সাড়া প'ড়ে যায়। গাছপালা সতেজ শ্যামল রূপ ধারণ করে, সবুজ ঘাসে মাঠ-প্রান্তর ছেয়ে

যায়। ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং জাতীয় সম্পদের কথা স্মরণ ক'রে বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত মোক্ষমূলর বলেছিলেনঃ পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশকে যদি আমাকে বের করতে বলা হয় যেখানে প্রকৃতি সম্পদ, শক্তি ও সৌন্দর্যসুষমা সবচেয়ে বেশী মাত্রায় দান করেছেন— যেখানকার কতক স্থান সত্যই ভূ-স্বর্গের মত, তবে আমি ভারতের প্রতিই নির্দেশ ক'রে দেখাব।

পোষাক-পরিচ্ছদ

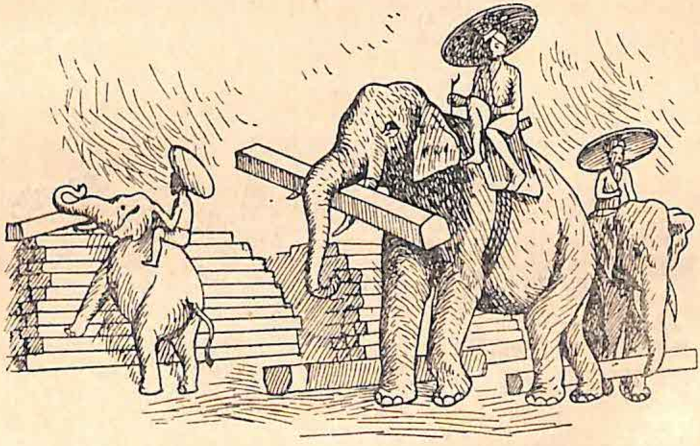
ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা এবং জলবায়ুতে যেমন আছে বৈচিত্র্য, তেমনি অধিবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদ হয়েছে নানা রকমের। ভারতের বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকই রঙিন সাড়ী কাপড় প'রে থাকে। গরম জলবায়ুর দেশে এরূপ বস্ত্র উপযোগী; পরার কৌশলে সাড়ী মহিলাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। রাজপুতনার স্ত্রীলোকেরা পরে রঙিন ঘাগরা ও জ্যাকেট; পাহাড় অঞ্চলের মেয়েরা ভেলভেট জ্যাকেট এবং রঙিন পায়জামা ব্যবহার বরে। পল্লী-অঞ্চলের সাধারণ স্ত্রীলোক সাড়ী ও ব্লাউস কিংবা ঘাগরা ও ব্লাউসের সঙ্গে পরে দোপাট্টা। বাঙালীরা পরে ধুতি ও সার্ট বা পাঞ্জাবি। রাজপুত ও শিখেরা পরে সাদা পায়জামা, গায়ে-আঁটা কোট ও রঙিন পাগড়ি।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু যেমন পৃথক রকমের, ভারতবাসীর খাদ্যেও তেমনি আছে কিছু পার্থক্য। ভাত, রুটি, মাংস, মাছ, দুধ, শাক-সব্‌জি সাধারণ খাদ্য। যে অঞ্চলে যে খাদ্যবস্তু বেশী উৎপন্ন হয় তাই সাধারণতঃ মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।

ব্রহ্মদেশ

সমগ্র ব্রহ্মদেশ মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্গত। গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এদেশের প্রধান নদী ইরাবতী সমুদ্র থেকে নয় শত মাইল

পর্যন্ত নৌবাহনযোগ্য। এ নদী এত বেশী পরিমাণে পলিমাটি ব'য়ে আনে যে, বঙ্গোপসাগরের নীল জল অনেক দূর পর্যন্ত হলদে হ'য়ে থাকে। ইরাবতী নদীকে অবলম্বন ক'রেই ব্রহ্মদেশের সমৃদ্ধি। ধান ও কাঠ এদেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। নদী উপত্যকায় হয় ধানের চাষ, আর বৃষ্টিবহুল পার্বত্য অঞ্চলে রয়েছে সেগুন কাঠের বন। পাহাড়ময় অঞ্চলের নিবিড় বন থেকে ভারী কাঠ ব'য়ে বের ক'রে নিয়ে আসার জন্য পোষা হাতী কাজে লাগানো হয়। জোয়ান দাঁতালো



ব্রহ্মদেশে হাতী দিয়ে কাঠ বহন করানো হচ্ছে

হাতীগুলি শুঁড় দিয়ে কাঠ বড় দুইটি দাঁতের ওপর তুলে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে রাখে; বন-জঙ্গলের মধ্য থেকে টেনে আনে ফাঁকা জায়গায়। হাতী ছাড়া বন থেকে কাঠ বাইরে আনা অন্য কোন প্রকারে সম্ভবপর নয়।

পোষাক-পরিচ্ছদ

বর্মী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই একই প্রকার পোষাক পরে। রেশম বা সুতীর লুঙ্গি এবং ছোট সাদা জ্যাকেট তাদের সাধারণ পরিচ্ছদ।

উৎসবের সময় পুরুষ পরিধান করে বিচিত্র রঙের দীর্ঘ রেশমের লুঙ্গি, আর মেয়েরা পরে মাটি-পর্যন্ত-লুটিয়ে-পড়া নক্সা-করা রেশম বস্ত্র। মেয়েরা চুল খোঁপা ক'রে বেঁধে তাতে ফুল এমনভাবে ধারণ করে যাতে তা ডান কাঁধের ওপর দিয়ে পড়ে। পুরুষরা মাথায় একখণ্ড রঙিন কাপড় বেঁধে রাখে, একে বলে গাউং-বাউং। বর্মীরা বৌদ্ধ। তাদের



সোয়ে-ডাগন প্যাগোডা

প্রধান পূজা-মন্দির হ'ল রেঙ্গুনের সোয়ে-ডাগন বা স্বর্ণ প্যাগোডা। বুদ্ধ-মূর্তির সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে ফুল দিয়ে তারা ভক্তি নিবেদন করে। মন্দিরে যাওয়ার সময় এবং উৎসবের দিনে বর্মীরা সুন্দর সাজসজ্জা করে।

বাসগৃহ ও খাদ্য

ব্রহ্মদেশে বাঁশ ও কাঠ প্রচুর উৎপন্ন হয়। গ্রামাঞ্চলে বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঘর করা হয়; তাতে তালপাতার ছাউনী ও বাঁশের চাটাই

দিয়ে বেড়া। অবস্থাপন্ন লোকেরা কাঠের ঘর ক'রে রঙ ক'রে দেয়। দেশে ধান প্রধান ফসল ; নানারকম ফলও হয় প্রচুর। ভাত, মাছ, মাংস এদের প্রধান খাদ্য। বর্মীরা দিনে দুইবার খায় কিন্তু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা দুপুরের পর আর কোন খাদ্য গ্রহণ করেন না। খাদ্যদ্রব্যের অনটন না থাকায় লোকেরা দিল্‌দরিয়া। অর্থশালী লোকেরা স্ত্রী-কন্যাদের সাজসজ্জার জন্য মূল্যবান অলংকার কিনে দেয়, প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনকে ভোজে আপ্যায়িত করে ; কেউ কেউ ভগবান বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্যাগোডা তৈরি ক'রে দেয়।

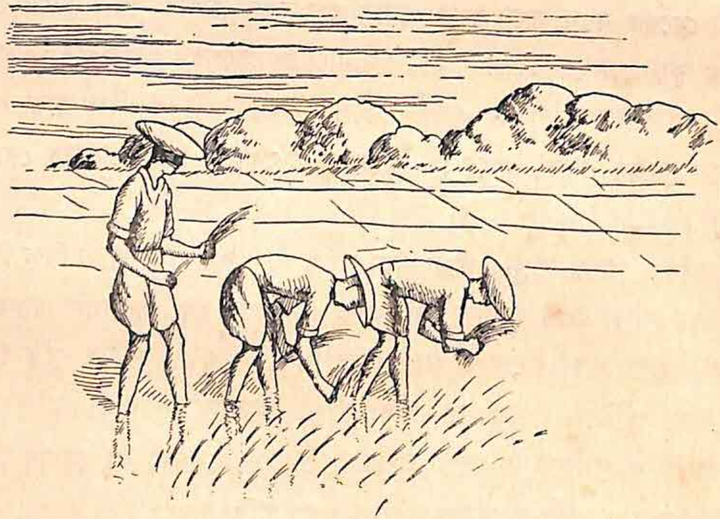
বর্মী মেয়ের বয়স যখন বছর এগার হয় তখন রূপার কাঁটা দিয়ে তার কান ফুটো ক'রে দেওয়া হয়, আমাদের দেশের চূড়াকরণের মত। এটি পরিবারের পক্ষে একটি বিশেষ উৎসব। এর দিন সাত পরে মেয়ে কানে গহনা পরে ; যন্ত্রণায় চীৎকার করলেও তার রেহাই নাই।

ছেলেদের পায়ে হাঁটু থেকে উরু পর্যন্ত নীল রঙ দিয়ে উল্কি চিহ্ন দিয়ে দেওয়া হয়। এটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক প্রক্রিয়া এবং সবখানি একবারে করা সম্ভবপর হয় না, অল্প অল্প ক'রে কিছুদিন ধ'রে শরীর স্ূঁচ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পাকা রঙ করা হয়। অত্যন্ত বেদনাদায়ক হ'লেও ছেলেরা শান্তভাবে তা সহ্য করে ; উল্কি না দেওয়া বা দেবার সময় চীৎকার করা বর্মীদের কাছে কাপুরুষতার পরিচায়ক।

সাবালক হওয়ার আগে প্রত্যেক বর্মী বালককে কিছুদিনের জন্য কোন বৌদ্ধ মঠে থাকতে হয়। তখন সে গৈরিক পরিচ্ছদ পরে এবং মঠের নিয়মকানুন পালন করে। তারপর বেশীর ভাগ যুবক সংসারে ফিরে আসে এবং নানা কাজে লিপ্ত হয়, অল্পসংখ্যক মঠে সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করে। ব্রহ্মদেশে হাজার হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ আছে ; সমাজের লোকেরা এদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে।

চীনদেশ ও চীনা

চীন বিরাট দেশ। এর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয়; মাঠে ধান উৎপন্ন হয় প্রচুর। চীনের প্রধান নদী হোয়াং হো এবং ইয়াংসিকিয়াং। হোয়াং হো নদীর জলের সঙ্গে প্রচুর হলুদ রঙের পলিমাটি আসে এবং যেখান দিয়ে প্রবাহিত হয় তার আশেপাশের জমি উর্বর করে। চীনের লোকসংখ্যা খুব বেশী। খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপযোগী জমি এরা কখনই পতিত ফেলে রাখে না।



চীনে ধানচাষ

পল্লী-অঞ্চলে চীনাদের বাড়ী-ঘর মাটি দিয়ে তৈরি, তাতে খড়ের ছাউনী; কতকগুলি বাঁশ দিয়ে প্রস্তুত। অধিকাংশের বাড়ীতে একখানিমাত্র ঘর; তাতে পরিবারের সবাই এমন কি পোষা শূয়োরগুলিও থাকে। ভাত, মাছ, মাংস, তরকারি চীনাদের প্রধান খাদ্য। শামুক, গুগ্‌লি, ব্যাঙ ও এক প্রকার পাখীর বাসা দিয়ে এরা উপাদেয় খাদ্য তৈরি করে।

চীনারা দুধ খায় না ; চা খায় সবাই। বাঁশের কচি চারা তরকারি হিসাবে এদের প্রিয় খাদ্য। এরা দুটি কাঠির সাহায্যে খাবার তুলে মুখে দেয়। চীনাদের গায়ের রঙ হলদে, মুখ কতকটা চ্যাপ্‌টা ; চোখ ছোট এবং ওপরের দিকে কাৎভাবে টানা। এদের চুল কালো এবং সাধারণতঃ সোজা-সোজা। চীনারা ঢিলা পায়জামা ও কামিজ পরে।

চীনারা শিশুদের খুব আদর-যত্ন করে। মেয়েদের চেয়ে ছেলের আদরই বেশী। ছেলেমেয়েকে পিতামাতার বাধ্য হ'তে শিক্ষা দেওয়া



চীনের রেশম শিল্প

হয়। প্রাচীনকালে চীনা মেয়েদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পা বেঁধে রাখার রীতি ছিল। সাধারণ আকারের পা হ'লে তা ছিল নিন্দার বিষয় ; যে মেয়ের পা যত ছোট তার ছিল তত সুখ্যাতি। এজন্য চীনা মায়েরা মেয়ের পা কাপড় দিয়ে শক্ত ক'রে বেঁধে রাখত। এর ফলে পায়ের আঙ্গুল বেঁকে যেতো পায়ের তলার দিকে। এই অস্বাভাবিক প্রথা এখন আর প্রচলিত নাই।

অতি প্রাচীনকাল থেকে চীনদেশে ভাল রেশম তৈরি হয়। এখানে মুল্‌বেরি গাছ জন্মে। রেশম-কীট এর পাতা খায়। অনেকে বাড়ীতে রেশম-কীট পালন করে। এই কীট মুখ থেকে এক প্রকার লালা বের ক'রে গুটি তৈরি করে। এই গুটি থেকে রেশম-সূতা প্রস্তুত হয়। চীনা মেয়েরা রেশম-কীটের গুটি এবং সূতা রেশম-কারখানায় বিক্রি করে। চীনের রেশম উৎকৃষ্ট।

দক্ষিণ চীনে বড় বড় নদীতে হাজার হাজার চীনা বারো মাস নৌকায় বাস ক'রে মাছ ধরা ও অন্যান্য ব্যবসায়-বাণিজ্য করে। তাদের যাবতীয় সম্পত্তি তারা নৌকাতেই রাখে, তাদের পরিবারের লোকজন, এমন কি পোষা হাঁস, মুরগী এবং শূয়োরগুলি পর্যন্ত। খাঁচাতে ক'রে এগুলি তারা নৌকার বাইরের দিকে ঝুলিয়ে রাখে।

জ্ঞাতব্য

১। মৌসুমী বায়ু একটি বিশেষ ধরনের বায়ু-স্রোত যা প্রতি বৎসর নিয়মিত-কালে এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।

২। মহাদেশের মধ্যভাগে গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা হয় অত্যধিক, শীতকালে শীতের তীব্রতা হয় খুব বেশী ; এই কারণে এরূপ বায়ু-প্রবাহের উৎপত্তি হ'য়ে থাকে।

৩। গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বায়ু সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় ব'লে এ সময় বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালীন মৌসুমী স্থলভাগের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় ; এজন্য এ সময় বৃষ্টি হয় না।

৪। মৌসুমী অঞ্চলে উষ্ণ জলাভূমি এলাকা, উর্বর প্রান্তর এবং মরুভূমি আছে। এ অঞ্চলে নানা ধরনের ফসল উৎপন্ন হ'য়ে থাকে।

৫। মৌসুমী অঞ্চলের প্রধান ফসল ধান।

৬। এই অঞ্চলের হিন্দু এবং চীনা অধিবাসীরা অতি প্রাচীনকালে—যখন ইউরোপের দেশসমূহ সভ্যতার আলোকমাত্র পায় নাই—তখনই সভ্যতার পত্তন করেছিল। এখানে খাদ্যদ্রব্য সহজেই প্রচুর পরিমাণে মিলতো ; তাই সভ্যতা সংস্কৃতির উন্নতি হয়েছিল দ্রুত।

৭। এই অঞ্চলের লোকেরা স্বভাবতঃ শান্ত এবং ধীর। জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী উদার। কাজে তাড়াহুড়া নাই; দীর্ঘদিন ধ'রে অধ্যবসায়ের সঙ্গে সূক্ষ্ম কারুকার্য করা শিল্পীদের বৈশিষ্ট্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নিরক্ষীয় উষ্ণ মণ্ডল

উষ্ণ মণ্ডলে অর্থাৎ নিরক্ষরেখার উত্তরে ২৩½ ডিগ্রী এবং দক্ষিণে ২৩½ ডিগ্রী পর্যন্ত স্থানের মধ্যে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। বছরে দুইবার ক'রে সূর্য নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে—একবার ৯ই চৈত্র, অন্যবার ৯ই আশ্বিন। এর ফলে সারা বছর ধ'রেই এ অঞ্চলে বায়ুর উষ্ণতা থাকে অতি তীব্র। প্রচণ্ড সূর্যকিরণে রাশি রাশি বাষ্প শূন্যে ওঠে যায়; ওপরে উঠে বাষ্প শীতল ও ঘনীভূত হ'য়ে প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটায়। প্রতিদিন অপরাহ্ণে নিয়মিত সময়ে মুষলধারে বারিবর্ষণ হয়। উষ্ণতা যত তীব্র, বৃষ্টিপাত তত প্রবল।

বৎসরব্যাপী বৃষ্টিপাতের ফলে নিরক্ষরেখার ওপরে এবং এর উত্তরে ও দক্ষিণে কিছুটা নিম্ন অঞ্চল জুড়ে নিবিড় অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকায় আমাজন নদীর তীরে, পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে, মধ্য-আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিকায়, দক্ষিণ মালয়ে এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এরূপ ঘন বন বিদ্যমান।

নিরক্ষীয় অঞ্চলের বনের বৈশিষ্ট্য

সারা বছর প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয় ব'লে নিরক্ষ অঞ্চলের বন অত্যন্ত ঘন, সতেজ এবং দ্রুত বর্ধনশীল। নানাজাতীয় ছোট-বড় গাছ ও লতাগুল্ম পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে যেন আত্ম-বিস্তারের চেষ্টা করছে। গাছের ঘন শ্যামল সতেজ পাতা পরস্পরের সঙ্গে মিশে যেন বিরাট এক সবুজ চন্দ্রাতপ রচনা করেছে। গাছপালা উঠেছে স্তরে

স্তরে—মনে হয় যেন ছোট এক ধাপ, তার পর আরো উঁচু এক ধাপ, তার ওপর আরো উঁচু ধাপ, এমনিভাবে অবশেষে বনস্পতির শীর্ষদেশ —তাতে অসংখ্য লতার বেড়াজাল। বড় গাছগুলি ওপরের দিকে মাথা তুলে আলো পাওয়ার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে; গোড়ার দিকে দীর্ঘ সরল কাণ্ড অনেক দূর পর্যন্ত ডালপালা নাই। গাছের সবখানি শক্তি অন্যের চেয়ে বেশী উঁচুতে নীল আকাশে মাথা তুলে ডালপালা মেলে ধরার চেষ্টাতেই নিয়োজিত। বেশীর ভাগ গাছের মোটা উঁচু ডাল থেকে ঝুরি নামে এবং গাছের গোড়ায় বিরাট কুলার মত পট গাছকে মাটি আঁকড়ে থাকতে সাহায্য করে।

এ অঞ্চলের বনের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, একই জাতীয় অধিক সংখ্যায় কাছাকাছি জন্মে না; বিভিন্ন শ্রেণীর গাছ পাশাপাশি পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে বেঁচে রয়েছে। কতকগুলি গাছের আকার বিরাট, উচ্চতা দুই শত ফুটেরও বেশী, যেমন শিমূল, ব্রাজিল-নাট্, ব্রাজিল-কাট্ প্রভৃতি; অধিকাংশের উচ্চতা একশত ফুটের মত। বনের মধ্যে বেশীর ভাগ জায়গায় সূর্যকিরণ প্রবেশ করে না। যেখানে কিছুটা ফাঁকা এবং আলো প্রবেশের সুযোগ পায় সেখানে ঝোপজঙ্গল এমন ঘন যে, তার মধ্যে যাওয়া একান্ত অসাধ্য। এ অঞ্চলের স্বাভাবিক গাছ হ'ল—নানাজাতীয় পাম, সিন্‌কোনা, কোকো, রবার, কাসাভা, সার্সাপেরিলা, পেয়ারা, কলা, আনারস প্রভৃতি।

জীবজন্তু

নিরক্ষ অঞ্চলের বনের অভ্যন্তর ভাগ ঘন ঝোপঝাড়ে ঢাকা, ওপরে লতাপাতার ঘন আচ্ছাদন; আলো-বাতাস প্রচুর নয়। এরূপ অবস্থায় বেশী জীবজন্তু বাঁচতে পারে না। বেশীর ভাগ জীবই বৃক্ষচারী; গাছের ওপর বাস করে, এক গাছ থেকে অন্য গাছে চলাফেরা করে। ব্রাজিলের আমাজন নদীর অববাহিকার বনে বিড়ালজাতীয় প্রাণী বেশী—জাগুয়ার

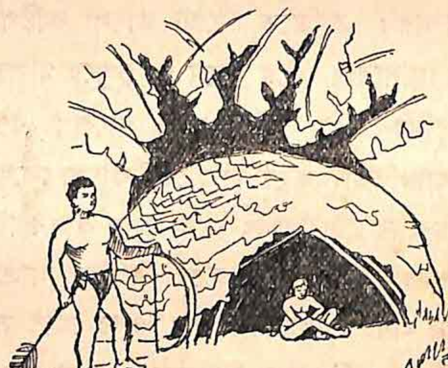
আমাদের দেশের বাঘের মত, পুমা, তাপির, আর্মাডিলো প্রভৃতি। আফ্রিকার বনে দেখা যায় গণ্ডার, শূয়োর এবং নানাজাতীয় হরিণ। গাছের ওপর বাস করে অসংখ্য বানর, ঝাঁক ঝাঁক পাখী, ছোট-বড় সাপ, গেছো ব্যাঙ, টিক্‌টিকি, গিরগিটি যে কত ধরনের ও সংখ্যায় কত তার ইয়ত্তা নাই। আর আছে কীট-পতঙ্গ—বিচিত্র বর্ণের, বিচিত্র আকৃতির। এদের অবিরাম ঝিল্লিধ্বনিতে বনভূমি সর্বদা মুখরিত থাকে, মনে হয় যেন নানা সুরের কোটি কোটি বাঁশি বিরাট বনসভায় মহা ঐক্যতান বাজিয়ে চলেছে।

আফ্রিকায় নিবিড় অরণ্য। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় প্রায় সমান অন্ধকার। রাত্রিতে নিরেট কালো কষ্টিপাথরের মত জমাট অন্ধকার যেন শ্বাসরোধ ক'রে আনে। ত্নপুরে গলিত আগুনের মত সূর্যের তেজ বনভূমির ওপর বর্ষিত হ'তে থাকে; বনের অভ্যন্তরে গুমট গরম। আবার বিকাল হ'তে না হ'তেই কালো মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়। চোখ-ধাঁধাঁনো বিত্যুৎ-চমক্ আর কান-ফাটানো মেঘের গর্জন। বনের জীবজন্তু ভীতিবিহ্বল হ'য়ে নিরাপদ আশ্রয় সন্ধান করে। সুরু হয় বৃষ্টির ধারা। আকাশ যেন ওপর থেকে সমুদ্রের জল ঢালতে থাকে। সেই সঙ্গে বিত্যুতের ঝিলিকে আকাশ যেন খান্‌খান্ হ'য়ে ভেঙ্গে পড়ে। বড় বড় গাছের মাথায় পড়ে বাজ, কাতর আর্তনাদ ক'রে তা ফেটে চৌচির হ'য়ে যায়। প্রকৃতির রুদ্রলীলা চলে কিছুকাল ধ'রে। সন্ধ্যা পার হ'য়ে যায়, রাত্রি আসে। বর্ষণশেষে আকাশ আবার শান্ত স্নিগ্ধ রূপ ধারণ করে। জ্যোৎস্না ওঠে; বনের মাথায় রূপালি চাঁদের কিরণ ঝিক্‌মিক্ করে। ত্নর্যোগ কেটে যাওয়ার পর জীবজন্তু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আনন্দে কলরব করতে থাকে। পাখীর কলকণ্ঠে বনাঞ্চল হয় মুখরিত। ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি উড়ে বেড়ায়, গাছের মধ্যে ঝক্‌মক্ করে, যেন চলমান হীরার ফুল। ত্নর্গম, অদ্ভুত, রহস্যময় আফ্রিকার বন!

অধিবাসী ঃ পিগ্‌মি

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, নিবিড় ঘন বনের মধ্যেও মানুষ বাস করে। অতি কষ্টে ঝোপজঙ্গল কেটে বনের মধ্যে প্রবেশ করার পথ ক'রে নিতে হয়। ঘাস ও গাছপালা এত তাড়াতাড়ি বাড়ে যে, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই কেটে ফাঁকা-করা স্থান আবার নিরেট পূর্ণ হ'য়ে যায়। গভীর বনের মধ্যে কিছুটা জায়গার জঙ্গল কেটে ফেলে অথবা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় ; তারপর সেখানে ঘাস ও পাতা দিয়ে গোল কুঁড়েঘর তৈরি ক'রে পিগ্‌মিরা বাস করে। যেমন পরিবেশ তেমনি ধরনের জীবনযাত্রা।

পিগ্‌মিরা আকারে ছোট, চার থেকে সাড়ে চার ফুট লম্বা। ছেলেমেয়েরা উলঙ্গ থাকে ; বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ কিছুটা পাতা বা ঘাস কোমরের চারপাশে ঝুলিয়ে রাখে। তীর-ধনুক দিয়ে পশুপাখী হত্যা ক'রে খাদ্য সংগ্রহ করে।



আফ্রিকার পিগ্‌মিদের বাসগৃহ

কৃষিকাজ এরা জানে না। কোন পশুপক্ষী পালনও করে না। অন্ধকার বনজঙ্গলের মধ্যে এদের খাদ্যের সন্ধানে ফিরতে হয় এবং শিকার করতে হয়। দৃষ্টিশক্তি এদের তীক্ষ্ণ, বন্য জন্তুর মতই অন্ধকারেও দেখতে পায়। তীর চালনায় পটু ; তীরের মাথায় বিষ মাখিয়ে নেয় ব'লে বড় জানোয়ারকেও এরা সহজেই কাবু করতে পারে। যেমন তীক্ষ্ণ এদের দৃষ্টিশক্তি তেমনি প্রখর শ্রবণ-শক্তি। বনের মধ্যে লতাপাতার খস্‌খসানি বা অন্য কোন প্রকার সামান্য শব্দ শুনেই এরা বুঝতে পারে, কোন

জীবজন্তুর চলাফেরার শব্দ কিনা। বনে বাস ক'রে এরা হয়েছে বন্য পশুদেরই সগোত্র।

পিগ্‌মিরা এক জায়গায় বেশীদিন বাস করতে পারে না ; কারণ বনের মধ্যে যে স্থানটুকু তারা ফাঁকা ক'রে নেয়, তা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আবার গাছপালায় ভ'রে যায় ; তারা তখন নূতন স্থানে আস্তানা বসায়। দিবারাত্রি বিপদের মধ্যেই বাস করতে হয় ব'লে এরা হয়েছে অত্যন্ত হুঁসিয়ার এবং সন্দিগ্ধ। একজন ক'রে পুরুষ তীর-ধনুক নিয়ে সব সময় বাড়ী পাহারা দেয়, অন্যেরা খাদ্যের খোঁজে এদিক-ওদিক যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে এরা ভয় করে। বিকালের দিকে আকাশে যখন মেঘের ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-চমক্ ও ঝড়-বৃষ্টি সুরু হয়, পিগ্‌মিরা মনে করে দৈত্যদানব তাদের বধ করার জন্য আস্ফালন করছে। দুর্যোগ কেটে গেলে আনন্দে তারা নাচে, বানরের চামড়া দিয়ে তৈরি-করা মাদল বাজায়। পিগ্‌মিদের স্পষ্ট-উচ্চারিত কোন ভাষা নাই ; আকার-ইঙ্গিতে ও বিভিন্ন প্রকার শব্দ ক'রে এরা মনের ভাব প্রকাশ করে।

পিগ্‌মিদের গায়ের রঙ নিগ্রোদের মত কালো নয়, ঈষৎ হাল্‌কা কটা। এদের দেহের গড়ন মজবুত। খাদ্যদ্রব্য আগুনে সিদ্ধ ক'রে নেয়, এস্কিমোদের মত কাঁচা মাংস খায় না। মেয়েরা গাছের ফল-মূল সংগ্রহ করে, পুরুষরা শিকার করে পশুপক্ষী। বনে লবণ পাওয়া যায় না ; তাই লবণের স্বাদ এরা জানে না। কদাচিৎ বাইরের কারো কাছ থেকে লবণ পেলে এদের আনন্দের সীমা থাকে না। ছোটরা লবণের দানা হাতে নিয়ে চুষে চুষে খায়, যেন কত মিষ্টি সামগ্রী !

দুপুরে সূর্য যখন মাথার ওপর আসে, প্রচণ্ড তাপে বনভূমি যেন সিদ্ধ হ'তে থাকে। পিগ্‌মিরা নিজেদের পাতার কুটীরের মধ্যে ঘুমিয়ে সময় কাটায়। ঘুম থেকে ওঠার পর সুরু হয় এদের আনন্দ-নৃত্য। সারিবদ্ধ-ভাবে একজনের পিছনে আর একজন এমনিভাবে গোল হ'য়ে দাঁড়িয়ে

এরা ঘুরে ঘুরে নাচে। তখন লাল, হলদে, সাদা নানা রঙ দিয়ে শরীর রাঙিয়ে নেয়; বাদ্যযন্ত্র হ'ল মাদল, শিঙ্গা। বৃদ্ধরা ব'সে অন্য সকলের নাচ দেখে, হাততালি দিয়ে তাদের উৎসাহ দেয়। কেউ বা ধনুকের গুণে টংকার দিয়ে তালে তালে বাজায়। নাচ সুরু হয় প্রথমে ধীর তালে, ক্রমে দ্রুত হ'তে হ'তে বাজনা এবং নাচনা উদ্দাম হ'য়ে ওঠে। অবশেষে অকস্মাৎ যখন বাদ্য থেমে যায়, সবাই ক্লান্ত হ'য়ে মাটিতে পড়ে লুটিয়ে।

মালয়ের সেমাঙ্গ জাতি

মালয় উপদ্বীপ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত উষ্ণ মণ্ডলের দেশ। উত্তরে ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীন, পশ্চিমে ভারত মহাসাগর, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ-পূর্বে অস্ট্রেলিয়া। এ অঞ্চলের মাঝামাঝি দিয়ে বিষুবরেখা গেছে; জলবায়ু উষ্ণ, সারা বছর বৃষ্টিপাত হয় প্রচুর। তাই সমগ্র মালয় উপদ্বীপ জুড়ে রয়েছে নিবিড় অরণ্য। অরণ্য নিবিড় হ'লেও তার মধ্যে মানুষের বসতি আছে। সেমাঙ্গ নামে একটি আদিম জাতি বনজঙ্গলের মধ্যে পশুপাখী শিকার ক'রে ও ফল-মূল আহরণ ক'রে জীবন ধারণ করছে।

সেমাঙ্গরা খাটো। দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুটের বেশী নয়। গায়ের রঙ কালো, নাক খাঁদা। এরা ছোট ছোট দলে বনে বনে ফলের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। ফলই এদের প্রধান খাদ্য। যেখানে বেশী পরিমাণে ফল মেলে সেখানে সেমাঙ্গরা কিছুদিন লতাপাতা দিয়ে ঘর তৈরি ক'রে বাস করে। সে অঞ্চলের ফল ফুরিয়ে গেলে তারা খাদ্যের সন্ধানে অন্য বনে চলে যায়। ফল-মূল এদের প্রধান খাদ্য হ'লেও সেমাঙ্গরা তীর-ধনুক দিয়ে পশুপক্ষী শিকার ক'রে মাংস খেয়ে থাকে। তীরের আগায় এরা একরকম বিষ মাখিয়ে নেয়। শিয়াল, খরগোস, শূয়োর, ইঁদুর, বানর প্রভৃতি সবই

এদের খাদ্য। বিংশ শতাব্দীর এই আণবিক বোমার যুগেও সেমাঙ্গরা লোহা বা অন্য কোন ধাতুর ব্যবহার শেখেনি। মালয়ে বাঁশ জন্মে প্রচুর। বাঁশই এদের প্রধান অস্ত্র; এমন কি কোন জিনিস কাটার জন্যও তারা বাঁশের ফালিই ব্যবহার করে।

সেমাঙ্গরা সভ্য মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে আরণ্যক জীবন যাপন করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মিল রেখে চলে তাদের জীবন-ধারা। বনে যা মেলে তাই তাদের খাদ্য। বন থেকে সংগৃহীত লতাপাতায় হয় তাদের গৃহ, তাদের পরিচ্ছদ। আফ্রিকার বুশম্যান, পিগ্‌মিরা যেমন এখনও আদিম যুগের জীবনযাপনের রীতি অবলম্বন ক'রেই চলেছে, সেমাঙ্গরাও তেমনি। এরা সমাজবদ্ধভাবে কোথাও বসবাস করে না, ছোট ছোট দলে বনের নির্দিষ্ট এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। এক দলের জন্য যে এলাকা নির্দিষ্ট সেখানে সহসা অপর দল যায় না। ফল আহরণের উদ্দেশ্যে গেলে দুই দলের মধ্যে ঝগড়া মারামারি বেধে যায়। সেমাঙ্গরা হিংস্র নরখাদক নয়। প্রকৃতির যাদুঘরে আদিম মানুষের জীবন্ত নিদর্শন যেন।

ঘুরে দেখি নানা দেশ

মরোক্কো

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত মরোক্কো দেশ। উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে আল্‌জিরিয়া, দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি, পশ্চিমে অতলান্তিক মহাসাগর। দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি ও মরোক্কো দেশের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত আটলাস্ পর্বতমালা—বৃহৎ, মাঝারি ও ছোট আটলাস্ নামক তিনটি পর্বতশ্রেণী প্রায় সমান্তরালভাবে সমগ্র মরোক্কো দেশের দক্ষিণ-সীমা জুড়ে রয়েছে। উচ্চ পর্বতশৃঙ্গগুলি বারো মাস তুষারে ঢাকা থাকে ; উত্তরে ভূমধ্যসাগরের নীল জলরাশি, পশ্চিমে অতলান্তিক মহাসাগরের অশান্ত ঢেউএর দোলা। সুনীল আকাশে আটলাসের তুষারমণ্ডিত পর্বতচূড়া সূর্যালোকে ঝলমল করে।

মরোক্কোর অধিবাসীরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই সাহসী দুর্ধর্ষ নাবিক ; সমুদ্রে জাহাজ চালনায় পটু। দক্ষিণ দিকে দেশের অভ্যন্তরে বিস্তারের পথ রুদ্ধ—সেখানে আটলাস্ পর্বত দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীরের মত, তার চেয়েও দুর্লঙ্ঘ্য সাহারা মরুভূমি। অধিবাসীদের কর্মতৎপরতা বিস্তৃত হয়েছিল সমুদ্রের ওপর। বড় বড় কাঠের জাহাজে দীর্ঘ দাঁড় খাঁটিয়ে তারা সমুদ্র পাড়ি দিত—ইউরোপের বণিকদের জাহাজ লুঠপাট করতো, সময় সময় সমুদ্রের তীরবর্তী গ্রামে হানা দিয়ে তারা জিনিস-পত্র লুঠ করতো এবং লোকজন ধ'রে নিয়ে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করতো। সুস্থ সবল ব্যক্তিদের লাগানো হ'ত জাহাজে দাঁড়-টানার কাজে।

মরোক্কোর অধিবাসীরা শ্বেতাঙ্গ আর্যদের গোষ্ঠীভুক্ত হ'লেও আফ্রিকায় দীর্ঘকাল বাস করার ফলে এখানকার প্রখর রৌদ্রতাপে এদের গায়ের

রঙ হ'য়ে গেছে তামাটে। প্রাচীনকালে অধিবাসীদের বলা হ'ত বার্বার। বার্বার জলদস্যুরা এক সময়ে ইউরোপের লোকদের ভীতির কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

ভূমধ্যসাগরের তীরে এই উর্বরা এবং সমৃদ্ধ দেশটির ওপর নজর পড়েছিল বিদেশী বণিকের এবং শক্তিমান বিজয়ী দেশের। ফিনিশীয়রা এখানে এসেছিল বাণিজ্য করতে, গ্রীকরা এসেছিল ; রোমানরা দেশ জয় ক'রে এখানে স্থাপন করেছিল উপনিবেশ। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ভ্যাণ্ডালরা মধ্য-ইউরোপ থেকে ইতালির ভিতর দিয়ে এসে সাগর পার হ'য়ে মরোক্কো অধিকার করেছিল। বিভিন্ন জাতির লোক বিভিন্ন সময়ে মরোক্কোতে প্রাধান্য বিস্তার করলেও এর ফলে বার্বারদের জাতীয় জীবনে বিশেষ পরিবর্তন আসেনি।

সপ্তম শতাব্দীতে আরবরা আফ্রিকার সমগ্র উত্তর উপকূল অধিকার করে। ঐ সময় মরোক্কো তাদের অধীনে আসে এবং এখানে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হয়। মরোক্কো নামটি আরবদেরই দেওয়া – মরোক্কোর অধিবাসীদের বলা হয় মূর, যাদের মধ্যে আরব ও বার্বার রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে। অষ্টম শতাব্দীতে মূরগণ সামরিক শক্তিতে প্রবল হ'য়ে ওঠে। জিব্রাল্টার প্রণালী পার হ'য়ে তারা স্পেনের দক্ষিণ ভাগের প্রায় অর্ধেক দেশ অধিকার ক'রে নেয়। সেখানে প্রায় এক শতাব্দী ধ'রে মূরদের আধিপত্য ও সমৃদ্ধি বিরাজ করেছিল। অবশেষে পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাদের অধিকার বিলুপ্ত হয় এবং তারা স্পেন ছেড়ে উত্তর আফ্রিকায় চলে আসতে বাধ্য হয়।

মূরদের স্পেন থেকে বিতাড়িত হবার পরও মরোক্কো প্রায় সাড়ে চারশো বছর স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল। এ সময়ের মধ্যে অনেকগুলি রাজবংশের উত্থান-পতন ঘটে। বর্তমানে নামে স্বাধীন হ'লেও মরোক্কো কয়েকটি ইউরোপীয় শক্তির তাঁবেদার মাত্র। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

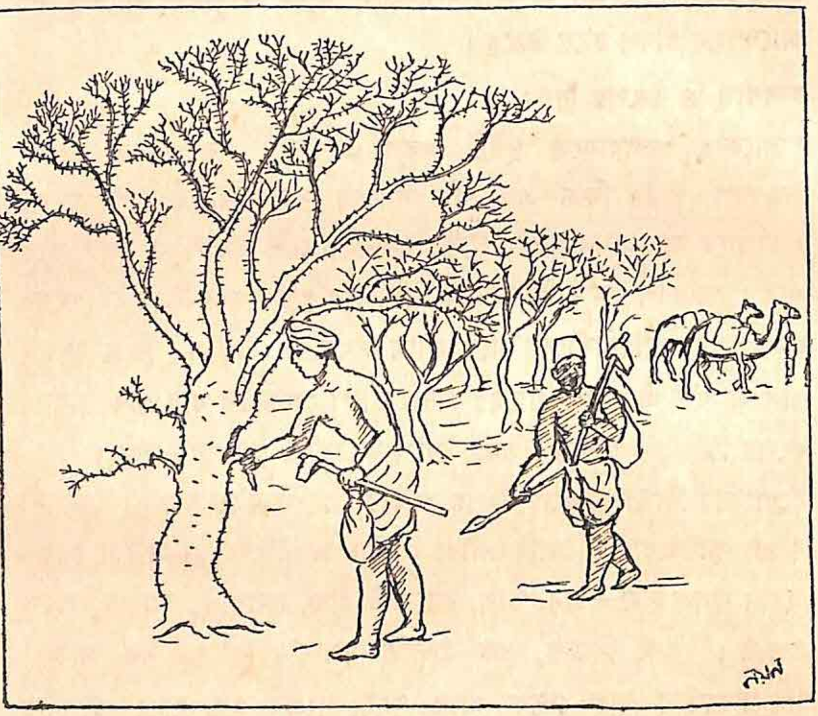
সময় মিত্রশক্তি মরোক্কো দখল ক'রে তিনটি অঞ্চলে ভাগ ক'রে নেন—ফরাসী অঞ্চল, স্পেনীয় অঞ্চল এবং আন্তর্জাতিক অঞ্চল। মরোক্কোর সুলতান কেবল নামেমাত্র সুলতান, রাজ্য-শাসনের কোন ক্ষমতা তাঁর হাতে নাই। মরোক্কো এখন বিদেশী শক্তির আশ্রিত রাজ্য। বর্তমানে মূরদের মধ্যে বিশেষ ক'রে ফরাসী-মরোক্কোতে স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্দোলন প্রবল হ'য়ে উঠছে।

জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য

মরোক্কোর জলবায়ুতে তুইটি ঋতুর প্রাধান্য। বসন্তকাল এখানে অল্পকাল স্থায়ী কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে বিচিত্র বর্ণের ফুলের সমারোহে আর নানাজাতীয় পাখীর কলকণ্ঠে দেশ উজ্জ্বল ও মুখর হ'য়ে ওঠে। আকাশ ঘন নীল, বাতাস স্নিগ্ধ, সুরভিত। প্রকৃতিতে সৌন্দর্যের ছাপ পড়ে, অধিবাসীদের মনে জাগে উৎসবের সাড়া। কিন্তু জুলাই মাস আসতে আসতেই গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে প্রান্তরের ঘাস শুকিয়ে যায়, ফুলের চিহ্ন লোপ পায়; সমগ্র দেশে মরুভূমির রূপ ফুটে ওঠে।

মরোক্কোর বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন দ্রব্যের পার্থক্য হ'য়ে থাকে। ফরাসী অঞ্চল কৃষিপ্রধান। অধিবাসীরা প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করে। প্রধান ফসল হ'ল—ধান, ডাল, ক্যানারি বীজ, জলপাই, আঙুর, লবঙ্গ প্রভৃতি। কর্ক, সিডার, ওক প্রভৃতি মূল্যবান কাঠের বন আছে। বাব্‌লাজাতীয় গাছ থেকে প্রচুর আঠা সংগ্রহ করা হয়। স্পেনীয় অঞ্চলেও কৃষিকাজই প্রধান। এখানে খনি থেকে কিছু পরিমাণ লোহা পাওয়া যায়। সমুদ্র থেকে মাছ ধরা একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়। অল্প বৃষ্টিপাতের জন্য তৃণময় প্রান্তরে যথেষ্ট সংখ্যক ছাগল পোষা হয়। ছাগলের চামড়া প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হয়। মরোক্কো লেদার পৃথিবীতে বিখ্যাত। শুক্‌না মাছ, এস্‌পাটো ঘাস এবং অশোধিত লৌহ এদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য।

তাঞ্জিয়ার আন্তর্জাতিক অঞ্চলের অধিবাসীরা কৃষির চেয়ে কুটীর-শিল্পের ওপর বেশী নির্ভরশীল। পশুপালন, সিগারেট তৈরি ও সমুদ্রে মাছ ধরা লোকেদের প্রধান উপজীবিকা। শুক্‌না চামড়া, ডিম, শুক্‌না মাছ বিদেশে রপ্তানি করা হয়।



বাব্‌লা গাছ থেকে আঠা সংগ্রহ

মরোক্কোর অধিবাসীদের মধ্যে অনেকগুলি জাতির লোকের মিশ্রণ ঘটেছে। আদিম বাসিন্দা বার্বারদের সঙ্গে ফিনিশীয়দের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তার পরবর্তী যুগে রোমানরা এদেশে বসবাস করে। রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে বর্বর ভ্যাণ্ডালরা মরোক্কো অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এর পরে আসে আরবদেশীয় মুসলমানগণ।

এ ছাড়া আফ্রিকার নিগ্রো অধিবাসীদের সংখ্যাও এখানে অনেক। মূররা সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু এবং উগ্র প্রকৃতির। লেখাপড়ার প্রচলন খুব কম।

পল্লী-অঞ্চলের লোকেরা পাথরের ঘরে কিংবা খড়-দিয়ে-ছাওয়া গোলাকার কুঁড়েঘরে বাস করে। শহরে দেখা যায় সাদা ও হলদে রঙের দালান। অধিবাসীরা প্রায়ই সাদা রঙের ঢিলা আলখাল্লা ধরনের পোষাক পরে। রৌদ্রের প্রখর তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঢিলা জামা বিশেষ উপযোগী। ছাগলের লোম দিয়ে জামা-কাপড় তৈরি করা হয়।

পিরামিডের দেশ মিশর

মিশর এক বিচিত্র দেশ—উত্তর আফ্রিকার মরুভূমির মধ্যে যেন একটি বিরাট মরূদ্যান। উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে লোহিত সাগর, আকাবা উপসাগর ও ইস্‌রায়েল, পশ্চিমে লিবিয়া এবং দক্ষিণে সুদান। দেশের মধ্য দিয়ে নীলনদ প্রবাহিত হ'য়ে ভূমধ্যসাগরে গিয়ে পড়েছে। নীলনদের জলধারাতেই দেশটি শস্যশ্যামল হয়েছে; এ নদী না থাকলে মিশর সাহারা মরুভূমির অংশ হ'য়ে যেত। প্রতি বছর একবার ক'রে নদীতে বান আসে। বানের জল কূল ছাপিয়ে দুই পাশের মাঠ ডুবিয়ে দেয়। বান এলে লোকেদের খুশির অন্ত থাকে না, কারণ বানের জলের সঙ্গে আসে পলিমাটি; জল যখন স'রে যায় মাঠে কোমল নরম মাটির স্তর প'ড়ে থাকে। এতে জমি হয় উর্বর। সারা বছর ধ'রে জমি যেন নীল-নদের স্নিগ্ধ বারিধারার জন্য তৃষিত হ'য়ে থাকে।

চাষ-আবাদের জন্য জলের প্রয়োজন কিন্তু মিশরে বৃষ্টি প্রায় হয়ই না। কাজেই নদী থেকে জল শস্যক্ষেত্রে নিতে হয়। বানের জল যাতে সবটা প্রবাহিত হ'য়ে মুসদ্রে চলে না যায় সেজন্য মাঝে মাঝে বড় বাঁধ

দিয়ে জল আটক করা হয় এবং শত শত খাল কেটে জল নিয়ে যাওয়া হয় জমির নিকটে। কোন কোন স্থানে বালতি বালতি জল নিয়ে ঢালা হয় শুষ্ক মাঠে। নীলনদের ওপরই চাষীর—শুধু চাষীর কেন, সমগ্র মিশরের—জীবন নির্ভর করে। তাই মিশরকে বলা হয় 'নীলনদের দান'। নীলনদের তীর দিয়ে দুই পাশে কিছুটা স্থান উর্বর ও লোক বসতিপূর্ণ; তার পরেই জলহীন, ফলহীন মরুভূমি।

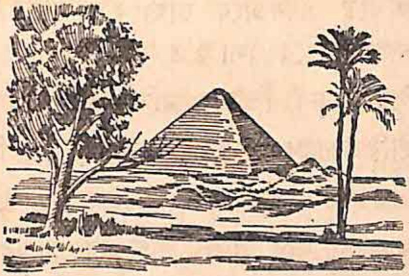
মিশরের উর্বর ভূমিতে ধান ও প্রচুর তূলা জন্মে। মিশরের তূলার মত দীর্ঘ আঁশযুক্ত এমন সুন্দর তূলা পৃথিবীর আর কোথাও হয় না।

নীলনদের জলধারা

মিশর দেশে বৃষ্টি হয় না কিন্তু যে নদীটি দেশকে মরুভূমির কবল থেকে রক্ষা করছে, তাতে প্রতি বছর নিয়মিত সময়ে বন্যা হয়। নীলনদের প্রবাহ আসে দুইটি নদী থেকে—হোয়াইট্ নীল আর ব্লু নীল। হোয়াইট্ নীল উৎপন্ন হয়েছে নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী একটি হ্রদ থেকে। গ্রীষ্ম-মণ্ডলের সারা বছরব্যাপী প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে এ নদীর জল নীল-নদকে পুষ্ট করে। নীলনদের বন্যা সৃষ্টি করে ব্লু নীল ও তার উপনদী-গুলি। এগুলির উৎপত্তি আবিসিনিয়ার উচ্চভূমিতে। এখানে গ্রীষ্ম-কালে প্রবল বর্ষণ হয় এবং এত বেশী জল প্রবাহিত হ'য়ে আসে যে, নীলনদের দুই কূল ছাপিয়ে দুই পাশে প্রায় আট মাইল পর্যন্ত স্থান ডুবিয়ে দেয়। নীলনদের এই জলদানের জন্য অধিবাসীরা সারা বছর ধ'রে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে। বার্বার থেকে কায়রো পর্যন্ত সমভূমিতে বানের জল দুই কূল প্লাবিত করে। এরূপ বান বছরে একবার ক'রে আসে এবং এই জল পরিপূর্ণমাত্রায় কাজে লাগানোর জন্য চেষ্টা করা হয়।

বানের জল ধ'রে রাখার জন্য আসোয়ানে একটি বিরাট বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। জল আট্‌কিয়ে রাখায় একশত মাইল দীর্ঘ একটি হ্রদের সৃষ্টি

হয়েছে ; এখান থেকে সেচের জল জমিতে সরবরাহ করা হয়। আসিয়ুট এবং নদীর মোহানা অংশেও বাঁধ দিয়ে জল ধ'রে রাখার ফলে পলিমাটি ও জল সবখানি সাগরে গিয়ে পড়তে পারে না। জলই যে জীবন মিশরবাসীর কাছে তা প্রত্যক্ষ সত্য।



মিশরের পিরামিড্

অতি প্রাচীনকালে মিশর দেশে উন্নত সভ্যতার পত্তন হয়েছিল। এদেশের রাজাদের বলা হ'ত ফ্যারাও। মিশর দেশে উপরের-দিকটা-সরু এক প্রকার চৌকোণা পাথরের স্তূপ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিকে বলে 'পিরামিড্'।



মমি

প্রাচীনকালের রাজারা এগুলি নির্মাণ করেছিলেন তাঁদের কবর-রূপে ব্যবহারের জন্য। প্রাচীন মিশরীয়দের ধারণা ছিল—মৃত্যুর পর যতদিন দেহ থাকবে ততদিন মানুষ পরলোকেও সুখভোগ করতে পারবে। তাই রাজাদের

মৃত্যু হ'লে তাঁদের দেহ নানারকম মসলাযুক্ত তেল মাখিয়ে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে এমনভাবে রাখা হ'ত যাতে তা প'চে নষ্ট না হ'য়ে যায়। এরূপ দেহকে বলা হ'ত 'মমি'।

পিরামিডের ভিতরে মমি রেখে দেওয়া হ'ত ; আর সেই সঙ্গে তাঁদের জীবিতকালের ব্যবহারের সামগ্রীও সাজিয়ে রাখা হ'ত। পিরামিডের ভিতর থেকে পাওয়া গেছে মমি, কাঠের মূর্তি, পাথরের নানা রকম আকৃতির মূর্তি, রাজা, রাণী এবং রাজকন্যাদের ব্যবহারের গহনা, বাসন-কোসন, কাঠের তৈরী নৌকা, বঁড়শির ছিপ, গম, পদ্মফুলের বীজ আরো নানা জিনিস। পিরামিডের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য গোপন সুড়ঙ্গপথ থাকতো। পিরামিডের ভিতরে-রাখা মণিমুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসের লোভে দস্যুরা এই গোপন পথ দিয়ে প্রবেশ ক'রে লুঠতরাজ ক'রে নিয়েছে। বেশীর ভাগ পিরামিডই এখন শূন্য। মিশরের মরুভূমির মধ্যে ছোট-বড় মাঝারি বহু পিরামিড্ অতীতের স্মৃতি বহন ক'রে নীল আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ; আর আছে পাথরের অদ্ভুত ধরনের বিরাট মূর্তি—মানুষের মত মাথা, পা এবং দেহ সিংহের মত, মুখে রহস্যময় হাসির আভাস। এইরূপ মূর্তিকে বলে 'স্ফিংক্‌স'।

বর্তমান মিশর

নীলনদের জলে পুষ্ট উর্বর ভূমিতে ধান ও তুলা প্রচুর উৎপন্ন হয়। তাছাড়া গম, আখ, রসুন, নানা জাতীয় ডাল, তৈলবীজ প্রভৃতিও জন্মে। বৃষ্টি-হীন দেশের স্বাভাবিক গাছ খেজুর এখানে প্রচুর ফলে। চাষীরা নীলনদ থেকে খাল কেটে জল নেয় তাদের শস্যক্ষেত্রে ; ভারতবাসীর মত বলদ দিয়ে জমি চাষ করে। চাষীদের বলা হয় 'ফেলাহীন'। দেশের শতকরা ৭৫ জন অধিবাসী কৃষিকাজ ক'রে জীবিকা নির্বাহ করে। নীলনদের জলের ওপ্পরই কৃষি নির্ভরশীল ; জলসেচের সাহায্যে

সমগ্র দেশের মাত্র শতকরা তিন ভাগ জমি আবাদের যোগ্য, বাকি অংশ উষর মরুসদৃশ।

এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা—এই তিন মহাদেশের মিলনস্থান হয়েছে মিশর, বিশেষ ক'রে এর রাজধানী কায়রো। নীলনদের তীরে কায়রো নূতন ও পুরাতনের সংমিশ্রণে অপূর্ব সুন্দর শহর। আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শন বহু সুন্দর অট্টালিকা যেমন গ'ড়ে উঠেছে, তেমনি আছে কারুকার্যময় বহু প্রাচীন মসজিদ। রাজপথে অতি আধুনিক ধরনের মোটরগাড়ির যেমন ভিড়, তেমনি পাশাপাশি চলেছে মালবাহী উট ও গাধার সারি। দোকানী পথে সরবৎ বিক্রি করে, চামড়ার থলিতে ক'রে জলওয়ালা জল বিক্রি করে পথে পথে ঘুরে; কাঁধে থলির সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে ছোট-বড় আকারের গ্লাস, তা দিয়ে মেপে ওজন ক'রে দেয় গ্রাহককে। আধুনিক শিক্ষিতা মহিলারা ইউরোপীয়দের মত পোষাক-পরিচ্ছদ পরে, কতক মহিলা সর্বাঙ্গ বোরখা দিয়ে ঢেকে পথ চলে, নাকের ওপর দিয়ে রঙিন কাপড়ের জাল দিয়ে মুখ অবধি ঢাকে, শুধু চোখ দুইটি থাকে অনাবৃত।

নীলনদের ওপর নৌকায় ক'রে মাল ও যাত্রী বহন করা হয়। অসংখ্য মাল-বোঝাই নৌকা পাল খাঁটিয়ে চলাচল করে। মিশরবাসীর কৃষি ও ব্যবসায়ের সঙ্গে নীলনদ নিবিড়ভাবে জড়িত। কায়রো শহরের উত্তর-পশ্চিমাংশ বুলাক্ নামে পরিচিত। সমৃদ্ধ, ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র এটি। এর বিপরীত দিকে নীলনদের ওপর বুলাক্ দ্বীপ। এখানে সুন্দর সুন্দর বাড়ী, হোটেল, দোকানপাট, বাগান, সবুজ গাছের সারি দিয়ে সাজানো পথ রয়েছে। ছবির মত সুন্দর দ্বীপটি একটি পুল দিয়ে শহরের সঙ্গে যুক্ত।

১৮৬৯ সালে ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিন্যাণ্ড লেসেপস্ সুয়েজ খাল কেটে লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগর সংযুক্ত ক'রে দেন। এর ফলে

দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে না গিয়ে সোজা পথে সুয়েজ খালের ভিতর দিয়ে জাহাজ চলাচল করতে পারে। সুয়েজ খাল খননের ফলে পৃথিবীতে মিশরের প্রভাব ও গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

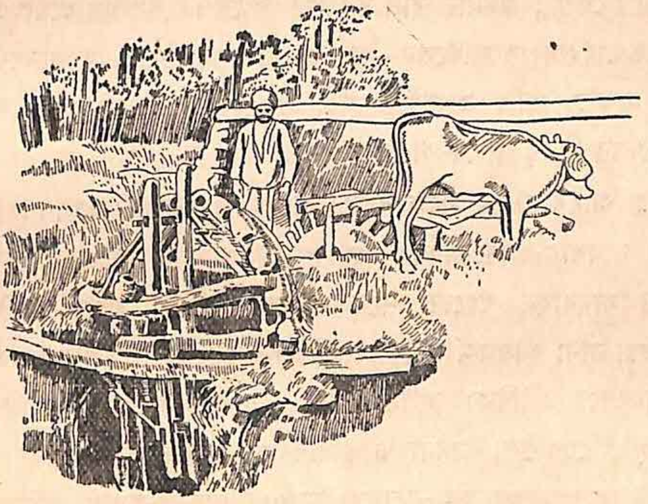
অধিবাসী

মিশর দেশে অনেক জাতির লোকের মিশ্রণ ঘটেছে। গ্রীক, রোমান, তুর্কী ও আরবরা বিভিন্ন সময়ে মিশর দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও রাজ্য-শাসন ব্যাপারে বসবাস করেছিল। বহুজাতির ধারা বর্তমান মিশরীয়দের মধ্যে প্রবাহিত। তবে মিশরের জলবায়ুর গুণে এরা সবাই মিশরীয় হ'য়ে গেছে। কেবল উত্তর অঞ্চলের লোকদের গায়ের রঙ দক্ষিণের অধিবাসীদের মত কালো নয়। কারণ দক্ষিণাংশে প্রচণ্ড সূর্যতাপে দেহবর্ণ কালো হ'য়ে যায় কিন্তু উত্তর অংশের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত মৃদু। তাই এ অঞ্চলের অধিবাসীরা হাল্‌কা গৌরবর্ণ।

মিশরের মাঝখান দিয়ে নীলনদ প্রবাহিত। প্রতি বৎসর বন্যায় নদীর দুই তীরে যে মাইল দশেক স্থান সিক্ত প্লাবিত করে, কেবল সেইখানেই শস্য উৎপাদিত হয়।

উর্বর নদী-উপত্যকায় চাষ-আবাদের কাজই প্রধান—এতেই প্রধানতঃ মিশরের জাতীয় মূলধন ও শ্রম নিয়োজিত; কৃষিজাত দ্রব্যই দেশের প্রধান সম্পদ। মিশরের অধিবাসীর শতকরা ৭৫ ভাগ চাষী; এরাই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। চাষী বা ফেলাহীনরা সরল পরিশ্রমের জীবন যাপন করে। মাঠে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটে। তার কৃষির উপকরণ পুরাণো আমলের লাঙল আর মহিষ। নদী বা নদী-থেকে কেটে-নেওয়া খালের জল কাঠের চাকা ঘুরিয়ে সে মাঠে দেয়। মোষ দিয়ে কলুর ঘানির মত কল ঘুরিয়ে মাঠে সেচকার্য করে। এদেশে মোষকে বলে গামোশা। গামোশা কৃষকের বন্ধু। তার চাষে সাহায্য করে, শস্য মাড়াই করে, দুধ দেয়। ফেলাহীনদের মধ্যে

শিক্ষার প্রচলন হয়নি। পুরুষানুক্রমে তারা একই পদ্ধতিতে ফসল ফলানোর কাজ ক'রে আসছে। মাটির ঘরে তারা বাস করে। পরিশ্রম, ধৈর্য ও আতিথেয়তা এদের চরিত্রের বিশেষ গুণ। অপরিচিত কেউ এদের গ্রামে এলে ফেলাহীনরা সাদরে তাকে অভ্যর্থনা ক'রে আমন্ত্রণ জানায় এবং নিজেদের সাধ্যমত তার পরিচর্যা করতে এগিয়ে আসে ; এমন কি নিজেদের যদি সামান্য পরিমাণ খাদ্যবস্তুও থাকে তার



মিশরের প্রাচীন জলসেচ-ব্যবস্থা

সবখানিই অতিথির সামনে প্রফুল্লচিত্তে এনে হাজির করে। অপরিচিত কেউ তার গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে বিনয়ী এবং পরোপকারী গ্রামবাসী তাকে পথের নির্দেশ তো দেয়ই, সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত গিয়ে তাকে এগিয়ে দিয়ে আসে। চাষীদের পরস্পরের মধ্যেও রয়েছে হৃদ্যতা ও সহযোগিতার বাঁধন। সবাই মিলেমিশে কাজকর্ম করে ; অনেক সময় একটি গামোশাও কয়েকজনে অংশ ক'রে পোষে এবং ভাগে কাজে লাগায়।

মিশরীয়রা ইসলাম ধর্ম মেনে চলে। ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী এদের পারিবারিক জীবনে পরস্পরের সঙ্গে এরা নিবিড় এবং আন্তরিকতাপূর্ণ সম্বন্ধ বজায় রাখে। উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তার আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ করে, এমন কি দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়কেও অর্থসাহায্য ক'রে থাকে। বয়স্ক ব্যক্তির সম্মান প্রদর্শন ধর্মের একটি অঙ্গ; গুরুজনকে সবাই শ্রদ্ধা করে। পরিবারে মায়ের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা সবচেয়ে বেশী; জননীর স্থান সকলের ওপরে। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহম্মদ বলেছিলেন—স্বর্গ জননীর পদতলে। ছেলেমেয়ে যেমন পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, মা-বাবাও তেমনি ছেলেমেয়েদের আদর-যত্ন ক'রে লালন-পালন করেন।

পল্লীর অধিবাসীদের সঙ্গে শহরবাসীদের অনেকখানি তফাৎ। শহরগুলি ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র, দালান-কোঠায় সজ্জিত; আধুনিক যুগের যানবাহন শহরের পথে ব্যবহৃত হয়। শহরে পরিবারের পুরুষরা নানা কাজকর্ম ক'রে অর্থোপার্জন করে। মহিলারাও অনেকে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করে। বাল্যকাল থেকে বালিকাদের সুগৃহিণী, স্নেহশীলা জননী ও রান্নার কাজে দক্ষ হ'তে শিক্ষা দেওয়া হয়। ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়ে; অবসর-সময়ে বাড়ীতে নানা কাজে সহায়তা করে।

শহরগুলি সুন্দর বাগান ও পার্ক দিয়ে সাজানো; বাগানে নানা রঙের ফুল, পার্কে নানা ধরনের সুশ্রী গাছের সারি। গাছের আরামদায়ক ছায়ায় অনেকে বনভোজন করে, আমোদ-প্রমোদে সময় যাপন করে। তরুণদের বিভিন্ন রকম খেলার প্রচলন আছে—ফুটবল, হকি, টেনিস, পলো, সাঁতার কাটা, বন্দুক ছোঁড়া, ঘোড়দৌড়, কুস্তি প্রভৃতি বিশেষ জনপ্রিয়। মিশরীয় সাঁতারু কয়েকবার ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার দিয়ে পার হ'য়ে পৃথিবীতে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ভার-উত্তোলন

প্রতিযোগিতাতেও মিশরীয় কুস্তিগীর বিশেষ পারদর্শী। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ছেলেমেয়েদের মত মিশরের বালক-বালিকারাও লুকোচুরি, ব্যাঙলাফ, মার্বেল, দড়ি-নিয়ে-লাফানো প্রভৃতি খেলে।

কঙ্গো নদীর অববাহিকা

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদীগুলির মধ্যে কঙ্গো অন্যতম। কঙ্গোর মত এত বেশী জলরাশি অন্য কোন নদী সমুদ্রে বহন ক'রে নিয়ে যায় না। আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে এর উৎপত্তি। বারো মাস এখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। দুই হাজারের মাইলেরও বেশী স্থানের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে বিপুলসলিলা এই নদী নিবিড় জঙ্গল ও রহস্যময় স্থান পার হ'য়ে সাগরে এসে পড়েছে। এ নদীর উৎপত্তি ও গতিপথ নির্ধারণ-ও এক রোমাঞ্চকর অভিযানের ফল।

স্কট্ল্যাণ্ডের পাদরী ডেভিড লিভিংস্টোন আফ্রিকার অভ্যন্তর-ভাগ আবিষ্কার করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন। অনেকদিন তাঁর কোন সন্ধান না পেয়ে সবাই অনুমান করেছিল, তিনি আর বেঁচে নাই। হেনরী স্ট্যান্‌লি লিভিংস্টোনের অনুসন্ধানে আফ্রিকায় গেলেন। সাহারা মরুভূমির বালিরাশির মধ্যে একটি পুতির দানা খুঁজে বের করার মতই এ হ'ল অসাধ্য সাধন। আফ্রিকায় নিবিড় অরণ্য, হিংস্র জীবজন্তু, হিংস্র প্রকৃতির অধিবাসী। এই দুর্গম মহাদেশে যে ব্যক্তি একাকী গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে তার সন্ধান লাভ করা নেহাৎ ভাগ্য ছাড়া হ'তে পারে না। স্ট্যান্‌লি আফ্রিকার অরণ্যময় প্রদেশে লিভিংস্টোনকে খুঁজে বের ক'রে জগৎ-জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

আফ্রিকার প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন তিনি। ১৮৭৬ সালে আবার তিনি ফিরে এসেছিলেন মধ্য-আফ্রিকায়। জাঞ্জিবার

থেকে স্ট্যান্‌লি মধ্য পূর্ব-আফ্রিকায় ট্যাঙ্গানিকা হ্রদের নিকটে আসেন। এ অঞ্চলের একটি নদীকে অধিবাসীরা বলতো লুয়ালাবা অর্থাৎ বড় নদী। স্ট্যান্‌লি ভেবেছিলেন, এটি হয়তো নীলনদের দক্ষিণাংশ। এই নদীর গতিপথ আবিষ্কার করার জন্য তিনি তিনজন শ্বেতাঙ্গ সঙ্গী নিয়ে নৌকায় ক'রে যাত্রা করলেন। এ অঞ্চলে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ে; নদীটি ঘন বনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে। রাত্রিতে তীরে শোনা যায় হিংস্র জন্তুর গর্জন; দিনে বিষাক্ত কীট-পতঙ্গের উপদ্রব। এ ছাড়া হিংস্র বাসিন্দারা তীর-ধনুক নিয়ে নদীতীর থেকে আক্রমণ চালায়। অসহ্য ভাপ্‌সা গরম; খাদ্য যা সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল তা-ও ফুরিয়ে এল। কঠোর পরিশ্রমে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে যাত্রীদল নূতন পথে চলেছে। স্ট্যান্‌লির সঙ্গী তিনজনই একে একে মৃত্যুবরণ করলেন। স্ট্যান্‌লি তখন যুবক; তথাপি কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর মাথার সব চুল সাদা হ'য়ে গেল, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লো, তিনি যেন বৃদ্ধ হ'য়ে পড়লেন।

ট্যাঙ্গানিকা হ্রদের কাছ থেকে যাত্রা করার পর কিছুটা পথ এসে কতকগুলি জলপ্রপাত পাওয়া গেল। স্থলপথে তা অতিক্রম ক'রে যাত্রিগণ গাছের গুঁড়ি খোদাই ক'রে তৈরি-করা ক্যানোতে চ'ড়ে নদীর স্রোতের সঙ্গে ভেসে চললেন। নদী কোথাও চওড়া আকার ধারণ করেছে, দুই পাড়ে প্যাপিরাস্‌ ও নলখাগড়ার ঝোপ। বেশীর ভাগ স্থানে নদী চলেছে গভীর বনের ভিতর দিয়ে, যেন সবুজ বনের সুড়ঙ্গ; দুই তীরে বড় বড় গাছ—তাদের শাখা-প্রশাখা পরস্পরের সাথে মিশে একাকার হ'য়ে গেছে। নদী প্রথমে কিছুদূর গেছে উত্তর-মুখে, তারপর অকস্মাৎ মোড় নিয়েছে পশ্চিম দিকে, তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। স্ট্যান্‌লি যাত্রা করেছিলেন অক্টোবর মাসে, পরের বছর বসন্তকালে যার নাম দেওয়া হয়েছে স্ট্যান্‌লিপুল সেখানে এসে উপনীত হলেন। এখান

থেকে ১৭০ মাইল পথ নদী পাথরের ওপর দিয়ে ভীষণ বেগে গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছে। ঘন বনজঙ্গল অতিক্রম ক'রে স্ট্যান্‌লি এই পাহাড়ময় অংশ অতিক্রম ক'রে আবার ক্যানো ভাসিয়ে দিলেন কঙ্গোর স্রোতে এবং সমুদ্র থেকে ৭০ মাইল অভ্যন্তরে বোমা নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন! কঙ্গো যেখানে অতলান্তিক মহাসাগরে পড়েছে সেখানে তার মোহানা ৭ মাইল চওড়া—সমুদ্রের নীল জল বহুদূর পর্যন্ত কঙ্গোর লাল বাদামী রঙের জলে চিহ্নিত হ'য়ে রয়েছে। স্ট্যান্‌লি আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব উপকূল থেকে দুর্গম অঞ্চল পাড়ি দিয়ে পশ্চিম উপকূলে এসে উপস্থিত হলেন—ক্যানোতে ক'রে ভেসে এসেছেন প্রায় দুই হাজার মাইল।

অধিবাসী

কঙ্গো নদীর অববাহিকায় অনেক গোষ্ঠীর লোক বাস করে; তাদের ভাষা পৃথক, আচার-ব্যবহারেও আছে পার্থক্য।

নদীর ধারে ধারে কঙ্গোর অধিবাসী পাতার ঘর তৈরি ক'রে বাস করে। তাদের গায়ের রঙ বাদামী, সর্বাঙ্গ রঙ দিয়ে সাজায়, উল্কি পরে। দাঁত ঘ'ষে ঘ'ষে করাতের কাঁটার মত ধারালো করে; বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন রকম চিহ্ন আছে—গণ্ডে ও কপালে ধারালো চাকু দিয়ে মাংস কেটে এ চিহ্ন স্থায়ী ক'রে দেওয়া হয়। নদীর তীরে যারা বাস করে তাদের বাড়ীর মুখ রাখে নদীর দিকে। একসঙ্গে কতকগুলি বাড়ী নিয়ে হয় একটি গ্রাম। শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্ম-রক্ষার জন্য গ্রামের পিছন দিকে কাঠের খুঁটি দিয়ে বেড়া দেওয়া। তারপরই শত শত মাইলব্যাপী গভীর বন।

কঙ্গো অববাহিকার নিগ্রো অধিবাসীদের ঘর বাঁশের খুঁটির ওপর পাতার ছাউনী দিয়ে তৈরি। প্রথমে কতকগুলি লম্বা বাঁশ মাটিতে গোল ক'রে বা চৌকোণা ক'রে পুঁতে সেগুলির আগার দিক বাঁকিয়ে

একত্র ক'রে বাঁধা হয়। তারপর এই খাঁচার ওপর বিছিয়ে দেওয়া হয়; সর্বশেষে নারিকেল পাতার চাটাই দিয়ে দেওয়াল ঘিরে বেড়া দিলেই বাসগৃহ তৈরি হ'য়ে গেল। একটি দরজা রাখা হয় মাটি থেকে কিছু উঁচু পর্যন্ত; ঘরে জানালা বা অন্য কোন প্রকার ফাঁক থাকে না।

বাড়ীর সামনে কিছুটা স্থানের জঙ্গল কেটে তাতে সব্জীর চাষ করা হয়। কলা ও আম ফলে প্রচুর। স্ত্রীলোকেরা বাঁশের চটা দিয়ে তৈরি-করা লম্বা চোঙার মত ঝুড়িতে ফল ভর্তি ক'রে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে গ্রামে বিক্রি করতে যায়। জঙ্গলের ধারে বাস করতে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলাফেরা করতে এদের বিপদ পদে পদে। জঙ্গলে আছে চিতা বাঘ; সুযোগ পেলেই পিছন দিক থেকে অতর্কিতে আক্রমণ ক'রে মানুষ ধ'রে নিয়ে যায়।

এদের মধ্যে একটি অদ্ভুত রীতি আছে। ছেলেরা একটু বড় হ'লেই নিজেরা পৃথকভাবে বাস করে। কুঁড়েঘর তৈরি ক'রে নিয়ে সেখানে থাকে, নিজেদের খাবার জিনিস নিজেরাই সংগ্রহ করে। মাছ ধরে, ফাঁদ পেতে পাখী, কাঠবিড়াল, বানর ধরে। গাছের সঙ্গে দড়ির জাল বেঁধে রেখে বাদুড় ধরে। এ সবই এদের খাদ্য। এ ছাড়া মেঠো ইঁদুর, বড় বড় শুঁয়াপোকা, পিঁপড়ে, গুবরে পোকা উপাদেয় খাদ্য হিসাবে এদের কাছে খুব প্রিয়।

গ্রামের মধ্যে দুজন ব্যক্তির প্রতিপত্তি খুব বেশী। একজন হ'ল দলপতি, অন্যজন ডাইনী ডাক্তার। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার সময় দলপতি হয় যুদ্ধের নেতা। অন্য সময়ও সবাই তার নির্দেশ মেনে চলে। ডাইনী বৈদ্য হ'ল গ্রামের পুরোহিত, অপদেবতার সর্দার। ভূতপ্রেত, বন্য জানোয়ার ও রোগের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার তুক্‌তাক্ সে জানে। অন্য সকলের কাছে মন্ত্রতন্ত্র খাটায়, মাদুলি বিক্রি করে। লোকের ধারণা, সে গ্রামে মারাত্মক রোগ নিয়ে আসতে

পারে, এমন কি যে-কোন লোকের মৃত্যু ঘটাতে পারে। আসলে সে হ'ল ধূর্ত শয়তান ; নানা জিনিস মিশিয়ে তীব্র বিষ তৈরি করার কৌশল সে জানে। কুসংস্কারের বশে লোকে তার কথা বিশ্বাস করে এবং তাকে রীতিমত ভয়ও করে।

খনিজ সম্পদ

দক্ষিণ আফ্রিকার খনিজ দ্রব্য, যেমন হীরা, সোনা, কয়লা পৃথিবীতে বিখ্যাত। কঙ্গোর উপনদী কাসাই। কাসাই নদীর বালির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে হীরক-প্রস্তর পাওয়া যায়। এগুলি অলংকারে ব্যবহারের পক্ষে খুব উপযুক্ত না হ'লেও নানারূপ নিখুঁত যন্ত্রপাতি তৈরি করতে কাজে লাগে, বিশেষ ক'রে পাথর-কাটার যন্ত্রের আগায় হীরক-প্রস্তর না লাগালেই চলে না। হীরকের মত শক্ত আর কিছু নাই। তৈলের খনির সন্ধানে মাটির ভিতর নল চালিয়ে পরীক্ষা করতে হয় ; এরূপ যন্ত্রের আগায় সূক্ষ্ম হীরক-প্রস্তর থাকায় শক্ত পাথরের স্তর অনায়াসে ফুটা করা সম্ভবপর হয়। হীরক অতি তীব্র উত্তাপ সহ্য করতে পারে, সহজে ক্ষয়ে যায় না। সূক্ষ্ম কল-কব্জাতেও হীরক ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে।

বেলজিয়ান কঙ্গো এলাকায় রেডিয়াম মেলে। ক্যানসার, টিউমার প্রভৃতি রোগের চিকিৎসায় রেডিয়াম একান্ত প্রয়োজনীয়। এ ছাড়া থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম ও তামা এখানে পাওয়া যায়। পরমাণবিক শক্তি উৎপাদন ক'রে তা কাজে লাগাতে থোরিয়াম ও ইউরেনিয়ামের প্রয়োজন। কঙ্গো অঞ্চল থেকে এ-সব জিনিস পৃথিবীর অনেক দেশে রপ্তানি করা হয় ; এ ছাড়া আছে তূলা, কফি, তামা ও টিন।

কঙ্গো নদীর অববাহিকা অঞ্চল বর্তমানে বিভিন্ন জাতির লোকের শাসনাধীন রয়েছে। বেলজিয়ামের অধীনে যে অংশ তাকে বলা হয় বেলজিয়ান কঙ্গো ; ফরাসীদের অধীন অংশ ফরাসী-কঙ্গো নামে পরিচিত।

এ ছাড়া আছে আঙ্গোলা বা পশ্চিম আফ্রিকার পর্তুগীজ অঞ্চল। আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলের এই নিবিড় বনভূমি যেমন বিস্ময়কর, এখানকার অধিবাসী ও তাদের জীবনযাপন-প্রণালীও তেমনি বিচিত্র!

দক্ষিণ আফ্রিকা

আফ্রিকার দক্ষিণ অংশের কেপ্ অব গুড্ হোপ, নাটাল, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট্ এবং ট্রান্সভাল এই চারিটি প্রদেশ নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন গঠিত। সব কয়টি প্রদেশের জন্য একটি পার্লামেণ্ট আছে এবং ইউনিয়নটি বৃটিশ কমন্ওয়েল্থের অন্তর্ভুক্ত।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাকৃতিক অবস্থার জন্য এখানে বিবিধ রকমের ফসল উৎপন্ন হয় এবং এখানকার খনিজ পদার্থ পৃথিবীতে বিখ্যাত। এই সম্পদের আকর্ষণে ইংলণ্ডের ধনিক বণিক সম্প্রদায় এখানে বিস্তৃত ব্যবসায়-কেন্দ্র গ'ড়ে তুলেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভূ-সংস্থান অদ্ভুত ধরনের। সর্বশেষ প্রান্ত সমুদ্রতটে সামান্য স্থানমাত্র সমতল; তার পরই তিনটি ধাপে ক্রমশঃ উঁচু হ'য়ে উঠেছে। একটি ধাপ উঠে কিছুটা স্থান প্রায় সমতলভাবে বিস্তৃত। এরূপ স্থানকে বলা হয় কারু—একটি ছোট কারু, একটি বড় কারু, আর একটি উত্তর কারু বা উচ্চ উপত্যকা। এইরূপ ভূমি-গঠনের ফলে দেশের মধ্যে যাতায়াত অসুবিধাজনক। এ ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে যে মেঘবাহী বাতাস প্রবাহিত হয়, তা দেশের অভ্যন্তরে বৃষ্টিপাত করতে পারে না। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে এবং শীতকালে পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত বাতাসে মেঘ ভেসে এসে কেবল কেপ্ প্রদেশেই বৃষ্টিপাত ঘটায়। দেশের ভিতরের দিকে পাহাড় দেওয়ালের মত ধাপে ধাপে উঠে গেছে ব'লে মেঘ বাধা পায় এবং এর ফলে দেশের অভ্যন্তরে বৃষ্টিপাত অতি বিরল।

মেষচারণ ভূমি

উপত্যকা ভূমি বা কারু তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর ; বড় গাছপালা নাই। ছোট ছোট ঝোপঝাড় আর ঘাসে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আবৃত। কোথাও বহুদূর পর্যন্ত সমভূমি, কোথাও উঁচুনীচু যেন তরঙ্গায়িত স্থির শ্যামল সমুদ্র। মাঝে মাঝে যে ছোট ছোট ঢিপি বা পাহাড় আছে সেগুলিকে বলা হয় কোপ্‌জেস্‌। শীতকালে কারু অঞ্চলের আবহাওয়া খুব আরামদায়ক। দিনে প্রচুর সূর্যকিরণে প্রান্তর ঝলমল করে, রাত্রিতে ঠাণ্ডা। গ্রীষ্মকালে উত্তাপ বড়ই প্রচণ্ড, ঘাস ও ঝোপঝাড় শুকিয়ে বিবর্ণ হ'য়ে যায়। কোথাও শ্যামলতার চিহ্ন চোখে পড়ে না। তখন কারুকে মনে হয় মরুভূমির মত। কারু অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ মেষ ও ছাগল প্রতিপালিত হয়। গ্রীষ্মকালে ঘাস শুকিয়ে গেলেও সেই শুক্‌না ঘাস ও ঝোপঝাড়ই হয় এদের খাদ্য। বসন্তকালে হাল্‌কা ধরনের বৃষ্টিপাত হয়, আর অল্পদিনের মধ্যে সবুজ ঘাস ও বিচিত্র বর্ণের ফুলে সমগ্র প্রান্তর উদ্যানের মত মনোহর হ'য়ে ওঠে। তখন কারু হয় ছাগল-ভেড়ার স্বর্গরাজ্য। দক্ষিণ আফ্রিকার তৃণাঞ্চল পৃথিবীর প্রধান পশম উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির অন্যতম। ছোট কারুতেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণে পশম উৎপাদন করা হ'য়ে থাকে। পশমের পরই দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মূল্যবান দ্রব্য হ'ল সোনা।

উপকূলবর্তী অংশ উষ্ণ এবং উর্বর। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হ'ল—আখ, তামাক, তূলা, আনারস, কলা। শীতকালের প্রধান ফসল গম। আজকাল ফলের চাষ দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। আঙুর, কমলা, কুল, ন্যাসপাতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ফল প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। কেপ্‌ প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে উৎপন্ন ফল উন্মুক্ত স্থানে শুকিয়ে বিদেশে রপ্তানির যোগ্য করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায়

কেবল এই অংশেই গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও বৃষ্টিবিহীন। বৃষ্টি হয় কেবল শীতকালে।

ট্রান্সভালের স্বর্ণখনি অঞ্চল

সোনা, পশম, হীরা, মেষের চামড়া, চিনি, ভুট্টা প্রভৃতি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। এর মধ্যে সোনাই সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান। ট্রান্সভালের ছোট একটি অঞ্চল থেকে প্রায় সবখানি সোনা পাওয়া যায়; এ অঞ্চল ৬০ মাইল দীর্ঘ, ৩ মাইল চওড়া। একে বলা হয় উইট্‌ওয়াটার্সল্যাণ্ড। বছরে প্রায় ৫ কোটি পাউণ্ড মূল্যের সোনা খনি থেকে তোলা হয় কিন্তু সোনা সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও ব্যয়সাধ্য। এর জন্য বহু মূল্যবান যন্ত্রপাতি আবশ্যক। সোনার কণা-মিশানো পাথর চূর্ণ ক'রে তা থেকে রেণু সংগ্রহ করতে হয়। ২৮ শিলিং মূল্যের সোনা বের করতে ১ টন ওজনের পাথর চূর্ণ করার প্রয়োজন হয় এবং এতে খরচ পড়ে প্রায় ২০ শিলিং। সোনার খনিতে ভারী এবং পরিশ্রমের কাজ সাধারণতঃ আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসী-দের দিয়ে করানো হয়; সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ ও কুলি-মজুরদের তদারকের কাজ করে শ্বেতাঙ্গরা।



হীরক-খনির একটি দৃশ্য

কুলি-মজুরদের জন্য খনির কাছাকাছি নির্দিষ্ট বাসস্থান আছে, অন্যত্র তাদের বাস করতে দেওয়া হয় না।

কিম্বার্লির হীরক-খনি

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী হীরা পাওয়া যায়। কেপ্ প্রদেশের কিম্বার্লি এবং ট্রান্সভালের প্রিটোরিয়া খনিই হীরকের জন্য বিখ্যাত। নিগ্রো মজুররা খনির ভিতর থেকে এক প্রকার নীলাভ পাথর ও মাটি খুঁড়ে তোলে। খনির ভিতরে-পাতা লাইনের ওপর দিয়ে ছোট ছোট গাড়িতে ক'রে পাথরগুলি কারখানায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে যন্ত্রের সাহায্যে এগুলি চূর্ণ ক'রে ধোওয়া হয়। তারপর গ্রীজ্-মাখানো মসৃণ ছাক্‌নির ভিতর দিয়ে সঞ্চালিত ক'রে বাছাই ক'রে নেওয়া হয় নানা রঙের ছোট-বড় হীরার টুক্‌রা। এগুলি বহুমূল্য অলংকার ও সাজসজ্জায় ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।

ঘানা

পূর্ব নাম গোল্ড কোস্ট। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে, বিষুবরেখা থেকে সামান্য উত্তরে অবস্থিত। পূর্বে নাইজিরিয়া, উত্তরে ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চল, পশ্চিমে আইভরি কোস্ট, দক্ষিণে গিনি উপসাগর। দেশটির আয়তন ৯১,৮৪৩ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৪১ লক্ষ ১২ হাজার। এতদিন এটি বৃটিশের আশ্রিত রাজ্য ছিল। এর সঙ্গে রয়েছে আশিটি রাজ্য, উত্তর অঞ্চল এবং টোগোল্যাণ্ডের কিছু অংশ। ১৯৫০ সনে গোল্ড কোস্টকে কিছুটা স্বায়ত্ত শাসন দান করা হয়। ১৯৫৬ সনে গোল্ড কোস্ট স্বাধীনতা লাভ ক'রে নূতন নাম গ্রহণ করেছে—ঘানা। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঘানার শাসনকার্য চলেছে।

ভূমির প্রকৃতি

ঘানার ভূমি-প্রকৃতির মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে। সমুদ্রের উপকূল অংশ নীচু, জলাভূমি। উত্তর দিকে ক্রমশঃ ভূমি উঁচু হ'য়ে গেছে ; মাঝে আছে ব্ল্যাক্ ভোল্টা, হোয়াইট্ ভোল্টা ও আফ্রাম্ উপত্যকা। সমগ্র ঘানায়

ভোল্টা নদীই প্রধান। বিষুবরেখার কাছাকাছি অবস্থিত হ'লেও ঘানায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী নয়। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর বৃষ্টির সময়। সেপ্টেম্বরেই বৃষ্টিপাত বেশী। দেশের অভ্যন্তরে বৃষ্টির পরিমাণ কম, ভূমি শুষ্ক, বৃক্ষলতার পরিমাণও কম। দক্ষিণ-পশ্চিম অংশেই বৃষ্টিপাত সবচেয়ে বেশী। এখানেই আছে ঘানার মেহগনি কাঠের গভীর বন।

নাইজিরিয়ার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হ'ল পাম-তেল। গোল্ড কোস্টেও এক সময়ে এই পাম-তেল ছিল প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। পরে পামের পরিবর্তে কোকো উৎপাদন সুরু হয়। এখন গোল্ড কোস্ট থেকে পৃথিবীর উৎপাদিত কোকোর প্রায় অর্ধেক সরবরাহ করা হ'য়ে থাকে। উত্তরের শুষ্ক অঞ্চলে ব্যাপকভাবে পশুপালনের ব্যবস্থা আছে। ঘানার প্রধান খনিজ দ্রব্য হ'ল সোনা, হীরা ও ম্যাঙ্গানীজ। মূল্যবান কাঠও এখান থেকে রপ্তানি হ'য়ে থাকে। কিন্তু ঘানায় যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় তাতে দেশের প্রয়োজন মেটে না। বাইরে থেকে আটা, ময়দা, চাল, চিনি, মাংস, মাছ প্রভৃতি আমদানি করতে হয়।



কোকো গাছ থেকে কোকো-সংগ্রহ

গিনি উপকূলে রাজধানী আক্রা বন্দর। জাহাজ এখানে এসে বন্দরে ভিড়তে পারে না। অগভীর সমুদ্র, তাতে অবিরাম ঢেউএর মাতামাতি।

জাহাজ বন্দর থেকে কয়েক মাইল দূরে সমুদ্রে নোঙ্গর ফেলে অবস্থান করে ; সেখান থেকে লম্বা লম্বা নৌকায় ক'রে মালপত্র ও যাত্রী তীরে নিয়ে আসা হয়। নৌকার মাঝিরা দক্ষ এবং সাহসী। বড় বড় ঢেউএর ওপর দিয়ে এরা নির্বিঘ্নে নৌকা চালিয়ে যায়।

পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ

মালয় উপদ্বীপ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অবস্থিত ছোট বড় দ্বীপগুলি প্রকৃতপক্ষে সাগর-জল থেকে উত্থিত আগ্নেয় গিরিমালারই চূড়াদেশ। কোন এক সময়ে অগ্নি-গিরির উদ্গীরণের কালে আলোড়নের ফলে এগুলি সমুদ্রের তলদেশ থেকে জলের ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। কালক্রমে এখানে উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তুর আবির্ভাব ঘটেছে। বড় দ্বীপগুলি হ'ল জাভা ও মাদুরা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, সেলিবিস্ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য দ্বীপ—যেমন বলি ও লম্বক, রিট-লিঙ্গা, টিমোর দ্বীপমালা, বঙ্কা ও বিলিটন প্রভৃতি। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের আয়তন ৭ লক্ষ ৩৫ হাজার বর্গমাইলের বেশী এবং অধিবাসীর সংখ্যা ৭ কোটি ৬০ লক্ষের ওপর।

জাভা

উষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত জাভা দ্বীপটি পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপ-সমষ্টির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। বারো মাস প্রচুর বৃষ্টিপাত, আর্দ্র উষ্ণতা এবং সারা বছরব্যাপী একই প্রকার ঋতুর ফলে এখানে বিচিত্র রকমের গাছপালা, পশুপক্ষীর সমাবেশ দেখা যায়। রঙ্-বেরঙের অর্কিড আছে পাঁচশো প্রকারেরও বেশী ; এর ফুলের সৌন্দর্য যেমন দর্শককে মুগ্ধ করে, তেমনি এর সৌরভে বাতাস হয় আমোদিত। অর্কিডের সুবাসে সুরভিত শিশির-বিন্দু যখন গাছ থেকে ঝ'রে পড়ে,

সুগন্ধে স্থান পরিপূর্ণ হ'য়ে যায়। সন্ধ্যায় নানাজাতীয় পাখীর কাকলি আর তার সঙ্গে ঝিল্লিরব যেন ঐক্যতান তোলে। গভীর জঙ্গলে ঘন গাছপালার মধ্যে সূর্যকিরণ প্রবেশ করতে পারে না ; বনে বাঘ, গণ্ডার, বড় বড় সাপ প্রভৃতি হিংস্র জীবের বাস। সমগ্র জাভায় গাছ ও ঝোপ-জঙ্গলের বৃদ্ধি খুব বেশী এবং ফুল হয় বিচিত্র ও উজ্জ্বল রঙের। পাখীর পালকের রঙের বৈচিত্র্যও নয়নলোভন। এ দ্বীপে ময়ূরসমেত সুন্দর পালকযুক্ত পাখীর সংখ্যা চারশো প্রকারেরও বেশী। এমন অনেক অদ্ভুত ধরনের কীট-পতঙ্গ, পাখী ও ফুল আছে এখনও যার নামকরণ হয়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের জন্য জাভার চিবোডাস্ নামক স্থানে এসে থাকেন।

পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ আগ্নেয় গিরির অংশ ; উদ্‌গীরিত গলিত লাভা ও অন্যান্য ধাতব পদার্থের সংমিশ্রণে এ-সব অঞ্চলের ভূমি হয়েছে অত্যন্ত উর্বর, বিবিধ প্রকার উদ্ভিদ ও ফসলের পক্ষে একান্ত উপযোগী। এ-সব দেশে নানাজাতীয় গাছপালার যেমন প্রাচুর্য, তেমনি নানা ফলও ফলে প্রচুর পরিমাণে। নারিকেল ও কলা এ অঞ্চলের প্রধান ফল। সাতশো প্রকারেরও বেশী কলা এখানে ফলতে দেখা যায় ; কতক আঙুলের মত সরু ও ছোট, কতক আবার মানুষের বাহুর মত লম্বা ও মোটা। এ ছাড়া আনারস, আম, জাম প্রভৃতিও যথেষ্ট।

অধিবাসী

জাভার অধিবাসীরা আকারে খাটো কিন্তু সুশ্রী ও সুগঠিত দেহ। তারা মালয় জাতির একটি শাখা থেকে উদ্ভূত। এরা বেশ বুদ্ধিমান ও বিনয়ী। প্রকৃতির লীলানিকেতনে বাসিন্দারা শান্তিপূর্ণ সচ্ছল জীবনযাপন করে। প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে এদের বাসগৃহ রচনা ও খাওয়া-পরার উপকরণের অভাব নাই। প্রকৃতির স্নেহচ্ছায়ায় এরা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে অভ্যস্ত ;

ভূমি উর্বর ; প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে শস্য উৎপাদন সহজসাধ্য। অধিবাসীরা প্রধানতঃ কৃষিকাজ দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে। ধান, কফি, আখ, মিষ্টি আলু, বাদাম, তামাক, সয়াবীন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা হয়। ভাত-মাছ প্রধান খাদ্য। নারিকেল শাঁস থেকে তেল তৈরি হয় ; তা মাথায় মাখায় এবং রান্নাতে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের ছোবড়া থেকে তৈরি হয় দড়ি, মাদুর, পাপোশ প্রভৃতি। শুক্‌নো পাতা দিয়ে ঘরের ছাউনী দেওয়া চলে ; কচি পাতা তরকারি হিসাবে এদের কাছে উপাদেয়। নারিকেলের শাঁস থেকে একপ্রকার সুরাজাতীয় পানীয় এবং চিনির মত সুস্বাদু দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।

অধিবাসীরা বেশীর ভাগ গ্রামে বাস করে। গ্রামকে বলা হয় ক্যামপঙ। ছোট ছোট গ্রাম, লোকসংখ্যা বেশী নয় ; ৩০ থেকে পাঁচশো। এরা জমির চাষ-আবাদ ক'রে শান্ত নিরিবিলি জীবন যাপন করে। গ্রামগুলি নারিকেল-কুঞ্জ দিয়ে ঘেরা। ছোট ছোট ঘর গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়ে। বাঁশ জন্মে প্রচুর ; বাঁশ কিংবা কাঠের খুঁটির ওপর খড় অথবা নারিকেল পাতার ছাউনী। বাঁশের চটা দিয়ে বোনা-বেড়া মাটি দিয়ে লেপে রঙ ক'রে সুন্দর দেওয়াল তৈরি করা হয়। এ-সব অঞ্চলে ভূমিকম্প হয় ঘন ঘন ; ঘর-দরজা হাল্‌কা ধরনের হওয়ায় কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। ঘর প'ড়ে গেলেও অল্প সময়ের মধ্যেই তৈরি ক'রে নেওয়া যায়। প্রতি বাড়ীর সামনে একটি ক'রে ফুলের বাগান আছে। এ থেকে অধিবাসীদের রুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে তিনটি পৃথক ঘর থাকে এবং এগুলি বারান্দা দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। একটিকে বলা হয় 'ওমান' —এখানে পরিবারের লোকজন বাস করে ; একটির নাম 'প্যান্‌ডোপো' —এখানে অতিথিকে অভ্যর্থনা করা হয়, বৈঠকখানার মত ঘর।

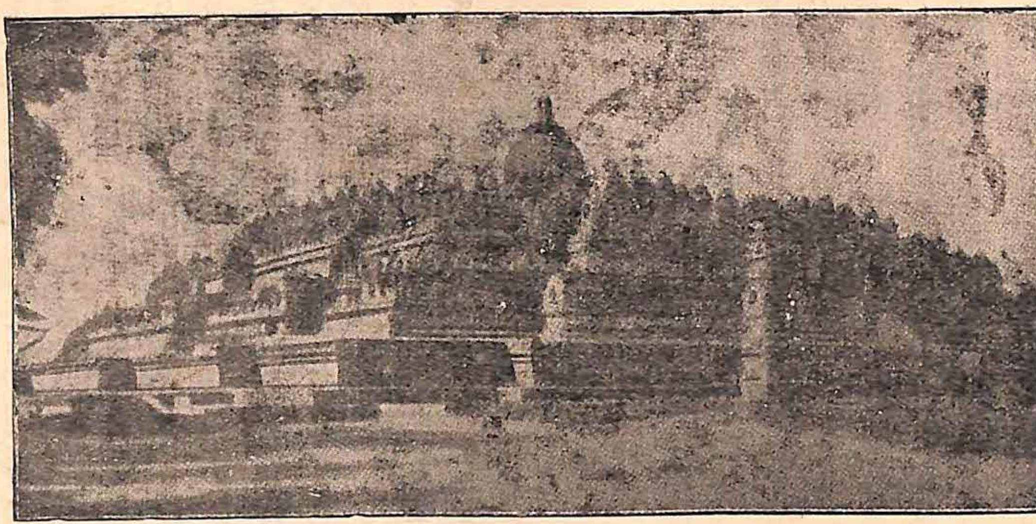
অন্যটি 'প্রিংগিটান'—অতিথি-অভ্যাগতের নিদ্রার জন্য ব্যবহৃত হয়। এ ঘরগুলির কোনটিতেই জানালা নাই; এর জন্য বিশেষ কোন অসুবিধাও হয় না, কারণ জাভার অধিবাসীরা বেশীর ভাগ সময় ঘরের বাইরেই কাটায়।

গরীব লোকেদের ঘরদোর সাধারণ রকমের। বাঁশকাঠির খুঁটি, ঘর ও পাতার ছাউনী, এক রকম বেতের মত শক্ত লতা দিয়ে বাঁধা। পশ্চিম জাভায় ঘরগুলির মেঝে কিছুটা উঁচু; নীচে গরু ছাগল রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

জাভানিজরা নিজেদের পরিবার-পরিজনের প্রতি খুব অনুরক্ত। বাপ-মা ছেলেমেয়েকে খুব ভালবাসে, কখনও তাদের শাস্তি দেয় না। বাসিন্দারা অল্প বয়সে বিবাহ করে। বিবাহের সময় খুব ভোজন-উৎসব ও নৃত্যগীতের আয়োজন করা হয়।

জাভানিজদের প্রধান খাদ্য ভাত। ধান উৎপাদনের অনুকূল জলবায়ু এবং ভূমি এখানে রয়েছে, কিন্তু এর জন্য চাষীকে রীতিমত পরিশ্রম করতে হয়। প্রায় এক-হাঁটু কাদাপূর্ণ মাঠে ধানের চারাগাছ রোপণ করতে হয়; ধান কাটার সময় ধানের শীষ একটি একটি ক'রে হাত দিয়ে কেটে নেওয়া হয়, কাস্তে দিয়ে তাড়াতাড়ি কাটার পদ্ধতি এদেশে প্রচলিত নাই।

জাভার স্ত্রী-পুরুষের পোষাক-পরিচ্ছদে বিশেষ পার্থক্য নাই। শহরে মেয়েরা এবং কতক পুরুষ যদিও ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করে, গ্রামাঞ্চলে স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ হ'ল সারোঙ্গ—একখণ্ড কাপড় বগলের নীচে দিয়ে ঘুরিয়ে বাঁধা, পা পর্যন্ত ঝুল। মেয়েরা কখন কখনও সারোঙ্গের ওপর ছোট কোট পরে কিংবা উত্তরীয়ের মত কাপড় কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে পরে; অথবা কোমরে জড়িয়ে বেঁধে রাখে। মেয়েরা শক্ত খোঁপা ক'রে চুল বাঁধে; পুরুষ পরে ছোট পাগড়ি।



বরবুদুরের মন্দির

আংটি ও বালা মেয়ে-পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করে। ছোট ছেলেমেয়েরা অনেক সময় পায়ে মল পরে।

জাভায় স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই রঙচঙের কাপড়-চোপড় খুব পছন্দ। মেয়েরা নিজহাতে কাপড় বোনে এবং নানা নক্সায় ও রঙে সাজিয়ে নেয়। এখানকার বাটিকের কাজ বিখ্যাত। কাপড় বোনার পর তাতে নানারকম নক্সা এঁকে তা মোম দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়; তারপর রঙের মধ্যে ডুবিয়ে নিলে মোমে-ঢাকা অংশ ছাড়া অন্য অংশ রঞ্জিত হ'য়ে যায়। পরে গরম জলে ভিজিয়ে মোম তুলে ফেললে বাটিকের কাজ সম্পূর্ণ হ'ল। মেয়েরা বাটিকের কাজে কৌশল ও সৌন্দর্য-বোধের পরিচয় দিয়ে থাকে।

বরবুদুর

জাভা দ্বীপের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত বরবুদুর প্রাচীন শিল্প ও সভ্যতার নিদর্শনরূপে বিখ্যাত। নবম শতাব্দীতে এখানে হিন্দু-বৌদ্ধ সভ্যতার বিশেষ উন্নতি ঘটেছিল এবং পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। বরবুদুরের মন্দির পিরামিডের আকৃতিতে একটি পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে উঠেছিল। মন্দিরের পাঁচটি ধাপ আছে এবং ধাপগুলি বিচিত্র ধরনের খোদাই ও কারুকার্যে সুশোভিত। হিসাব করা হয়েছে যে, খোদাই অংশগুলি পর পর সাজালে তার দৈর্ঘ্য হবে তিন মাইল। মিশরের প্রধান পিরামিড্ তৈরির চেয়ে বরবুদুরের মন্দির-নির্মাণ বৃহত্তর পরিকল্পনা, অধিকতর পরিশ্রম ও নিপুণতর শিল্পকলার পরিচায়ক। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরব মুসলমানদের অভিযানের ফলে এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হয়। এখন বাসিন্দাদের অধিকাংশই মুসলমান।

বলি ও সুমাত্রা

জাভার পূর্বদিকে এক সারিতে কতকগুলি দ্বীপ রয়েছে—তার মধ্যে বলিদ্বীপ প্রধান। এটির অধিবাসী জাভার মতই, তবে এদের দৈহিক গড়ন কিছুটা বেশী শক্তিশালী। বাসিন্দারা হিন্দু, জাভার মত মুসলমান নয়। সমগ্র দ্বীপে বহুসংখ্যক মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা প্রতিদিন ধূপ-ধূনা, ফুল-নৈবেদ্য দিয়ে মন্দিরে উপাসনা ক'রে থাকে। মেয়েরা মাথায় ফুলের ঝুরি নিয়ে দলে দলে চলে মন্দিরের পথে; সুসজ্জিত বেশ, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। কিশোরী মেয়েরা দেবীর মত সাজসজ্জা ক'রে নৃত্যের ভিতর দিয়ে দেব-দেবতার কাহিনী ফুটিয়ে তোলে। বলির দেবীনৃত্য বিশেষ উপভোগ্য।

বলির লোকেদের কাছে মোরগ-লড়াই একটি বিশেষ আনন্দদায়ক খেলা। পুরুষেরা সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হ'য়ে, মাথায় ফুলের মালা বেঁধে তাদের পোষা মোরগ নিয়ে নির্দিষ্ট 'যুদ্ধক্ষেত্রে' উপস্থিত হয়; কেউ মোরগ নিয়ে আসে সযত্নে বুকে ক'রে, কেউ বা আনে কারুকার্য-করা সোনার খাঁচায় ক'রে। তালে তালে ঢোল-মাদল বাজে, সুরু হয় মোরগের লড়াই; কৌতূহলী জনতা আনন্দোজ্জ্বল চোখে ভিড় ক'রে দাঁড়ায়।

জাভার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সুমাত্রা দ্বীপ জাভার প্রায় তিনগুণ বড়। কিন্তু এখানে লোকসংখ্যা জাভার চেয়ে কম, বিস্তৃত বন অঞ্চল এখনও মানুষের অধিকার ও ব্যবহারের আওতায় আসেনি। এককালে সুমাত্রা দ্বীপে হিন্দু সভ্যতার বিস্তার হয়েছিল, এখনও তার জের চলেছে। বাসিন্দাদের ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়, দেবদেবী ভারতীয়। অধিবাসীদের মধ্যে মালয়, হিন্দু, আরব এবং চীনাদের মিশ্রণ ঘটেছে। এ ছাড়া দেশের প্রাচীন আদিবাসীরা আছে কিছু সংখ্যায়। এদের মধ্যে বাটকরা এখন খ্রীষ্টান ধর্ম পালন করে; বেশীর ভাগ অধিবাসী বর্তমানে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত।

সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যভাগ দিয়ে বরিশান নামে দীর্ঘ পর্বতমালা মেরুদণ্ডের মত বিস্তৃত। অনেক নদী পর্বত থেকে উৎপন্ন হ'য়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে; এদের দৈর্ঘ্য কম ব'লে নৌবাহনযোগ্য নয়, পাহাড়ময় অংশ থেকে সাগরে গিয়ে পড়ে। অনেক বড় বড় হ্রদ ও জলাভূমি আছে; সেখানে আছে কুমীর আর বড় বড় কাঁকড়ার ঝাঁক। জঙ্গলে আছে বাঘ, অজগর সাপ আর হিংস্র আদিবাসী। এ-সব মিলে সুমাত্রা রহস্যময় দ্বীপ।

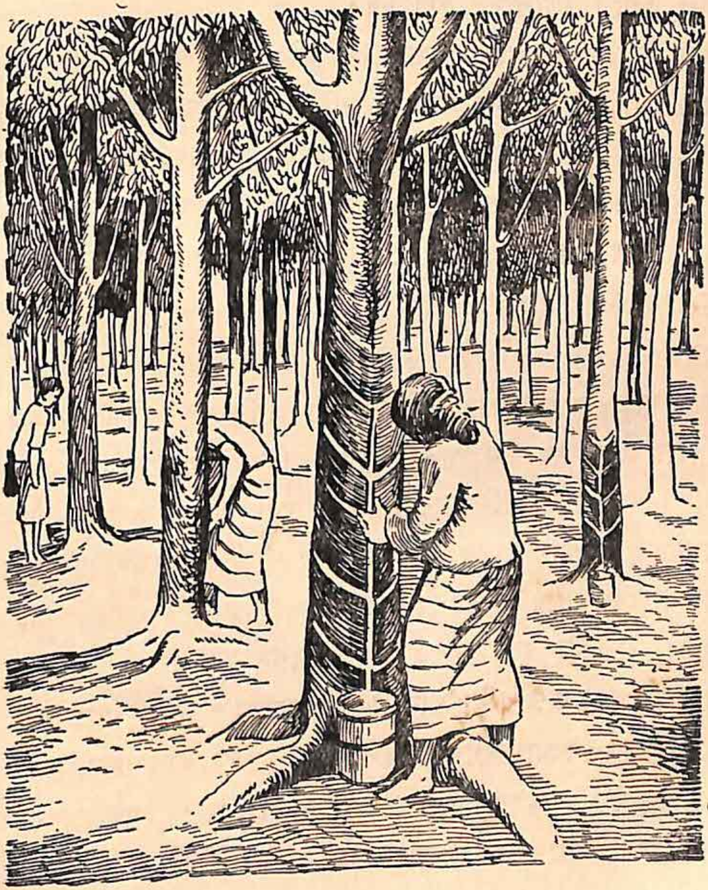
রবার-চাষ

মালয় উপদ্বীপ এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবায়ু বিদ্যমান—সারা বছরই বৃষ্টিপাত ঘটে। প্রচুর বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতার ফলে গভীর অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে। কঙ্গো উপত্যকায় এবং দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর অববাহিকায় অরণ্যময় প্রদেশে রবার স্বাভাবিকভাবেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকেই পৃথিবীর প্রায় সব রবার উৎপন্ন করা হ'য়ে থাকে। মালয় ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ রবার সরবরাহ করে। মালয়ের সর্বত্র রবার জন্মে। এর জন্য দরকার সারা বৎসরব্যাপী উষ্ণতা ও সকল ঋতুতে বৃষ্টিপাত। মালয়ে রবার উৎপাদনের জন্য যে-সব ক্ষেত্র আছে তা সাধারণতঃ শ্বেতাঙ্গদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

রবার-ক্ষেত্র

প্রথমে জঙ্গল কেটে এবং আগুন দিয়ে পুড়িয়ে জমি পরিষ্কার ক'রে নেওয়া হয়। প্রথমে নার্সারিতে রবার গাছের বীজ থেকে চারা প্রস্তুত করা হয়। এগুলির বয়স এক বছরের মত হ'লে একর-প্রতি জমিতে ৮০টি ক'রে চারা রোপণ ক'রে যত্নসহকারে এদের বাড়িয়ে তুলতে হয়। অগাছা তুলে ফেলে ক্ষেত্র পরিষ্কার রাখা আবশ্যক; বৃষ্টিপাতের ফলে যাতে মাটি ধুয়ে না যায় সেজন্য গাছের ফাঁকে ফাঁকে এমন শস্য বপন করা হয়, যাতে মাটির ক্ষয় নিবারণ হয় অথচ জমি জঙ্গলাকীর্ণ না হয়।

রবার গাছগুলি দেখতে সুশ্রী ; পাতা সতেজ চক্‌চকে। গাছ সাধারণতঃ ছয় বছর বয়সের না হ'লে তা থেকে রবার সংগ্রহ করা হয় না। গাছ রবার দেবার উপযোগী হ'লে গোড়া থেকে কিছুটা ওপরে গাছের ছাল কেটে চেঁছে দিয়ে সেখানে একটি নল লাগিয়ে রস সংগ্রহ করার জন্য



মালয়ের রবার-সংগ্রহ

একটি মাটির পাত্র স্থাপন করা হয়, খেজুর গাছের রস যেমন ক'রে বের ক'রে নেওয়া হয় কতকটা তেমনি উপায়ে। দুধের মত সাদা এবং ঐ

রকম তরল পদার্থ নির্গত হ'য়ে পাত্রে জমা হয়। সেই রস সংগ্রহ ক'রে রবার তৈরির কারখানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং এর সঙ্গে অ্যাসেটিক এসিড যোগ ক'রে কিছুটা ঘন ও জমাট রবারে পরিণত করা হয়। রবার-পিণ্ড যন্ত্রে পিষে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে ধুয়ে, শুকিয়ে লম্বা ক্রেপ্ রবারে রূপান্তরিত করা হয়।

মালয় উপদ্বীপের পশ্চিমাংশের নিম্নভূমিতেই বেশীর ভাগ রবার-ক্ষেত্র অবস্থিত। এই অঞ্চলেই মালয়ের অধিকাংশ লোকের বসতি। এখানে সুন্দর মোটরের রাস্তা এবং অনেকগুলি রেলপথ নির্মিত হয়েছে। দেশের অভ্যন্তর থেকে রবার ও খনিজ পদার্থ উপকূলের বন্দরে আনা হয় বিদেশে রপ্তানির জন্য। পেনাঙ্ ও সিঙ্গাপুর মালয়ের সবচেয়ে বড় বন্দর ও রবার রপ্তানি-কেন্দ্র।

টিনের খনি

মালয়, দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া এবং আফ্রিকার নাইজিরিয়া থেকে পৃথিবীর প্রায় সব টিন পাওয়া যায়। টিন উৎপাদনে মালয়ের স্থান প্রথম। মালয়ের পশ্চিমাংশের উপত্যকায় টিনের আকর যথেষ্ট। অশোধিত অবস্থায় ধাতব টিন গ্র্যাভেল পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে এবং পাথরের চেয়ে তা ওজনে ভারী ব'লে কারখানায় যন্ত্রের সাহায্যে হাল্কা উপাদান ধুয়ে ফেলে টিন নিষ্কাশন করা হয়। টিনের ধাতব পদার্থ সংগ্রহের জন্য গভীর খনি খনন করতে হয় না। এগুলি সংগ্রহ ক'রে পেনাঙ্ কিংবা সিঙ্গাপুরে রেলযোগে পাঠানো হয়। সেখানে গলিয়ে পাত-টিন তৈরি ক'রে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। মালয়ে বহুলোক রবার-ক্ষেত্র ও টিনের কারখানায় কাজ ক'রে জীবিকা অর্জন করে।

দেশের শাসন-ব্যবস্থা

চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব বিদ্যমান ছিল; এগুলি ছিল বৃহত্তর ভারতের অংশস্বরূপ। পঞ্চদশ

শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপ থেকে মুসলমান অভিযানের ফলে এ অঞ্চলের সভ্যতা ও শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসে পরিবর্তন সাধিত হ'ল। পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চল মসলা উৎপাদনের জন্য পৃথিবীতে খ্যাতি অর্জন করেছিল। ইউরোপীয় বণিকগণ বাণিজ্যের সন্ধানে এদেশে এসে ঘাঁটি স্থাপন করতে লাগল। ১৫২০ সনে আসে পর্তুগীজগণ এবং এই শতাব্দীর শেষদিকে আসে ওলন্দাজগণ। ওলন্দাজ বণিকগণ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলে প্রায় দুইশত বৎসর বাসিন্দাদের ওপর শাসন ও শোষণ চালাতে থাকে। ১৭৯৮ সনে এই কোম্পানি ভেঙে দিয়ে ওলন্দাজ সরকার ১৮১৬ সনে দেশের শাসনভার নিজ হাতে নেয়। জাভার



ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জা-কার্তার একটি রাজপথ

অধিবাসীরা বিনা প্রতিবাদে ওলন্দাজ শাসন মেনে নেয়নি ; কিন্তু কাল-ক্রমে সরকারের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানোর জন্য নানা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলা হয় এবং যদিও এর লাভের মোটা অংশ চলে যেত বিদেশী সরকারের দেশে, তবু বহু দেশীয় অধিবাসী এ-সব প্রতিষ্ঠানে ও কৃষিক্ষেত্রে কাজ ক'রে অন্ন-সংস্থানের সুযোগ পায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানীরা দ্বীপগুলি অধিকার ক'রে অধিবাসীদের স্বাধীনতা অর্জনের বাসনায় উৎসাহ দান করে এবং ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে মনোভাব দীপ্ত ক'রে তোলে। জাপানীরা যুদ্ধে পরাস্ত হ'য়ে অঞ্চল ত্যাগ ক'রে গেলে অধিবাসীরা জাভা, সুমাত্রা ও মাদুরা মিলে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপন ক'রে নিজেদের শাসনভার নিজেরা গ্রহণ করে। যুদ্ধের অবসানে ওলন্দাজগণ আবার এ অঞ্চলে ফিরে এসে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে এবং ১৯৪৯ সন পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ান ও ওলন্দাজদের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে। অবশেষে ওলন্দাজ সরকার এরূপ চেষ্টার ব্যর্থতা বুঝতে পারে এবং ১৯৪৯ সনের ২৭শে ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

বোর্ণিও

বোর্ণিও চীনা সাগরে জাভার উত্তরে অবস্থিত একটি বিশাল দ্বীপ। কচ্ছপের পিঠের মত দেশের মধ্যভাগ উঁচু; সারা দেশটিই পাহাড়ময় এবং নিবিড় বনে আচ্ছন্ন। বিষুবরেখা দেশের প্রায় মাঝখান দিয়ে গেছে। সারা বছরই এখানকার জলবায়ু উষ্ণ এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য আর্দ্র। ঝোপ-জঙ্গলেও গাছপালার বৃদ্ধি এত বেশী যে, ঘন বনের ভিতর প্রবেশ করা অসাধ্য। সূর্যের তেজ প্রচণ্ড; মেঘগর্জন ও বারি-বর্ষণও তেমনি প্রবল। নদীগুলি পাহাড়ের গা বেয়ে গর্জন করতে করতে নেমে আসে।

বোর্ণিও রহস্যময় দেশ। মেরুদেশ, কঙ্গো ও আমাজনের নিবিড় বনাঞ্চল, দুর্গম মরুভূমি—সর্বত্রই মানুষ অভিযান ক'রে সে-সব স্থানের রহস্য উদ্ঘাটন করেছে কিন্তু বোর্ণিও-র অনেক অঞ্চলে এ পর্যন্ত মানুষের প্রবেশ সম্ভবপর হয়নি। উত্তর উপকূলে সারাওয়াক্ ব্রিটিশের প্রভাবাধীন এবং উপকূলের অবশিষ্ট অংশে মালয়বাসীদের উপনিবেশ। দেশের

অভ্যন্তর-ভাগে বাস করে বোর্ণিও-র আদিবাসীরা ; তারা অসভ্য ও বন্য পশুর মতই হিংস্র, অনেকেই নরখাদক। এমন দুর্গম বনজঙ্গলের মধ্যে এরা বাস করে যে, এদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

বোর্ণিও-র স্বাভাবিক বনজ সম্পদ হ'ল গাটাপার্চা, রবার গাছ, নারিকেল, সাগুগাছ, বেত ও লোহাকাঠ। এখানে নানা জাতীয় অর্কিড ও বিচিত্র রকমের ফুল-ফল দেখা যায় ; খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, তেল, হীরা ও সোনা প্রধান।

বাসিন্দা

বোর্ণিও-র আদিম বাসিন্দারা দেশের উপকূলভাগেই বাস করতো। প্রায় একশত বৎসর আগে মালয়বাসীরা অভিযান ক'রে উপকূল অংশ অধিকার ক'রে নেয়, আদি বাসিন্দারা চলে যায় দেশের মধ্যভাগের পাহাড় ও বনময় অংশে। ক্লেমানটান্, মুরুট, কায়ান্, কেনিয়া এবং পুনান্ উপজাতির লোকেরা এখনও বন্য ও বর্বর জীবন যাপন করে। এদের পরস্পরের মধ্যে প্রায় লড়াই লেগেই থাকে। বর্শা, তরবারি, তীর-ধনুক প্রভৃতি এদের অস্ত্র। সকলেই নানা আকারের ঢাল ব্যবহার করে—কাঠ দিয়ে তৈরি ক'রে নানা রঙ দিয়ে তা সাজিয়ে নেয়। কেনিয়া উপজাতির যোদ্ধারা তাদের ঢালে মানুষের মাথা এঁকে দেয় এবং তার ওপর তাদের হত্যা-করা শত্রুদের চুল থরে থরে গুচ্ছ ক'রে বেঁধে রাখে। ডায়াক নামক উপজাতির লোকেরা



ডায়াক যুবক ও যুবতী

নদার নিম্নাংশে এবং কতক বা সমুদ্রের উপকূলে বাস করে। ডায়াকদের দেহ সুগঠিত ও পেশীবহুল। মেয়ে-পুরুষ উভয়েই গহনা পরে। হাতীর দাঁতের নক্সা-করা অলংকার, ঝিনুক ও শঙ্খ, রূপোর বালা, আংটি, মাকড়ি, কোমরপেটি প্রভৃতি অলংকার মেয়েদের প্রসাধনের প্রিয় উপকরণ। উৎসবের পোষাক হ'ল রঙিন, সোনার সূতায় কারুকার্য-করা কাপড়; পুরুষেরা পরে পাগড়ি, তাতে রঙিন পালক গুঁজে দেয়। পুরুষেরা এই কাপড় কোমরে জড়িয়ে একটি প্রান্ত সম্মুখের দিকে ঝুলিয়ে দেয়; মেয়েরা কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরে এবং তার ওপর পরে বেত-দিয়ে-বোনা একটি ঘেরাটোপ; দেখতে কতকটা ডমরুর মত—মাঝখানে সরু, দুই প্রান্ত কিছুটা চওড়া। সরু অংশটা থাকে কোমরের ওপর।

বিচিত্র জীবজন্তু

বোর্ণিও-তে কতকগুলি অদ্ভুত রকমের জীবজন্তু আছে। সন্ধ্যাকালে গাছ থেকে ঝুপ্ ক'রে প্যারাসুট দিয়ে নামার মত নামে উড়ন্ত খেঁকশিয়াল। গাছে গাছে উড়ে বেড়ায়, দরকার হ'লে মাটিতেও ছুটে চলে। এমনি আছে উড়ন্ত ব্যাঙ, বাদুড়ের মত তার পাখা। জঙ্গলে বড় বড় ভীষণ আকারের জোঁক; আগুনে পিঁপড়ের আগুনে-পোড়ার মত ফোস্কা পড়ে আর লঙ্কা পিঁপড়ে কামড়ালে মনে হয় লঙ্কা ঘষে দেওয়া হয়েছে।

বাসিন্দাদের বাড়ীঘর

বোর্ণিও-র উপজাতি বাসিন্দারা নিজ নিজ দলের লোক একত্র বাস করে। এদের গ্রাম বা পৃথক বাড়ী নাই। এক-একটি লম্বা কাঠের ঘরে পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো লোক বাস করে। একখানি লম্বা ঘর ২৫ ফুট চওড়া, ৪০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা; সামনে দিয়ে একটানা বারান্দা। পৃথক পৃথক কক্ষে ভিন্ন ভিন্ন পরিবার থাকে। দলপতির ঘরের সামনে

মাটির পাত্রে সর্বক্ষণ আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়। শত্রুর মাথার খুলি, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও শত্রুর কাছ থেকে লুঠ-ক'রে-নেওয়া সামগ্রী জাঁকজমক-সহকারে সাজিয়ে রেখে নিজেদের বীরত্বের পরিচয় ঘোষণা করে।

লম্বা বাড়ীগুলি প্রায়ই জলাশয়ের ধারে তৈরি করা হয়। উঁচু খুঁটির ওপর এমনভাবে এগুলি নির্মিত যে, শত্রুপক্ষের লোকেরা সহসা আক্রমণ করতে না পারে কিংবা নীচে থেকে বর্শা দিয়ে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে বিঁধে মেরে ফেলতে না পারে। ঘরের কাছেই থাকে নৌকা, আর ঘরের নীচেই রাখা হয় কুকুর, ছাগল, শূয়োর, মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপাখী। জলপথে চলাফেরা করতে হয়; নৌকা তৈরিতে এবং নৌকা চালনায় এরা খুব পটু।

উপজাতির লোকদের মধ্যে কেবল পুনান্‌রা গভীর জঙ্গলময় অঞ্চলে বাস করে; তারা অপরের সংস্পর্শে আসে না।

নিউগিনি

বোর্ণিও-র মত নিউগিনি দ্বীপটিও পাহাড়ময় এবং ঘন বনে আবৃত। দেশের প্রায় মাঝখান দিয়ে কয়েকটি পর্বতমালা মেরুদণ্ডের মত বিস্তৃত—পশ্চিম দিকে ন্যাস্থ্‌ এবং অরেঞ্জ পর্বতমালা, পূর্বদিকে প্রসারিত বিসমার্ক এবং ওয়েন্‌ স্ট্যান্‌লি। কতকগুলি পর্বতশৃঙ্গ সোজা আকাশের দিকে উঠে গেছে; মনে হয় যেন বিরাট দৈত্য বনজঙ্গলের ভিতর মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

নিউগিনিতে দুইটি ঋতু—অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বর্ষা। এই সময় উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হয় এবং বৃষ্টি হয় মুষলধারে। মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে, উত্তাপ হয় তীব্র। বছরের অন্যান্য সময় জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক, বাতাস বয় দক্ষিণ-পূর্ব

দিক থেকে। দেশের উপকূল ভাগ উষ্ণ ও আর্দ্র ; পাহাড়ময় উচ্চ অংশ শীতল।

দেশের অভ্যন্তরে নিবিড় জঙ্গলের জন্য অধিক দূর প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। বনে রডোডেনড্রন, চন্দনকাঠ, ইবোনি, নানাজাতীয় অর্কিড প্রভৃতির গাছ। বিচিত্র বর্ণের পালকযুক্ত নানা ধরনের পাখী দেখা যায় প্রচুর—কাকাতুয়া, টিয়া, উটপাখীর মত ক্যাসোয়ারি, বড় বক প্রভৃতি। কুমীর, টিক্‌টিকি, অজগর সাপ, বিষধর সাপ এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারু জাতীয় পেটে থলে-ওয়ালা প্রাণী এখানে দেখতে পাওয়া যায়।

অধিবাসী

নিউগিনির আদিবাসীরা মাঝারি ধরনের দীর্ঘ, বলিষ্ঠ পেশীবহুল দেহ। ছোট একখানা কাপড় কোমরের সঙ্গে বেঁধে এক প্রান্ত সামনে ঝুলিয়ে দেয়। মাথার চুল ঝাঁক্‌ড়া, বাঁশের ছোট ছোট কাঠি দিয়ে তা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রাখে এবং তাতে পাখীর পালক গুঁজে দেয়। নাকের মাঝখান দিয়ে ফুটো ক'রে হাড়, পালিশ-করা কচ্ছপের খোলা কিংবা কাঠি ঝুলিয়ে রাখে। যার নাকে যত বড় অলংকার ঝুলানো থাকবে তার গৌরব তত বেশী!



নিউগিনির আদিবাসীদের গাছের ওপর তৈরি বাড়ী

বোর্ণিও-র আদিম বাসিন্দাদের মত নিউগিনির আদিবাসীরাও দলবদ্ধ হ'য়ে একই লম্বা ঘরে বাস করে। নিজেদের মধ্যে সর্বদা শত্রুতা লেগে

থাকার ফলে এরা সব সময়েই আক্রমণ ও আত্মরক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে বাসস্থান নির্মাণ করে। উঁচু খুঁটির ওপর ঘর তৈরি করার সুবিধা এই যে, অতর্কিতে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা কম ; তা ছাড়া অনেকে একত্র বাস করায় আক্রমণ প্রতিরোধ করাও সহজ। কতক অধিবাসী বনজঙ্গলে গাছের ওপর ঘর তৈরি ক'রে বাস করে। লম্বা মই দিয়ে দিনে ওঠানামা করে, রাত্রিতে টেনে তুলে নেয়। এরূপ গৃহ বন্যজন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার পক্ষেও উপযোগী। আদিম বাসিন্দারা নরখাদক ; শত্রুকে হত্যা ক'রে তার মাংস খায়, মাথা দিয়ে নিজের ঘর সাজায়। যার ঘরে যত বেশী মাথা সে তত বড় বীর !

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ

প্রশান্ত মহাসাগর। দিগন্ত-বিস্তৃত নীলাম্বুরাশি নীল আকাশের সঙ্গে যেন গিয়ে মিশেছে ; উত্তাল তরঙ্গ ঝড়ের গর্জনের সঙ্গে দীপ্ত রোষে ফুলে ওঠে, সাদা ফেনা মাথায় নিয়ে যেন আকাশ স্পর্শ করতে চায়। কখনও দিগন্ত-জোড়া সুনীল সমভূমির মত স্নিগ্ধ জলরাশি শান্ত মহিমায় বিরাজ করে। শীতল ও উষ্ণ জলের স্রোত পরস্পরের সান্নিধ্য এড়িয়ে এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়।

বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ ; নীল সচল জল দিয়ে ঘেরা সবুজ অচল ভূখণ্ড। দ্বীপগুলি রূপকথার রাজ্যের মত সুন্দর। সবুজ গাছপালায়-ঢাকা পাহাড়, শুভ্র প্রবালের উপকূল, সম্মুখে প্রসারিত নীল সমুদ্র। বিচিত্র রঙের সমাবেশ।

বেশীর ভাগ দ্বীপই ছোট—পঞ্চাশ মাইল থেকে এক মাইল, দেড় মাইল দীর্ঘ দ্বীপও আছে। কতকগুলি সমুদ্র থেকে মাত্র একশো দেড়শো ফুট উঁচু। বড় দ্বীপগুলির পাহাড়ময় অংশে নানাজাতীয় মূল্যবান

কাঠের বন। ছোটগুলি প্রবাল দ্বীপ। পলিপস্ নামক এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র সামুদ্রিক কীটের অস্থি দিয়ে প্রবাল দ্বীপ গঠিত হয়। এই কীটগুলি সমুদ্রের জল থেকে ক্যালসিয়াম্ কার্বোনেট্ গ্রহণ ক'রে দেহের আবরণ গঠন করে। ক্যালসিয়াম্ কার্বোনেট্ প্লাস্টারের প্রধান উপাদান। কোটি কোটি প্রবালকীট জলে-ডোবা পাহাড়ের ধারে বাস করে। এদের মৃতদেহগুলি পর পর জমতে জমতে কালক্রমে স্তূপ হ'য়ে ওঠে। প্রবালকীট এমন স্থানেই বৃদ্ধি পায় যেখানে সমুদ্রের জল উষ্ণ এবং তাতে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন থাকে। উষ্ণ মণ্ডলে সূর্যকিরণের জন্য সমুদ্রের জল উষ্ণ; প্রবালকীটও তাই সমুদ্রে বিষুবরেখার কাছাকাছি দেখা যায়। গভীর-জলে প্রবালকীট থাকতে পারে না, কারণ অক্সিজেন সাগর-জলের উপরি অংশেই বেশী। যেখানে ঢেউ এসে পাহাড়ের গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ে এবং এর ফলে জলের মধ্যে বুদ্‌বুদের সৃষ্টি হয়, সেখানে অক্সিজেন বেশী পরিমাণে জলের সঙ্গে মেশে। কাজেই দেখা যায়, উষ্ণ মণ্ডলে পাহাড়ের কোলে অশান্ত জলের আলোড়নপূর্ণ স্থানে প্রবালকীট দ্রুত বাড়তে থাকে এবং এদের অস্থিপুঞ্জ পাহাড়ের গায়ে স্তূপ হ'তে হ'তে নূতন নূতন দ্বীপের সৃষ্টি করে। প্রশান্ত মহাসাগরের এই অঞ্চলে জলের ভিতর প্ল্যাংকটন নামক আণবিক্ষণিক পদার্থ খুব কম পরিমাণে বিদ্যমান। এই পদার্থ শীতল জলের সমুদ্রে বেশী পরিমাণে থাকায় জলের রঙ দেখায় গাঢ় সবুজ; কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণ অঞ্চলে জল গলানো কাচের মত স্বচ্ছ। সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় জলের গভীরতা অনুসারে স্বচ্ছ, হাল্‌কা বা গাঢ় নীল রঙ চোখে পড়ে।

জীবনযাত্রা

প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যেকার এই সকল দ্বীপে যারা বাস করে তাদের খাদ্য ও জীবনযাত্রায় এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্যত্র দেখা

যায় না। এই সকল দ্বীপে প্রধান সমস্যা পানীয় জল ও খাদ্য ফসল সংগ্রহ করা। চারিদিকে লবণাক্ত সাগর-জল, দ্বীপে নদী বা ঝরণা নাই। কেবল বৃষ্টির জল সঞ্চয় ক'রে রেখে বারো মাস পানীয় জলের অভাব মিটাতে হয়। বৃষ্টির জল ধরার জন্য কূয়া বা ডোবা খুঁড়ে রাখলেও তাতে লোণা জল নীচে থেকে ওঠে কিন্তু লবণাক্ত জল ভারী ব'লে বৃষ্টির সুপেয় জলের নীচের স্তরে থাকে। তাই সুমিষ্ট জল তুলে নিতে অসুবিধা হয় না। এ ছাড়া বড় বড় ড্রামে টিনের ঘর-থেকে-চোয়ানো বৃষ্টির জল জমা ক'রে রাখা হয়। পানীয় জলের জন্য অধিবাসীদের আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে হয়। বৃষ্টি কেবল গাছপালাকে সতেজ পুষ্ট করে না, মানুষকেও জল দিয়ে বাঁচায়।

দ্বিতীয় সমস্যা হ'ল খাদ্য-সমস্যা। এ সকল দ্বীপপুঞ্জে কৃষিকাজ ক'রে খাদ্যশস্য উৎপাদন করার মত উর্বর ভূমি নাই। লোকেদের নির্ভর কয়েক প্রকার আলুজাতীয় মূল এবং বনজ ফলের ওপর। টারো নামক কেশুর ধরনের এক প্রকার মূল এদেশে জন্মে; এর পাতা কতকটা পানের আকৃতি, চার-পাঁচ ফুট দীর্ঘ; মূল হয় প্রকাণ্ড। এক বছরে বেশ বড় হ'য়ে ওঠে। এই মূল আগুনে ঝলসিয়ে কিংবা সিদ্ধ ক'রে, খোসা তুলে ফেলে ভিতরের শাস পিষে নিয়ে রুটির মত খাদ্য তৈরি করা হয়। একে বলে পোই।

এ ছাড়া মিষ্টি আলু, ইয়াম এবং মনিয়াক্—যা ক্যাসাভা ও ট্যাপোইকা নামেও পরিচিত—সাধারণ প্রচলিত মূলজাতীয় খাদ্য। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রিয় খাদ্য রুটিফল (Breadfruit)। বনজঙ্গলে রুটি-ফলের গাছ অনেক জন্মে। ফলগুলি গোলাকার, ফুটবলের চেয়ে কিছুটা ছোট; বছরের মধ্যে একবার ফলে, যদিও সকল গাছে একই সময়ে ফল পাকে না। লোকেরা বোঝা বোঝা পাকা রুটিফল সংগ্রহ ক'রে আনে; এ থেকে খাবার তৈরি করতে প্রায় সারাদিন লাগে।

প্রথমে ফল আগুনে ঝলসাতে হয় কিংবা জলে সিদ্ধ করতে হয়। তারপর খোসা তুলে ফেলে আঁশযুক্ত শাঁস বেটে বা পিষে নরম ক'রে রুটি ও পিঠার মত খাদ্য প্রস্তুত করা হয়। এ সময় খাদ্য মিলে প্রচুর, লোকেদের আনন্দোৎসবের ধুম প'ড়ে যায়।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের খাদ্যবস্তু বৈচিত্র্যহীন, স্বাদবিহীন ; কেবল উদর-পূরণের উপযোগী। মাংস এখানে দুষ্প্রাপ্য। গৃহপালিত পশুপক্ষীর সংখ্যা নগণ্য, বনে পশুপাখীও খুবই কম। সমুদ্র থেকে মাছ, কচ্ছপ ও অক্টোপাস ধ'রে খাদ্যে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করা হয়। গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে শূয়োর ও মুরগীই প্রধান।

এই সকল দ্বীপে নারিকেল স্বাভাবিকভাবেই জন্মে প্রচুর। সমুদ্রের ধারে ঘন সুদৃশ্য নারিকেল-কুঞ্জ। পাকা নারিকেল জলে পড়ে, ভেসে গিয়ে তীরে ঠেকে, নূতন চারাগাছ গজিয়ে ওঠে। নারিকেল অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। নারিকেল শাঁস শুকিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা সর্বপ্রধান ব্যবসায়। ছোবড়া থেকে দড়ি, মাদুর প্রভৃতি তৈরি হয়। কচি নারিকেলের শাঁস থেকে উৎকৃষ্ট মদজাতীয় পানীয় তৈরি করা যায় ; শাঁস খাদ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া ডাবের জল পুষ্টিকর পানীয় হিসাবেও উৎকৃষ্ট। তবে পাকা নারিকেল থেকে শাঁস সংগ্রহ ক'রে বিক্রি করার দিকেই ঝোঁক বেশী।

প্রশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চলের দ্বীপগুলি এদের অধিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি ও দেহাকৃতি অনুসারে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। বিভিন্ন দ্বীপ-সমষ্টির ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে, যেমন—পলিনেশিয়া অর্থাৎ বহু দ্বীপ, মাইক্রোনেশিয়া অর্থাৎ ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ এবং মেলানেশিয়া অর্থাৎ কালো দ্বীপপুঞ্জ। মেলানেশিয়ার বাসিন্দাদের অধিকাংশ কৃষ্ণকায়, যদিও সকল দ্বীপশ্রেণীতেই কতক সংখ্যক কৃষ্ণকায় অধিবাসী আছে।

সমাজ-ব্যবস্থা

প্রাকৃতিক কারণে অধিবাসীদের খাদ্য-সংস্থানের জন্য পরস্পরের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। কোন ব্যক্তি একা বা অল্প কয়েকজন নিয়ে গঠিত পরিবারের পক্ষে প্রতিদিন খাদ্য সংগ্রহ ক'রে ওঠা সম্ভবপর হয় না। তাই স্বাভাবিকভাবেই এদের মধ্যে সমবায়-নীতি অনুসারে পারস্পরিক সহযোগিতা গ'ড়ে উঠেছে। কতকগুলি পরিবার নিয়ে এক-একটি গোষ্ঠী গঠিত। এর সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ না হ'লেও একত্র বসবাস, খাদ্য-সংগ্রহ, গৃহ-নির্মাণ, ক্যানো (নৌকা) তৈরি প্রভৃতি কাজ একত্র করার ফলে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি দৃঢ় হয়। এইরূপ এক-একটি গোষ্ঠীর সদস্য অনেক কয়টি দ্বীপে ছোট ছোট গোষ্ঠী হ'য়ে বাস করে। একটি পরিবার একদিন ক'রে গোষ্ঠীর সকল সদস্যের খাদ্য সরবরাহ করার ভার নেয়। রুটিফল কিংবা অন্য মূলজাতীয় দ্রব্য থেকে খাবার তৈরি করতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। যদি প্রতি পরিবারকে পৃথক পৃথকভাবে নিজের খাবার তৈরি ক'রে নিতে হ'ত, তা হ'লে সারাদিন কাজ ক'রেও দৈনিক খাবার প্রস্তুত করা যেত না। তাই এক-একটি পরিবার পালা ক'রে গোষ্ঠীর সকল পরিবারের জন্য খাদ্য তৈরি ও পরিবেশন করে। প্রতিদিনই এদের কোন-না-কোন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ!

এক সময়ে এই সকল দ্বীপবাসীদের মধ্যে নরখাদকের সংখ্যা ছিল অনেক। এখনও এ অভ্যাস একেবারে লোপ পায়নি, বিশেষ ক'রে মেলানেশিয়ানদের মধ্যে। এরা যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করে সেখানে কৃষিকাজ বা পশুপালন সহজসাধ্য নয়। খাদ্যের জন্য সমুদ্রের মাছ, গাছের ফল ও মূল আর জীবজন্তুর মাংস একমাত্র অবলম্বন। আদিম বাসিন্দারা মনে করে আসল শূয়োর পোষার চেয়ে নিকটবর্তী কোন দ্বীপে হানা দিয়ে 'লম্বা শূয়োর' (অর্থাৎ মানুষ) ধ'রে এনে ভোজন

করা বেশী সহজ। বিভিন্ন দ্বীপবাসীদের মধ্যে শত্রুতা এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তির মাংস খাওয়ায় অনেক উপকার হয়, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হ'য়ে মেলানেশিয়ানরা নরখাদকরূপে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল।

প্রশান্ত মহাসাগরের ভিতরকার এই সকল দ্বীপের অধিবাসীরা সাগরে নৌকা-চালনায় খুব পটু। ছোট ডিঙ্গির মত কাঠের নৌকাতে আট-দশজন লোক দাঁড় টেনে কয়েক শো মাইল দূরবর্তী দ্বীপে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যায়। সঙ্গে খাবার থাকে কেবল কতকগুলি ডাব নারিকেল; তার জল পানীয়, আর কচি শাঁস খাদ্য। সূর্য, নক্ষত্র ও বাতাসের গতি দেখে এরা দিক নিরূপণ করে। দিক ভুল হ'য়ে অন্য দিকে চলে গেলে নৌকাডুবিতে কিংবা অনাহারে মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু এরূপ ঘটনা কদাচিৎ ঘটে।

ফরমোজা

চীনদেশের ভূখণ্ড থেকে প্রায় একশো মাইল পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে ফরমোজা দ্বীপ। এর চীনা নাম তাইওয়ান। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ নাবিকরা এটি আবিষ্কার করে। এর পাহাড়ময় উপকূল, নিবিড় বন, মধ্যভাগের উচ্চ পর্বতমালা প্রথম দৃষ্টিতেই বিদেশী নাবিকদের মুগ্ধ করেছিল। মহাসাগরের নীল জলরাশির অবিরাম মাতামাতি; তার মাঝে স্থির, অঞ্চল বনশোভিত স্থলভাগ। পর্তুগীজরা এর নাম দিয়েছিল—ইল্‌হা ফরমোজা অর্থাৎ সুন্দর সুশ্রী দ্বীপ।

গভীর বনে আচ্ছাদিত দ্বীপটি এক সময়ে নরখাদকদের বাসভূমি ছিল। জাহাজ-ডুবি হওয়ায় যে-সব লোক এর তীরে এসে পৌঁছত তারা হ'ত এদের খাদ্যবস্তু। ফরমোজায় কর্পূরগাছের বন স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। এই গাছের ছাল, পাতা, কাণ্ড ছেঁচে জলে সিদ্ধ করলে

তেলের মত পদার্থ জলের ওপর ভেসে ওঠে। এই তৈলাক্ত পদার্থ থেকে কর্পূর তৈরি হয়। কর্পূরকাঠ সংগ্রহ করার জন্য যারা এই দ্বীপে এসে নামতো, তাদের মধ্যেও অনেকে ফিরে যেতে পারতো না; নরখাদকদের হাতে প্রাণ হারাত। এখনও নরখাদকজাতি ফরমোজার বনে বাস করে; তবে সভ্যজগতের সংস্পর্শে আসায় এদের হিংস্রতা অনেকখানি কমে গেছে।

ভৌগোলিক দিক দিয়ে ফরমোজা চীনদেশেরই অংশ। ১৮৯৫ সালে জাপান এই দ্বীপটি চীনের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। তখন জাপান এক বিশাল সাম্রাজ্য গ'ড়ে তোলার উন্মাদনায় মেতে উঠেছিল। পঞ্চাশ বছর পরে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে পরাজিত জাপানের কাছ থেকে ফরমোজা চীনকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখন চীনে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। ক্রমে দেশে বিপ্লব দেখা দেয়। কম্যুনিস্টগণ চীনা জাতীয় সরকারকে দেশ থেকে বিতাড়িত ক'রে সমগ্র চীনদেশে নূতন চীন গণতন্ত্র স্থাপন করে। তখন চিয়াং কাইশেক জাতীয় সরকারের দপ্তর ফরমোজায় স্থানান্তরিত ক'রে দ্বীপটি অধিকার করেন। এখনও এই অধিকার বর্তমান রয়েছে এবং নূতন চীন ফরমোজা দখল করার চেষ্টা ক'রে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিয়াং কাইশেকের প্রধান সমর্থক। আমেরিকার সাহায্যেই এ পর্যন্ত এ অধিকার বজায় রাখা সম্ভবপর হয়েছে।

ফরমোজার আয়তন ১৩,৮৯০ মাইল—সিংহলের প্রায় অর্ধেক এবং লোকসংখ্যা সাড়ে সাতাশি লক্ষ। দেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হ'ল ধান —বছরে দুইবার উৎপন্ন হয়; চা, আখ, মিষ্টি আলু, কর্পূর ও পাট অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য। শিল্পের মধ্যে আছে চিনি, তামাক, ময়দা তৈরি, কাচ, কাগজ, ইট ও সাবান তৈরি, লোহার যন্ত্রপাতি তৈরির ব্যবস্থা। সোনা, রূপা, তামা ও কয়লা প্রধান খনিজ দ্রব্য। রাজধানী তাই-পে চীনা জাতীয় সরকারের প্রধান ঘাঁটি।

আদিম অধিবাসী

ফরমোজার আদিম বাসিন্দারা ছিল নরখাদক। যে-সব চীনা প্রথমে এ দ্বীপে বসবাস স্থাপন করতে গিয়েছিল তারা এদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এই অসভ্য অধিবাসীরা পাতার কুঁড়েঘরে বাস করতো; তাদের ছিল ভয়ঙ্কর হিংস্র ধরনের পোষা কুকুর। এই কুকুরের সাহায্যে তারা হরিণ, শূয়োর এমন কি চিতাবাঘ পর্যন্ত শিকার করতো। কতক অধিবাসী মাটি গর্ত ক'রে তার ওপর ছাউনী দিয়ে ঘর বানাত। মাটি যাতে ধ'সে না পড়ে সেজন্য গর্তের ভিতর চারধারে পাথর সাজিয়ে দিত।

অধিবাসীরা ভুট্টা ও জোয়ার চাষ করে; শস্য-সংগ্রহের কাজ মেয়েদের। কাপড় বোনা এদের সকলের মধ্যেই প্রচলিত। যদিও এখন নরমাংস ভক্ষণের সুযোগ বিশেষ নাই তবু নরমুণ্ড সংগ্রহ করার দিকে এদের বিশেষ ঝোঁক। মানুষের মাথার খুলি এদের কাছে খুব মূল্যবান পানপাত্র। কিছু সংখ্যক মাথার খুলি ভাবী পত্নীকে উপহার দিলে তবে পুরুষ মানুষ বিয়ে করতে পারে। বিবাহিত দম্পতি নূতন গৃহে বসবাস করতে সুরু করে কিন্তু এই ঘর তৈরির সময় এর ভিত্তিতে কয়েকটি মানুষের মাথা স্থাপন ক'রে তার ওপর দেওয়াল তুলতে হয়। ঘর সাজানোর সবচেয়ে ভাল এবং প্রশংসনীয় উপকরণ ছবি বা ফুলের তোড়া নয়, শত্রুর মাথা!

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ

চীনদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন জপমালার মত কতকগুলি ছোট-বড় দ্বীপ উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত হ'য়ে রয়েছে। এর সংখ্যা ৭,১০০; মোট আয়তন ১,১৫,৭০৭ বর্গ-মাইল। এর মধ্যে ২,৪৪০টি দ্বীপের নাম আছে, অবশিষ্টগুলি

অনামী। মাত্র ৪৬২টি দ্বীপের আয়তন এক বা ততোধিক বর্গমাইল; অন্যগুলি এর চেয়েও ছোট, জলের ওপর জেগে-থাকা সামান্য স্থলভাগ মাত্র।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এশিয়ার দ্বীপ-সমষ্টিগুলির মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী। প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে বনজ এবং খনিজ সম্পদে দ্বীপগুলি অতুলনীয়। এখানে অনেকগুলি সুন্দর স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে। সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা ৯,৬১০ ফুট; দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব প্রান্তে কিছুটা স্থানে সমুদ্রের গভীরতা ৩৫,৪০০ ফুট—যেখানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউণ্ট এভারেস্ট অবলীলাক্রমে তলিয়ে যেতে পারে!

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ভূমি উর্বর, জলবায়ু উষ্ণ এবং সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাবে আরামপ্রদ। এদেশে ধান ফলে প্রচুর। অধিবাসীর শতকরা ৮০ জন কৃষিজীবী। ধানই প্রধান শস্য এবং ভাত লোকের প্রধান খাদ্য। লুজনের সমতলভূমিতে ধানের প্রাচুর্য আর কাগাইয়ান উপত্যকায় এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশী তামাক জন্মে। এই তামাক থেকে তৈরি হয় বিশ্ববিখ্যাত ম্যানিলা সিগার। এ ছাড়া এখানকার বিখ্যাত উৎপন্ন দ্রব্য হ'ল শন, আঙুর, ন্যাসপাতি, কমলালেবু প্রভৃতি।

দ্বীপসমূহে নারিকেল গাছ প্রচুর; মাটি ও জলবায়ুর গুণে এগুলির যেমন বৃদ্ধি তেমনি অজস্র ফসল। বনে জন্মে মূল্যবান মেহগনি কাঠ। উৎপন্ন দ্রব্যের হিসাবে ফিলিপাইন শন ও নারিকেল উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম, আখ উৎপাদনে দ্বিতীয়, কাঠ উৎপাদনে চতুর্থ এবং তামাক উৎপাদনে সপ্তম স্থান অধিকার ক'রে আছে।

পৃথিবীতে আর কোন দ্বীপপুঞ্জে এখানকার মত উদ্ভিদ-সম্পদ নাই। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের মতে এখানে দশ হাজার প্রকার ফার্ণ ও ফুলগাছ আছে। ফিলিপাইনের শ্রেষ্ঠ এবং জাতীয় ফুল হ'ল স্যাম্পাগুইটা। তারকা আকৃতির তুষারশুভ্র ছোট ফুল; গুচ্ছ গুচ্ছ ধরে, স্নিগ্ধ স্থায়ী

গন্ধ। ফিলিপিনোদের নিকট এ ফুল প্রীতি, যৌবন ও বন্ধুত্বের নিদর্শন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে যত বেশী এবং বিচিত্র রকমের অর্কিড আছে এমন পৃথিবীর আর কোথাও নাই। এখানকার ভ্যাণ্ডা স্যাণ্ডারিয়ানা নামক অর্কিড সৌন্দর্যে ও সুগন্ধে পৃথিবীতে অতুলনীয়। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রাকৃতিক শোভা দর্শককে মুগ্ধ করে। উন্নতশীর্ষ পর্বতমালা; নীল আকাশের নীচে কুয়াসা-আবৃত আগ্নেয়গিরির শৃঙ্গ, আন্দোলিত উপত্যকা তাতে নারিকেল-কুঞ্জ ও শস্যক্ষেত্র সবুজের গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে; নদী বয়ে চলেছে আঁকেবাঁকে, তার তীরে সতেজ বাঁশের বন আর বুনো ফুলের প্রাচুর্য। কোথাও পাহাড়ের ওপর থেকে জলপ্রপাত নেমে আসছে গর্জন ক'রে, কোথাও প্রশান্ত হ্রদের বিস্তৃত জলরাশি সূর্যকিরণে ঝিক্‌মিক্ করে। উপকূলে বালুকাতটে নীল সাগরের ঢেউ ছন্দে ছন্দে এসে ভেঙে পড়ে। সব মিলে দেশটি যেন রূপকথার রাজ্যের মত সুন্দর ও সমৃদ্ধ।

জাতীয় বৈশিষ্ট্য

ফিলিপিনোরা বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় পটু, কুসুমবিলাসী, নাচ ও গান-বাজনায় দক্ষ। এদের দেশীয় ভাষা টাগালগ্ যদিও স্কুলে শিখানো হয়, ইংরেজি ভাষাই দেশের সর্বত্র প্রচলিত। তাছাড়া শিক্ষিত ফিলিপিনোরা স্পেনীয় ভাষা শিক্ষা করে। জাতিগত হিসাবে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের নানা ভাষায় কথা বলার দক্ষতা দেখা যায়। গান-বাজনা ও লোকনৃত্যের প্রতি জনসাধারণের বিশেষ আকর্ষণ আছে। গীটার বাজনা খুব জনপ্রিয়।

এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের মতই ফিলিপিনোরা সাহসী এবং কষ্টসহিষ্ণু। সুখ-দুঃখকে এরা নীরবে ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করে। পরিবারের ও দেশের কল্যাণের জন্য স্বার্থত্যাগ ও কষ্টবরণ করতে এরা বিমুখ নয়। সমাজে স্ত্রীলোক মর্যাদা পেয়ে থাকে। সামাজিক,

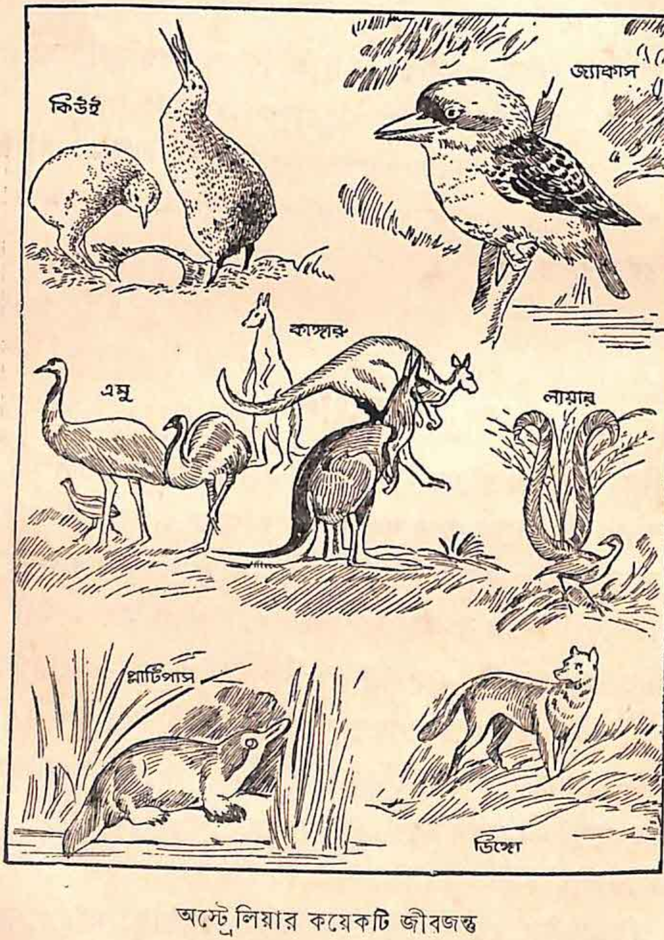
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করে। এশিয়াতে ফিলিপিনো স্ত্রীলোকই প্রথম ভোটদানের অধিকার এবং উচ্চ সরকারী শাসন-বিভাগীয় কাজে যোগদানের সুযোগ লাভ করেছিল। মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে শিক্ষা, বিজ্ঞান, আইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা-বিদ্যা, শিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করে। আধুনিক কালে মেয়েদের মধ্যে—বিশেষ ক'রে স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে—পোষাক-পরিচ্ছদে মার্কিন মহিলাদের অনুকরণের ঝোঁক দেখা যায়। ফিলিপিনোরা অমায়িক, সৌন্দর্যপ্রিয় ও অতিথিপরায়ণ।

অষ্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ, ক্ষুদ্রতম মহাদেশ। মহাদেশটি অতি প্রাচীন। এর ভূ-পৃষ্ঠ প্রায় সমতল—অন্যান্য যে-কোন মহাদেশ থেকে বেশী সমতল—উচ্চ পর্বতমালা নাই। পূর্ব-উপকূলে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত গ্রেট্ ডিভাইডিং রেঞ্জ নামক যে পর্বতমালা বিশাল মাছের কাঁটার মত প্রসারিত রয়েছে তা এককালে সু-উচ্চ ছিল। কালক্রমে তা ক্ষয়ে গেছে। নিউ সাউথ ওয়েলসের ব্লু পর্বতের কসকুইসকো শৃঙ্গ-ই (৭৩২৮ ফুট) অস্ট্রেলিয়ার উচ্চতম পর্বতচূড়া। শীতকালে তুষারে আচ্ছন্ন হ'য়ে ব্লু পর্বত অপূর্ব শ্রী ধারণ করে। শীতের মরসুমে এ পর্বত অঞ্চল শিকারী ও ভ্রমণকারীর কাছে আকর্ষণীয় স্থান হ'য়ে ওঠে।

গ্রেট্ ডিভাইডিং রেঞ্জের পশ্চিমে বিস্তৃত উপত্যকা মহাদেশের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ স্থান জুড়ে বিরাজ করছে। এ অংশে চাষ-আবাদ চলে না। যে সকল স্থান জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে সেখানে হয়েছে মেরিণো মেষের উৎকৃষ্ট পালন-ক্ষেত্র। মহাদেশের মধ্যভাগের

ভূমি পাষাণময়। মাটি নাই, গাছপালাও নাই। চূণাপাথরের রাজ্য। সুন্দর ওপেল পাথর যার স্বচ্ছ দানার মধ্যে আলো ঝলমল করে এই জনশূন্য পাথরের প্রান্তরে পাওয়া যায়।

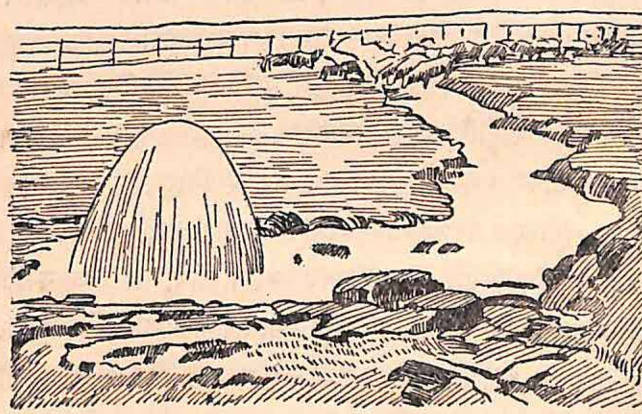


অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি জীবজন্তু

অতি প্রাচীনকালে অস্ট্রেলিয়া এশিয়া মহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। প্রাকৃতিক কারণে কোন সময়ে ভূমিকম্পের ফলে কতক স্থান সাগরের নীচে ব'সে যাওয়ায় অস্ট্রেলিয়া বিচ্ছিন্ন হ'য়ে দ্বীপে পরিণত হয়েছে।

এ মহাদেশে এখনও এমন কতক অদ্ভুত ধরনের জীবজন্তু আছে যা এশিয়ার অন্য কোথাও দেখা যায় না। পেটে থলে-ওয়ালা প্রাণীর মধ্যে কাঙ্গারু ও কোয়ালা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অস্ট্রেলিয়ার প্লাটিপাস্ নামক জীবটি অদ্ভুত। হাঁসের ঠোঁটের মত ঠোঁট, লোমযুক্ত চ্যাপ্টা লেজ, গায়ের চামড়া ছুঁচোর মত। ডিম পাড়ে, বাচ্চাকে কিন্তু দুধ খাইয়ে বড় করে। এমন জীব পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।

অস্ট্রেলিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বৃষ্টিপাত খুবই কম। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দেশের শতকরা চল্লিশ ভাগ অংশই মরুসদৃশ। এইরূপ চাষ-আবাদের পক্ষে অনুপযোগী প্রায় ৬ লক্ষ বর্গমাইল স্থান মানুষের কোন কাজে লাগে না; কেবল এদেশের যাযাবর অসভ্য বাসিন্দারা



আর্টেজিয় কূপ

এ অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় এবং কোন প্রকারে জীবন ধারণ করে। কোন কোন জায়গায় মাটি খুঁড়ে আর্টেজিয় কূপ তৈরি করা হয়। তাতে যে জল পাওয়া যায় তার সঙ্গে খনিজ পদার্থের পরিমাণ বড় বেশী। এরূপ জলে বৃষ্টির অভাব পূরণ হয় না।

উপনিবেশ

ইংলণ্ডের লোকেরা মার্কিন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। সেখানে কয়েদীদের নির্বাসন দেওয়া হ'ত ; অনেক লোক গিয়ে নূতন নূতন কৃষিক্ষেত্র ও পশুপালন ক্ষেত্রের সূত্রপাত করেছিল। সেদেশ থেকে রাজস্ব আদায় হ'ত, সেখানে ব্যবসায়-বাণিজ্যও চলতো। যুদ্ধ ক'রে আমেরিকানরা ইংলণ্ডের শাসন থেকে মুক্ত হ'য়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর ইংরেজরা নূতন উপনিবেশ গ'ড়ে তোলার জন্য নূতন দেশের সন্ধান করছিল। এই সময়ে ১৭৭০ সালে ক্যাপ্টেন কুক অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূল আবিষ্কার করেন এবং দেশ সম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশ করেন। ইংরেজরা নূতন ভূখণ্ডের সন্ধান পেল।

১৭৮৭ সালে ১১খানা জাহাজে ক'রে ১৫০০ লোক অস্ট্রেলিয়াতে পাঠানো হয়। এদের মধ্যে ৮০০ জন ছিল কয়েদী। আট মাস ধ'রে জাহাজ চালিয়ে যাত্রীদল পূর্ব-উপকূলে বর্তমান সিড্‌নির নিকটে এসে উপস্থিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সুরু হ'ল। উপনিবেশের প্রথম দল এই দূরদেশে সত্যই নিজেদের নির্বাসিত মনে করতো। পূর্বদিকে দিগন্তলীন প্রশান্ত মহাসাগর, পশ্চিমে ব্লু পর্বত প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে। নবাগতদের মধ্যে চাষী বা দক্ষ কারিগরের সংখ্যা ছিল খুবই কম। যে গম তারা আবাদ করতো বৃষ্টির অভাবে তা শুকিয়ে যেত। খাদ্যের জন্য নির্ভর করতে হ'ত ইংলণ্ড থেকে পাঠানো আটা-ময়দা, লবণ-মাখানো মাংসের ওপর। এইভাবে চললো পঁচিশ বছর। অবশেষে দুইজন সাহসী ব্যক্তি—ওয়েণ্টওয়ার্থ ও ব্ল্যাক্‌সল্যাণ্ড —ব্লু পর্বত পার হ'য়ে পশ্চিম দিকে গিয়ে বিস্তৃত উর্বর সমভূমি অঞ্চল দেখতে পান। এর পর ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে উপনিবেশ ছড়িয়ে পড়ে। উর্বর স্বাস্থ্যকর স্থানে লোক-বসতি হয় ঘন ; তৃণ অঞ্চলে মেষ-পালনের লাভজনক কাজ চলতে থাকে।

১৮৫০ সালে অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে সমৃদ্ধির এক নূতন পর্যায় সুরু হয়। নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের হারগ্রেভস্‌ নামে এক মেষপালক সোনার খনির সন্ধানে গিয়েছিলেন উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায়। সেখানে কোন সুবিধা করতে পারলেন না তিনি। একটি বিষয় তিনি লক্ষ্য করলেন—ক্যালিফোর্নিয়ায় যে অঞ্চলে সোনার খনি পাওয়া গেছে সেখানকার অঞ্চল আর অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর বাসস্থানের কাছেকার অঞ্চল দেখতে অনেকটা একই রকম। তবে তাঁর বাড়ীর কাছেই কি মাটির নীচে রয়েছে সোনা যার সন্ধানে তিনি এসেছেন এক অন্য মহাদেশে? এই প্রশ্নটি নিজের মনের মধ্যে নিয়ে তিনি ফিরে এলেন অস্ট্রেলিয়ায় এবং পরীক্ষার জন্য মাটি খুঁড়তে সুরু করলেন। প্রশ্নের উত্তর মিললো। ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তিনি প্রথম সোনার সন্ধান পেলেন লিউইস্‌ পণ্ডসের চারিপাশে। সোনার কথা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো। সকল দেশ থেকে লোক এল দলে দলে মধুলোভী মৌমাছির মত। নানাস্থানে খনন কার্য চললো। মাটির নীচেকার সঞ্চিত সম্পদ মানুষের অধিকারে এল। অস্ট্রেলিয়া সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠলো। সোনা, লোহা, কয়লা ও অন্যান্য ধাতু। এ-সব অবলম্বন ক'রে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা হ'ল। এ ছাড়া বর্তমানে মেষপালন, মেষের পশম, মাংস, গরুর দুধ, মাখন প্রভৃতি অস্ট্রেলিয়ার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। অস্ট্রেলিয়া থেকে এখন বছরে এক হাজার কোটি পাউণ্ড পশম—পৃথিবীর উৎপন্ন পশমের প্রায় ৩০ ভাগ, সাড়ে ছয় লক্ষ টন গো-মাংস, দুই কোটি সাতাত্তর লক্ষ টন মেষের মাংস, এক কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ টন মাখন, পঁয়তাল্লিশ হাজার টন পনীর বিদেশে পাঠানো হয়।

অস্ট্রেলিয়া শহরপ্রধান দেশ। এখানে পল্লী অঞ্চল একরকম নাই বললেই চলে। শহর-বন্দরেই অধিকাংশ লোকের বাস। উপকূলের উর্বর এবং অনুকূল জলবায়ুর অঞ্চলেই উপনিবেশ প্রধানতঃ গ'ড়ে

উঠেছে। কৃষিকার্য যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালানো হয়। কলের লাঙ্গলের সাহায্যে বিস্তীর্ণ এলাকায় ফসল ফলানো এখানকার চাষীদের বৈশিষ্ট্য। গো-মেষ পালন ও ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজেও কলের সাহায্য নেওয়া হয়। গরু দোহন করা, দুধ থেকে মাখন তৈরি করা, মেষের পশম কেটে নেওয়া, পশম থেকে উল তৈরি—সবই করা হয় যন্ত্রের মাধ্যমে।

মেষ-পালন ক্ষেত্র

অস্ট্রেলিয়ার তৃণ অঞ্চল মেষের চারণক্ষেত্র। শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা এই লাভজনক ব্যবসায় চালিয়ে থাকে। এক এক পালকের হাজার হাজার মেষ। বিস্তীর্ণ এলাকায় মেষ চ'রে বেড়ায়। মেষের রাখাল ঘোড়ায় চ'ড়ে তদারক করে, সঙ্গে থাকে কুকুর। কোনটি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেলে কুকুর তাকে তাড়িয়ে দলে নিয়ে আসে। বসন্তকালে মেষের পশম কেটে নেওয়া হয়। আজকাল বৈদ্যুতিক কাঁচি একাজে ব্যবহৃত হয়। একবার পশম ছেঁটে দিলে আবার নূতন কোমল পশম গজায়।

মেষপালক আরামদায়ক কাঠের ঘরে বাস করে। মেয়েরা গৃহস্থালীর কাজ করে, পুরুষদের কাজ মেষের তদারক করা, পশম সংগ্রহ করা, পশম বিক্রির জন্য শহরে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। বালকরা বয়স্ক পুরুষ লোকদের সঙ্গে কাজে সহায়তা করে।

মেষপালকদের জীবন নিঃসঙ্গ। বড় বড় পালনক্ষেত্রে ৫০।৬০ মাইল পর পর এক এক বাড়ী অবস্থিত। এরূপ অবস্থায় পরিবারের লোক ছাড়া অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করা সম্ভবপর হয় না। ছেলেমেয়েরা মুক্তবায়ুতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে। ছোট কালে তারা স্কুলে যায় না, বাড়ীতেই বাবা-মার কাছে লেখাপড়া শেখে। একটু বড় হ'লে ছেলেমেয়ে সবাই ঘোড়ায় চ'ড়ে ৪০।৫০ মাইল দূরের স্কুলে যায়। স্কুলে ঘোড়া রাখার আস্তাবল আছে। ছুটির পর সবাই ঘোড়া ছুটিয়ে নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যায়।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের আদিবাসীরা যাযাবর। কৃষিকাজ তারা জানে না, শিকার ক'রে জীবন ধারণ করে। বর্শা দিয়ে জীবজন্তু, মাছ শিকার করে। বর্শা-নিক্ষেপে এরা খুব পটু। এদের আর একটি অদ্ভুত অস্ত্র আছে, নাম বুমেরাং। শক্ত বাঁকা কাঠ দিয়ে তৈরি। শিকার করার সময় শিকারী এটি পশু বা পাখীর দিকে তাক্ ক'রে ছুঁড়ে মারে। মজা হ'ল এই যে, শিকারকে আঘাত ক'রে বুমেরাং আবার শিকারীর কাছে ফিরে আসে!

আদিবাসীদের গায়ের রঙ কালো, দেখতে কদাকার। সামান্য কাপড়-চোপড় পরে। ছোটরা সর্বদা উলঙ্গই থাকে। এরা ঘর তৈরি করতে বা পশুপালন করতে জানে না। খাদ্যের সন্ধানে নানাস্থানে ঘুরে বেড়ায়। পুরুষের ঝাঁক্ড়া চুল ও দাড়ি হয়, মেয়েদেরও চুল হয় দীর্ঘ। মেয়েরা মাথার চুল দিয়ে কোমরবন্ধ তৈরি করে ও গাছের বাকল কোমরে জড়িয়ে রাখে। কখনও পশমের গামছার মত তৈরি ক'রে পরে। শীতল অঞ্চলে যারা বাস করে তারা অপোসাম, কাঙ্গারু প্রভৃতির চামড়া পরিধান ও শীত নিবারণের জন্য ব্যবহার ক'রে থাকে।

আদিবাসীরা এমু পাখীর রঙিন পালক মাথায় বেঁধে, সাদা ও লাল মাটি দিয়ে দেহ রাঙিয়ে সাজগোজ করে। খাদ্য সম্বন্ধে এদের বাদ-বিচার বিশেষ নাই। শাক-সব্জী, মাছ, মাংস, সাপ, টিক্টিকি, পিঁপড়ের ডিম, উই, শুঁয়াপোকা এমন কি কাদা পর্যন্ত খাদ্য। এক সময়ে নরমাংসও ছিল উপাদেয় খাদ্য। পুরুষরা খাদ্য সংগ্রহ করে; মেয়েরা খাবার প্রস্তুত করে। আদিবাসীরা বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত। এদের নির্দিষ্ট এলাকা আছে, এর মধ্যে তারা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, সঙ্গে থাকে তাঁবু ও গৃহস্থালীর জিনিসপত্র। মেয়েদের কাজ হ'ল তাঁবু, তৈজসপত্র, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি বহন করা। এদের কতকগুলি অদ্ভুত

রীতি আছে। একটি হ'ল শাশুড়ী-জামাতার মুখদর্শন নিষেধ। জামাতা কখনই শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকাবে না, শাশুড়ীও জামাতার মুখ দর্শন করবে না। করলে গুরুতর শাস্তি, এমন কি প্রাণদণ্ড পর্যন্ত!

নিউজিল্যাণ্ড

অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রায় ১২ শত মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত নিউজিল্যাণ্ড। প্রধান দ্বীপ দুইটি—উত্তর দ্বীপ ও দক্ষিণ দ্বীপ নামে পরিচিত। দেশটি এক সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশ থেকে দূরতম স্থান ব'লে গণ্য হ'ত। বর্তমানে উড়োজাহাজ, রেডিও এবং দ্রুতগামী সমুদ্রপোতের কল্যাণে এর দূরত্ব যেন কমে গেছে; ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিউজিল্যাণ্ড অনেক দেশের চেয়ে বেশী এগিয়ে এসেছে। তার প্রধান কারণ এখানকার ভূমির উর্বরতা এবং অনুকূল জলবায়ু।

উত্তর-দক্ষিণে হাজার মাইল স্থান জুড়ে নিউজিল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য মনোমুগ্ধকর। পৃথিবীর অন্য কোথাও এত বিচিত্র রকমের সুন্দর বিষয়ের সমাবেশ দেখা যায় না। এর তুষারমণ্ডিত পর্বত-চূড়া হীরার মত ঝক্‌মক্ করে। পাহাড়ের পাশে রয়েছে বড় বড় গিরিখাত ও সুন্দর সুন্দর হ্রদ। এখানকার উষ্ণ প্রস্রবণ পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম; জলপ্রপাতও বিশাল। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ—সারা বছর ধ'রেই মনোরম।

অধিবাসী

নিউজিল্যাণ্ডের আদিবাসীরা মাওরি নামে পরিচিত। ১৬৪২ সালে ওলন্দাজ নাবিক আবেল টাসম্যান প্রথমে এ দ্বীপে এসে আদিবাসীদের কাছ থেকে প্রীতিপূর্ণ আচরণ পাননি। ১৭৬৯ সালে ক্যাপ্টেন কুক দ্বীপ দুইটি জাহাজে প্রদক্ষিণ ক'রে স্থানীয় বাসিন্দা মাওরিদের সঙ্গে

বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। এর পর ক্রমে এদেশে বৃটিশ উপনিবেশ গ'ড়ে ওঠে। সভ্য শ্বেতাঙ্গ জাতির সংস্পর্শে এসে মাওরিরা অনেকটা সভ্য জীবনে অভ্যস্ত হয়েছে।

জীবন-যাত্রা

নিউজিল্যাণ্ড বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্রের দেশ। কাজেই পশুপালনই এখানকার লোকেদের অর্থোপার্জনের প্রধান উপায়। গৃহপালিত পশু—মেষ ও গরু—লোকেদের প্রধান সম্পদ। দেশের রপ্তানি দ্রব্যের শতকরা ৯০ ভাগ পালিত পশু থেকেই আসে।

সকল দেশেই ভূমি হ'ল প্রকৃত সম্পদের মূল। নিউজিল্যাণ্ডের জমি উর্বর। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এর উর্বরতা আরো বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তৃণ অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবে যে শক্ত ধরনের ঘাস জন্মাত, তার পরিবর্তে কোমল এবং গো-মেষের পক্ষে অধিকতর উপাদেয় ও স্বাস্থ্যকর ঘাস চাষ ক'রে উৎপাদন করা হয়। এদেশের জলবায়ুর গুণে বারো মাসই মাঠে গো-মেষ চারণ সম্ভবপর হয়। প্রবল বৃষ্টিপাত বা প্রবল শীত না থাকায় এই সুবিধা হ'য়ে থাকে। পঞ্চাশ থেকে ষাট একর জমি নিয়ে এক-একটি পশুপালন ক্ষেত্র, প্রতি কৃষিক্ষেত্রে গরুর সংখ্যা গড়ে ৩০টি ক'রে। চাষী এবং তার পরিবারের লোকেরা এর তত্ত্বাবধান করে, এজন্য মানুষ খাটানো হয় না। বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রে দুধ দুইয়ে নেওয়া হয়। যন্ত্রের সাহায্যেই মাখন তৈরি করা হ'য়ে থাকে।

মেষপালনও একটি বড় ব্যবসায়। সাধারণতঃ তিনটি উদ্দেশ্যে মেষ পালিত হ'য়ে থাকে—পশম উৎপাদন, প্রজননের দ্বারা মেষের সংখ্যা-বৃদ্ধি এবং চামড়া ও মাংস রপ্তানি করার ব্যবসায়। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এ-সব কারবার পরিচালনা করা হয়। বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রের সাহায্যে পশম ছাঁটাই, মেশিনে মেষ হত্যা করা, চামড়া ট্যান করা এবং মাংস লবণসিক্ত ক'রে টিন-ভর্তি করা—সবই।

নিউজিল্যাণ্ড একটি ছোট দেশ হ'লেও দুগ্ধজাত দ্রব্য রপ্তানিতে—যেমন জমাট দুধ, গুঁড়া দুধ, মাখন, পনীর—পৃথিবীতে এর স্থান প্রথম; মাংস রপ্তানিতে দ্বিতীয় এবং পশম উৎপাদনে তৃতীয়। নিউজিল্যাণ্ডের মাখন ও মাংস ইউরোপের অনেক দেশে খাদ্যের প্রধান উপকরণরূপে স্থান পেয়ে আসছে।

মাওরি জাতি

মাওরিরা এখন নিউজিল্যাণ্ডের আদিবাসী ব'লে গণ্য হ'লেও তাদের পূর্বপুরুষ এদেশে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। মাওরিদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল এ তথ্য সন্ধান করতে গিয়ে পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন, অতি প্রাচীনকালে তারা ভারতের বাসিন্দা ছিল। ভারতবর্ষ থেকে মালয়ে, মালয় থেকে পলিনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে তারা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে। এরা ছিল সমুদ্রে নৌচালনায় পটু, উৎসাহী এবং সাহসী। ১৩৫০ সালের কাছাকাছি সময়ে মাওরিরা পলিনেশিয়া থেকে আটখানা ক্যানো বা নৌকাতে চ'ড়ে নিউজিল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করে। এর আগেই কতক দুঃসাহসী মাওরি অল্প সংখ্যায় বিশাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিউজিল্যাণ্ডে এসে পৌঁছেছিল। এদেশটির সৌন্দর্য ও আরামদায়ক জলবায়ুর কথা, এখানে যে বিস্তৃত সমভূমি আছে, এটি যে পাখীর রাজ্য, খাদ্য মেলে প্রচুর—এ-সব কথা মাওরিদের সাগর পার হ'য়ে আসতে উৎসাহিত করেছিল। মাওরিরা নূতন দেশে এসে নূতন পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নিউজিল্যাণ্ডে ইউরোপীয়দের উপনিবেশ সুরু হয়। এরা এসে নূতন পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ ও পশুপালন ব্যবসায় গ'ড়ে তোলে। এদের সংস্পর্শে এসে মাওরিরা শিক্ষায়, সামাজিক ব্যবস্থায়, দেশ-শাসন ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রগতি দেখিয়েছে। বৃটিশদের প্রভাব এদের জীবনে অনেক সুফল এনেছে বলা যায়।

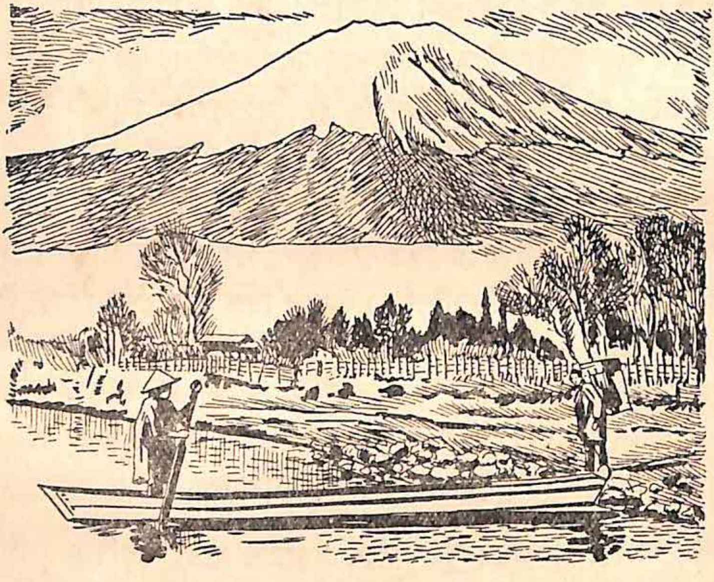
প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

নিউজিল্যাণ্ডকে বলা যায় আগুন-জলের দেশ। কতকগুলি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি যেমন আছে, তেমনি আছে গরম জলের 'আগ্নেয়গিরি' অর্থাৎ উষ্ণ প্রস্রবণ। পাকাকুরা প্রস্রবণটি বিশাল এবং বিস্ময়কর। নিয়মিত সময় পর পর উষ্ণ জল ফোয়ারার মত উৎসারিত হ'য়ে ওঠে আর সেই সঙ্গে মাটির নীচে শোনা যায় মেঘের গর্জনের মত প্রচণ্ড শব্দ। উত্তর দ্বীপে কতকগুলি গরম জলের হ্রদ আছে, তার কোনটি ব্যবহৃত হয় সর্বসাধারণের কাপড়-চোপড় কাচার জন্য, কোনটি রান্নার জন্য! জলের উষ্ণতায় কম-বেশী আছে। কোন কোনটি রীতিমত গরম জলের কূয়ার মত, জল টগবগ ক'রে ফোটে। চাল, গম কাপড়ে বেঁধে জলের মধ্যে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখলেই বিনা উনানে সিদ্ধ হ'য়ে গেল! প্রকৃতির চিরজ্বলন্ত উনান যেন!

সূর্যোদয়ের দেশ জাপান

এশিয়া মহাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত জাপান দেশ। আয়তনে দেশটি বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রায় সমান। জাপান দেশটি প্রায় ১৫০০ দ্বীপ নিয়ে। প্রধান দ্বীপ তিনটি—হন্‌সিউ, শিকোকু ও হোকাইডো। সমগ্র দেশ পাহাড়ময়, আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ খুবই কম। পাহাড়গুলি প্রায়ই খাড়া; পাহাড়ের গায়ে আছে মাৎসু নামে ফারগাছ ও চিরসবুজ মোচাকৃতি গাছের বন। বারো মাস প্রচুর জল প্রবাহিত থাকে এমন নদীর সংখ্যা খুব কম। বেশীর ভাগ ছোট পাহাড়ী নদী; বর্ষার দিনে খরস্রোতা, শুক্‌নার সময় স্বল্পতোয়া বা একেবারেই শুষ্ক। বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চল বিরল, যে দিকেই তাকানো যায় পাহাড় চোখে পড়বেই। জাপানের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ ফুজি

১২,৩৬৫ ফুট উঁচু। এটি একটি আগ্নেয়গিরির সুদর্শন চূড়া, উপরের দিকটা তুষারে ঢাকা। আগ্নেয়গিরিটি এখনও অল্পমাত্রায় জীবন্ত, জ্বালামুখ দিয়ে ধূম নির্গত হ'তে দেখা যায়। ফুজি পর্বত দেখতে যেমন সুশ্রী, জাপানীদের কাছে তেমনি এটি পবিত্র ব'লে গণ্য হ'য়ে থাকে।



ফুজিয়ামা আগ্নেয়গিরি

জাপানী কাব্যে, শিল্পে ও সজ্জায় ফুজিয়ামা পর্বত আদরের স্থান অধিকার ক'রে আছে।

জলবায়ু

সারা দেশে জলবায়ু একই রকম নয়—উত্তরের দ্বীপে শীতকাল দীর্ঘ; শীত ঋতুতে ভূভাগ তুষারে আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়। দক্ষিণের কিউস্যু দ্বীপে গ্রীষ্মকালে রীতিমত উষ্ণ জলবায়ু কিন্তু শীতকালে এর ওপর দিয়ে শীতল বাতাস প্রবাহিত হয়। সর্বত্রই শীত ও গ্রীষ্মের শীতাতপের তারতম্য অনেকখানি।

গ্রীষ্মকালে প্রশান্ত মহাসাগরের দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হ'য়ে দেশের মধ্যে মেঘ নিয়ে আসে। দক্ষিণ এবং পূর্ব অঞ্চলে গ্রীষ্মে বৃষ্টিপাত প্রচুর। দেশের মধ্যভাগ দিয়ে মেরুদণ্ডের মত উচ্চ পর্বতশ্রেণী অবস্থিত হ'লে এতে বাধা পেয়ে মেঘ পূর্বভাগেই বেশী বর্ষণ করে, পশ্চিম ভাগে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। শীতকালে এশিয়ার তুষার অঞ্চল থেকে উত্তর-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বইতে থাকে। জাপান সাগর অতিক্রম ক'রে আসার সময় এই শীতল বাতাস আর্দ্রতা সংগ্রহ ক'রে আনে। জাপানের পশ্চিম অংশে তা বৃষ্টি বা তুষাররূপে পড়ে। এ অঞ্চল শীতকালে তাই বরফে আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়।

আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্প

জাপানের ভূমি-প্রকৃতি পাহাড়-পর্বতময়। সমগ্র অঞ্চলের এক-পঞ্চম অংশেরও কম স্থান নিম্নভূমি। এই সামান্য পরিমাণ নিম্নভূমিই জাপানীদের বাসভূমি ও কর্মভূমি। এই সকল দ্বীপ এক সময়ে এশিয়া মহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, সে লক্ষ লক্ষ বছর আগের কথা। কালে ভূস্তর পরিবর্তনের ফলে কতক স্থান সাগরের নীচে তলিয়ে যায় এবং সৃষ্টি হয় জাপানের দ্বীপপুঞ্জের। প্রকৃতপক্ষে জাপানের বর্তমান ভূ-ভাগ সাগরে-ডোবা পাহাড়-পর্বতের অবশিষ্ট অংশ যা জলের ওপর মাথা জাগিয়ে রয়েছে।

ভূ-পৃষ্ঠ উঁচুনীচু হ'য়ে অসংখ্য পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি হওয়ায় এই অঞ্চলে প্রায়ই সমুদ্রের তলদেশে এবং কখন কখনও স্থলভাগে ভূস্তরের সঞ্চালন ঘটে। তার ফলে সমুদ্রের জলের নীচে কোন স্থান অকস্মাৎ নীচে নেমে যায়, আবার কোন স্থান উঁচু হ'য়ে ওঠে। এইরূপ আকস্মিক আলোড়নের ফলে সমুদ্রে ঘটে জলোচ্ছ্বাস, উঁচু ঢেউ শত শত মাইল দূর থেকে ছুটে এসে উপকূলে আছাড় খেয়ে পড়ে, লোকজন, বাড়ী-ঘর ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এমনি জলোচ্ছ্বাসকে বলে টাইফুন। জাপানে

বারো মাস ভূমিকম্প লেগেই আছে, বছরে গড়ে প্রায় ১৫০০ বার। সবগুলি প্রবল না হ'লেও মাঝে মাঝে ভূমিকম্পের বেগ হয় প্রচণ্ড এবং লোকের বাড়ী-ঘরের ক্ষতি ও জীবননাশ ঘটে। বর্তমানে জাপানে ১৮টি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি এবং এমন পাহাড় অনেক আছে যেগুলি পূর্বে ছিল জীবন্ত অগ্নিগিরি—এখন অগ্নিবিহীন, মৃত।

বাড়ী-ঘর

ঘন ঘন ভূমিকম্প হয় ব'লে জাপানীরা ইট-পাথর দিয়ে শক্ত ও ভারী বাসগৃহ তৈরি করে না। বৃষ্টির জল নিবারণের জন্য ছাদ করা হয় খুব মজবুত। ঘরের অন্যান্য অংশ তৈরি করা হয় বাঁশ দিয়ে। জাপানে বাঁশ জন্মে প্রচুর। বাঁশের সুবিধা এই যে, ইহা হাল্‌কা এবং সস্তা। নষ্ট হ'য়ে গেলে অতি সহজেই পুরানো জিনিস পালটিয়ে দেওয়া চলে।

খাদ্যবস্তু

ভাত জাপানীদের প্রধান খাদ্য। জাপানের নিম্নভূমি অঞ্চলে প্রচুর ধানের চাষ হয়। উপকূলের সমুদ্রে আছে অজস্র মাছ। জাপানী জেলেরা মাছ ধরায় ওস্তাদ। জাপানের অধিবাসীদের খাদ্যের উপকরণ হ'ল মাছ।

কৃষি

জাপানে সমগ্র ভূমির প্রায় ৮০ ভাগ পাহাড়ময়, কৃষির অযোগ্য। সামান্য পরিমাণ জমিতে চাষ-আবাদ করা চলে। তবু জাপানীরা তাদের দেশের প্রায় সাড়ে সাত কোটি লোকের খাদ্য নিজ দেশেই উৎপন্ন করে। একটানা অনেকখানি সমতলভূমি ধান-চাষের জন্য মেলে না, ছোট ছোট ক্ষেতে চাষ করতে হয়। তাই কলের লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ এখানে সম্ভবপর হয় না। চাষীরা বলদ দিয়ে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে জমি চাষ করে। জাপানের প্রায় অর্ধেক লোক চাষ-আবাদের কাজে নিযুক্ত রয়েছে। আবাদী

জমির অর্ধেকের বেশীতে ধান চাষ করা হয়। প্রাচীনকাল থেকেই জাপানকে বলা হয় 'ধান্যসমৃদ্ধ দেশ'। হন্‌সিউ এবং দক্ষিণের দ্বীপ-গুলিতে উষ্ণ জলবায়ু এবং প্রচুর বারিবর্ষণের জন্য এ অঞ্চল হয়েছে ধান-চাষের পক্ষে খুবই উপযোগী। জাপানী চাষীরা কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী, নিপুণ এবং উৎসাহী। সরল এবং সাধারণ রকমের চাষের যন্ত্রপাতি ব্যবহার ক'রে নিজেদের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের গুণে জাপানী চাষীরা জমিতে প্রচুর ধান উৎপাদন করে। চাষের সঙ্গে রেশম-কীট পালন এবং রেশম সূতা তৈরির কাজ ক'রে চাষীরা অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন ক'রে থাকে।

রেশম-শিল্প

জাপানে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী কাঁচা রেশম উৎপাদন করা হয়। এই রেশমই জাপানের সর্বপ্রধান এবং মূল্যবান লাভজনক রপ্তানি দ্রব্য। স্বভাবতঃই মনে হবে যে, অনেক অধিবাসী কাঁচা রেশম উৎপাদন ক'রেই জীবিকা অর্জন করে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রেশম-কীট পালন ও রেশম উৎপাদন কুটীর-শিল্প হিসাবে পরিবারের একটি অতিরিক্ত আয়ের উপায় ব'লে গৃহীত হ'য়ে থাকে। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা সকলেই নিজেদের চাষ-আবাদের বা অন্য কাজ ছাড়াও রেশম-শিল্পের কাজ করে।

রেশম-কীট নামক এক প্রকার শুঁয়াপোকা থেকে আসল রেশম পাওয়া যায়। এই কীট মূলবেরি গাছের পাতা খেয়ে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। জাপানের উষ্ণ জলবায়ু মূলবেরি গাছের বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল। এখানে অনেক জেলাতে প্রায় প্রতি গৃহেই রেশম-কীট প্রতিপালিত হয়। একটি নির্দিষ্ট ঘরে পর পর কয়েকটি চওড়া তাক্ সাজিয়ে নেওয়া হয়। রেশম মথ ডিম পাড়লে তা ডালাতে ক'রে তাকের ওপর রেখে ঘরে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় বছরখানেক

পরে ক্ষুদে ডিমগুলি ফুটে ছোট ছোট রেশম-কীট বের হয়। প্রথমে এদের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির এক-দশমাংশেরও কম। এগুলিকে তখন মূলবেরি পাতা খেতে দেওয়া হয়। কীটগুলি খায় খুব বেশী পরিমাণ এবং বাড়ে এত তাড়াতাড়ি যে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এদের খোলস ছাড়তে হয়। মাসখানেকের মধ্যেই কীটগুলি পূর্ণবয়স্ক হ'য়ে পড়ে, তখন লম্বা হয় প্রায় তিন ইঞ্চি। এই সময় কীটগুলি মুখ থেকে লালা বের ক'রে তা দিয়ে নিজের চারদিকে জড়াতে জড়াতে গুটি বানিয়ে ফেলে; গুটির মধ্যে থাকে রেশম-কীট। গুটিগুলি পূর্ণ আকারের হ'লে তা গরম জলে সিদ্ধ ক'রে নিতে হয় নতুবা ভিতরের কীট রেশম মথে রূপান্তরিত হ'য়ে গুটি কেটে বেরিয়ে আসে। কাটা গুটি থেকে রেশম সূতা তৈরি করা যায় না। সাধারণ চাষীরা রেশম-গুটিগুলি রেশম-ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রি করে। এই গুটির পাক খুলে পাওয়া যায় রেশমী সূতা। বেশীর ভাগ কাঁচা রেশম বিদেশে, বিশেষ ক'রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়।

রেশমের পরেই জাপানের মূল্যবান রপ্তানি দ্রব্য হ'ল সূতিবস্ত্র। ইংলণ্ডের মত জাপানকেও যাবতীয় কার্পাস বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। বেশীর ভাগ আসে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। বড় বড় কারখানায় আধুনিকতম যন্ত্রের সাহায্যে এই কার্পাস থেকে নানাবিধ পরিধেয় দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। জাপানীদের ব্যবহৃত পরিচ্ছদ অধিকাংশই সূতির, কাজেই স্বদেশেই সূতিবস্ত্রের বেশ চাহিদা। জাপানে কার্পাসবস্ত্র এত বেশী পরিমাণে তৈরি হয় যে, নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে বিদেশে বিক্রির জন্য রপ্তানি করা হয়। চীন, ভারত, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মিশর প্রভৃতি দেশ এই সূতিবস্ত্রের খরিদ্দার।

জাপানের অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের মধ্যে আছে কাচের জিনিস, চীনামাটির জিনিসপত্র, কাগজ, খেলনা, কাঠের দ্রব্য প্রভৃতি। এগুলি বিদেশে

রপ্তানি করা হয় এবং কুটীর-শিল্পে ব্যাপকভাবে তৈরি করা হয় ব'লে খরচ কম পড়ে। জাপানী জিনিস বিদেশের বাজারে সস্তায় বিক্রি হয়, এজন্য চাহিদাও বেশী।

জাপানীরা নিজ দেশের প্রয়োজনীয় পশমবস্ত্র স্বদেশেই প্রস্তুত করে। জাপানে মেষপালনের উপযুক্ত ক্ষেত্র নাই। তাই অস্ট্রেলিয়া থেকে পশম আমদানি করা হয়।

জাপানী জাতি

গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জাপান পৃথিবীর একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সামরিক শক্তি—সকল দিকেই জাপানীদের উন্নতি হয়েছিল চমকপ্রদ। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান জার্মানি ও ইতালির পক্ষে যোগদান করে। বিশ্বে প্রথম আণবিক বোমা দুটি জাপানী শহরে—নাগাসাকি ও হিরোশিমাতে নিক্ষেপ ক'রে মার্কিনরা লোকজনসহ শহর দুটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। এর পরই জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

জাতি হিসাবে জাপানীরা কর্মঠ, বুদ্ধিমান, শিষ্টাচারী। যে-কোন কাজই হোক তা নিখুঁত সুন্দরভাবে করা তাদের জাতীয় স্বভাব। নূতন জিনিস শেখার আগ্রহ তাদের খুব বেশী। যন্ত্রপাতি তৈরি করতে তাদের বিশেষ দক্ষতা দেখা যায়। যে-কোন রকম যন্ত্রই হোক তা নিখুঁতভাবে অনুকরণ ক'রে সস্তায় উৎপাদন করতে জাপানীরা পটু।

জাপানীদের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা পরিচ্ছন্ন রুচিসম্মত জীবন যাপন করতে ভালবাসে। নিজেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে এবং নিজেদের বাসগৃহ ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে। জাপানীরা ফুল খুব ভালবাসে। চেরি ও চন্দ্রমল্লিকা এদের কাছে অতি প্রিয় ফুল। বসন্তে যখন রাশি রাশি ফুলে গাছ ছেয়ে যায় জাপানী স্ত্রী-পুরুষ,



জাপানী উৎসবের একটি দৃশ্য

বালক-বালিকা দলে দলে পার্কে, উদ্যানে ফুলের সৌন্দর্য দেখতে ঘুরে বেড়ায়। এদের কাছে চেরিফুল সকল ফুলের সেরা।

রাজধানী টোকিও

টোকিও পৃথিবীর তৃতীয় শহর—প্রথম লণ্ডন, দ্বিতীয় নিউ ইয়র্ক। পাহাড়ময় দেশে টোকিও অনেকটা সমতল অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত, যেন একখানি সুশ্রী বিচিত্র রঙে রঞ্জিত প্রসারিত পাখা। বন্দরে বড় বড় জাহাজের ভিড়, পরিচ্ছন্ন রাজপথে নানা সজ্জায় সজ্জিত অগণিত নরনারীর চলাচল। অট্টালিকা, পথের দু'পাশে সযত্ন-রক্ষিত বৃক্ষরাজি, ফুলে-ভরা বাগান ও পার্ক—সব মিলে ছবির মত। পাহাড়ের গায়ে সুদৃশ্য পাইন গাছের বন। দূরে ফুজি পর্বতের শুভ্র চূড়া—পর্বতের নিম্ন অংশ নীল, শীর্ষদেশ হীরার মত দীপ্তিমান। দৃশ্য নয়নলোভন। জাপানী কবি ফুজির মনোহারী শোভা বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন—

প্রথম দৃষ্টিতে মুগ্ধ হ'য়ে আপনি আপনার প্রদেশ দান করবেন ;
দ্বিতীয়বার দর্শনে আপনার রাজ্য দান করতে ইচ্ছা হবে ॥

আফগানিস্থান

কাশ্মীরের উত্তরে পামীর উচ্চভূমি। তাকে বলা হয় 'পৃথিবীর ছাদ'। সেখান থেকে কতকগুলি পর্বতমালা জটাগ্রন্থির মত কয়েক দিকে প্রসারিত হয়েছে—কারাকোরাম, আলতাই, তিয়েনসিন প্রভৃতি। এমনিভাবে হিন্দুকুশ পর্বতমালা দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত হ'য়ে ধনুকের মত বেঁকে এশিয়া মাইনরের দিকে চলে গেছে। হিন্দুকুশ ও তার শাখা-প্রশাখা আফগানিস্থানকে করেছে অসমতল, পাহাড়-পর্বতময়। টেবিলের ওপর কাপড় বিছিয়ে দিয়ে দু'হাত দিয়ে দু'দিক থেকে চাপ দিয়ে সরিয়ে দিলে যেমন কুঁচকে ভাঁজ হ'য়ে যায়, আফগানিস্থানের ভূমি-প্রকৃতি কতকটা তেমনি ; উঁচুনীচু, ঢেউ-খেলানো।

উত্তরে হিন্দুকুশ, দক্ষিণ-পূর্বে ও দক্ষিণে পাকিস্তান, পশ্চিমে ইরাণ। উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে সবচেয়ে চওড়া অংশ ৭ শত মাইল দীর্ঘ। পশ্চিমে হিরাট থেকে পূর্বে খাইবার গিরিপথ প্রায় ৬ শত মাইল। লোকসংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৩০ লক্ষ।

দক্ষিণ অংশে পাষাণময় মরু অঞ্চল। সেখান থেকে ভূমি ক্রমশঃ উঁচু হ'য়ে এসে উত্তরে হিন্দুকুশ পর্বতে মিশেছে। উত্তরের পর্বতশ্রেণী বিশাল প্রাচীরের মত। তা পার হ'য়ে উত্তর দিকে যাওয়া সম্ভবপর নয়। কতক পর্বত-চূড়া খাড়া, বর্শাফলকের মত, প্রায় চব্বিশ হাজার ফুট উঁচু। গিরিপথ যা আছে তা-ও উনিশ হাজার ফুটের নীচে নয়, সর্বদা বরফে আচ্ছন্ন; তাতে রয়েছে হিমবাহ। জলবায়ু বিচিত্র রকমের। বিভিন্ন ঋতুতে শীত-গ্রীষ্মের তারতম্য তো হয়ই; তাছাড়া দিন ও রাত্রির মধ্যেও উষ্ণতার পার্থক্য অনেকখানি। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা কখন কখনও ১০০ ডিগ্রী ওঠে, কাজেই বেশ উষ্ণ। কিন্তু শীতকালে তেমনি তীব্র শীত। উত্তরের পাহাড় দিক থেকে নিদারুণ কন্‌কনে হাওয়া উপত্যকার ওপর দিয়ে প্রবল বেগে গর্জন ক'রে বইতে থাকে। নদী ও ঝরণা বরফের স্তর হ'য়ে যায়, ঘরের জলও শক্ত ইটের মত হ'য়ে যায়। তাপমাত্রা নেমে যায় শূন্য ডিগ্রীরও নীচে।

নদ-নদী

আফগানিস্থান নদ-নদীর দেশ নয়; শ্যামল সমতল শস্যক্ষেত্রের দেশও নয়। এর নদীগুলি উপত্যকার ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে প্রবাহিত। প্রধান নদী হেল্‌মান্দ্; তার শাখানদী হ'ল আর্ঘানদার, হরিরুদ্, মুর্ঘাব, অক্ষু বা আমু। আফগানিস্থানের কোন নদীই নৌচলাচলের যোগ্য নয়।

চাষ-আবাদ

আফগানিস্থান সুজলা দেশ না হ'লেও এর উচ্চভূমি ও উপত্যকা অঞ্চল খুব উর্বর। জলসেচের ব্যবস্থা ক'রে আফগান চাষী বিভিন্ন রকমের

ফসল ফলায়। বছরে দু'বার শস্য ফলে—বসন্তকালে গম, যব, ভুট্টা ; হেমন্তকালে ধান, জোয়ার, তামাক, ভেরেণ্ডা। আফগানিস্থানের ফল প্রসিদ্ধ। বসন্ত ঋতুতে দেখা যায় ফুলের শোভা ; ফলের বাগানগুলি মুকুলে ভ'রে যায়। আঙুর, বেদানা, আম, ন্যাসপাতি, আখরোট, ডুমুর। মেওয়ারই রাজ্য। অনেক লোকের পক্ষে এই বিবিধ ফলই সারা বছরের প্রধান খাদ্য। কিসমিস, বেদানা, পেস্তা, আখরোট প্রভৃতি ফল বিদেশে রপ্তানি হয় প্রচুর পরিমাণে।

ছাগল ও ভেড়া আফগান চাষীদের মূল্যবান সম্পদ। দুম্বা আফগানিস্থানের বিশিষ্ট গৃহপালিত জীব। দুম্বা একজাতীয় ভেড়া, এর লেজে চর্বি জমতে জমতে অনেক বড় হ'য়ে পড়ে। ছাগল, ভেড়া, দুম্বার মাংস অধিবাসীদের খাদ্য ; দুম্বার লেজের চর্বি মাখনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। ছাগল-ভেড়ার চামড়া ও পশম পোষাক তৈরির কাজে লাগে। আফগানিস্থানে বহু সংখ্যায় ঘোড়া পালিত হয়। উৎকৃষ্ট ধরনের ঘোড়া বিদেশে বিক্রি ক'রে আফগানরা অর্থোপার্জন ক'রে থাকে।

খনিজ দ্রব্য

আফগানিস্থানে মূল্যবান খনিজ দ্রব্যের পরিমাণ কম নয়। সোনা, রূপা, তামা, লোহা, কয়লা, সীসা, গন্ধক আছে প্রচুর পরিমাণে ; কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খনিজ পদার্থ আহরণের ব্যবস্থা এখনও হয়নি। হিরাটের কাছে পেট্রোলিয়ম পাওয়া গেছে এবং পাঞ্জশের উপত্যকায় রূপার খনির কাজ চলেছে। পাষাণময় দেশে মাটির নীচে যে মূল্যবান পদার্থ সঞ্চিত রয়েছে তা উদ্ধার করার ব্যবস্থা করলে আফগানিস্থান যে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বন-সম্পদ

আফগানিস্থানে বন-সম্পদও প্রচুর। ছয় হাজার থেকে দশ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের গায়ে বড় বড় গাছের বন। ঘন, সতেজ, সুশ্রী।

পাইন, ওয়ালনাট্, হেজেল, ইউকাঠের গাছ। অধিবাসীদের মতই গাছ দীর্ঘ, সতেজ, শক্তিশালী। পশ্চিমের শুষ্ক মালভূমি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে বাবলাজাতীয় গাছ। এর আঠা থেকে তৈরি হয় ধূপ। ভারতে এই ধূপ যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানি করা হয়।

আফগান জাতি

আফগানিস্থানের অধিবাসীরা সবাই একই জাতি থেকে উদ্ভূত নয়। সবাই নিজেদের আফগান ব'লেও পরিচয় দেয় না। কতক উপজাতির ভাষা পারসী, কতকের পুস্তু। আফগানিস্থানের একটি প্রধান উপজাতি হ'ল তুরাণী, এদের আদিবাস ছিল পারস্যে। এছাড়া আছে ঘিলজাই, তাজিক, উজ্‌বেক, আইমাক, কাফির প্রভৃতি। ঘিলজাইরা তরবারি-চালনায় খুব পটু। কাফিররা হ'ল সেই আফগানদের বংশধর যারা গ্রীকবীর আলেক-জাণ্ডারকে ভারত অভিযানের সময় সহায়তা করেছিল। এখন কাফিররাই কেবল পূর্বপুরুষের উপাসক; অন্য সবাই মুসলমান।

আফগানরা বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায়। টিকালো এদের নাক, চুল কালো ও দীর্ঘ। কথায় বলে—আফগানকে জীবনে তুইবার স্নান করানো হয়। জন্মের ঠিক পরেই একবার; কবর দেবার ঠিক আগে আর একবার।

আফগানদের জাতীয় পোষাক হ'ল ঢিলা পায়জামা, সার্ট; তার ওপর গায়ে-আঁটা ওয়েস্ট কোট, তাতে প্রায়ই নক্সা-কাটা। সর্বোপরি দীর্ঘ বড় আলখাল্লা। মাথায় পরে কুল্লা অর্থাৎ মাথার চাঁদি-ঢাকা টুপি, তার ওপর জড়ায় বড় পাগড়ি। পাগড়ির এক প্রান্ত পিঠের ওপর ঝুলে পড়ে। গরীব লোকেরা খালি পায়েই থাকে; কখনও বা ঘাসের তৈরি স্যাণ্ডেল পরে। অবস্থাপন্ন লোকেরা পরে কারুকার্য-করা চামড়ার জুতা ও চটি।

কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও গজনী প্রভৃতি আফগানিস্থানের প্রধান শহর। পল্লীতে লোকেরা সুরক্ষিত গ্রামে বাস করে। প্রতি গ্রামেই

আছে একজন ক'রে খান অর্থাৎ সর্দার। এর বাড়ীতে এক কোণে থাকে উঁচু দুর্গের মত স্থান। বিপদের সময় অর্থাৎ শত্রু আক্রমণ করলে লোকজন এসে সর্দারের দুর্গে আশ্রয় নিতে পারে। সাধারণ বাড়ী-ঘর ইট ও মাটি দিয়ে তৈরি, ছাদ সমতল। গ্রীষ্মকালে বাসিন্দারা ছাদে ঘুমায়। ঘরের জানালায় কাচ নাই; দরজা-জানালা মোটা কাঠ দিয়ে তৈরি। রান্নাঘর প্রধান ঘরের পিছনে ছোট দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, পৃথক করা। সাধারণ আসবাব-পত্র হ'ল—দড়ির খাটিয়া, গম পেষার জন্য হামানদিস্তা, মাটির উনান, মাংস রান্না করার একটি পাত্র আর রুটি সেঁকার জন্য লোহার একটি পাত।

আফগানরা সন্তানের খুব আদর করে। এদের কাছে মেয়ের চেয়ে ছেলের আদরই বেশী, কারণ শত্রুর হাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করতে এবং অপরকে আক্রমণ, লুঠপাট করতে বলিষ্ঠ পুত্র হয় পিতার সাহায্যকারী।

আফগানরা দুর্ধর্ষ ও যুদ্ধপ্রিয়। প্রতিটি গ্রাম এক-একটি দুর্গ। এক উপজাতির লোকের সঙ্গে অন্য দলের বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই আছে। সুযোগ পেলেই একদল অন্য দলের গ্রাম আক্রমণ ক'রে ছাগল, ভেড়া ও অন্যান্য সম্পত্তি লুঠপাট ক'রে নিয়ে যায়। প্রতিটি আফগানকে তাই সর্বদা প্রাণ নেবার এবং প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। দেশে মাঝে মাঝে পাহাড়ের ওপর দেখা যায় পাথরের তৈরি ছোট ছোট কেল্লা আর পর্যবেক্ষণ স্তম্ভ—পাহাড়ের ওপর তৈরি উঁচু ঘরের মত; তার মধ্যে থেকে গ্রামের চারপাশে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। শত্রুকে আসতে দেখলে গ্রামবাসীকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়।

আফগানিস্থানে রেলপথ নাই। উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে উট ও ঘোড়ার পিঠে মাল বোঝাই ক'রে নিয়ে বণিকের দল বিভিন্ন শহরে যাতায়াত করে। পথে আছে দস্যু-তস্করের ভয়। পাহাড়ের মধ্যে

ডাকাতদল লুকিয়ে থেকে বণিকের সর্বস্ব কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। বণিকরা তাই দলবদ্ধ হ'য়ে, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করে।

দেশে শিক্ষার প্রসার বিশেষ নাই। প্রাথমিক শিক্ষা এদেশে আবশ্যিক এবং কাবুলে কলেজও স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু গ্রাম অঞ্চলের বেশীর ভাগ লোকের বিদ্যা গ্রামের মোল্লার কাছেই সম্পন্ন হ'য়ে থাকে ; পাঠ্য-বিষয় হ'ল কোরানের কিছু অংশ, ইসলাম ধর্মের নিয়ম-কানুন শিক্ষা।

উপজাতীয় এলাকা

আফগানিস্থানে রাজার শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে কিন্তু সর্বত্র নয়। উপজাতির লোকেরা কোন আইন-কানুন মানতে চায় না। পাহাড়ময় দেশে যেখানে যাতায়াতের সহজ উপায় নাই সেখানে সকল উপজাতির লোককে একই আইন-শৃঙ্খলায় বদ্ধ রাখা সম্ভবপর নয়। দেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত বরাবর প্রায় ত্রিশ মাইল বিস্তৃত স্থান জুড়ে বাস করে দুর্ধর্ষ, স্বাধীন উপজাতির লোকেরা। সুযোগ পেলেই তারা হানা দিয়ে সম্পত্তি লুঠ ক'রে নিয়ে যায়। তারা যেমন নির্মম ও সাহসী, তেমনি বন্দুক-চালনায় পটু। এরা নিজ নিজ জির্গা বা দলের নায়কের নির্দেশ মেনে চলে, কোন রাজশক্তির অধীন তারা নয়।

আফগানরা অত্যন্ত গোঁড়া। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শকে এরা খুব সুনজরে দেখে না ; সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন বিরাট পরিবর্তনের পক্ষপাতীও এরা নয়। রাজা আমানুল্লা এক সময়ে দেশে নূতন আচার-ব্যবহার প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল মেয়েদের পর্দাপ্রথা লোপ করবেন, ইউরোপীয় ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থা, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রবর্তন করবেন কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জেগে ওঠে এবং তাঁকে সিংহাসন ছেড়ে যেতে হয়।

ইরাণ

ইরাণ। পুরানো নাম পারস্য। পারস্য মধ্য-প্রাচ্যের একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দেশ। পূর্বে আফগানিস্থান ও পাকিস্তান; পশ্চিমে ইরাক; উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর ও রাশিয়া এবং দক্ষিণে পারস্যোপসাগর ও আরব সাগর। সমগ্র দেশটাই একটা বিরাট মালভূমি—ছুই হাজার থেকে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু। বৃষ্টিপাত প্রায় নাই বললেই হয়। জলবায়ু চরমভাবাপন্ন, অর্থাৎ শীতকালে বরফ পড়ে, গ্রাষ্মকালে রীতিমত গরম বিশেষ ক'রে দক্ষিণে পারস্যোপসাগরের নিকটবর্তী অঞ্চলে। গ্রীষ্মের উষ্ণতা আর্দ্র নয়, শুষ্ক। কাজেই জলবায়ু বেশ আরামদায়ক; তবে এই সময় যে ঝড় বয় তা ভয়ংকর রকমের।

পারস্যের আয়তন ফরাসীদেশের প্রায় তিনগুণ কিন্তু লোকসংখ্যা মাত্র দেড় কোটি। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম ব'লে কেবল উত্তরের কাস্পিয়ান সাগরের কাছাকাছি প্রদেশ ছাড়া অন্য সর্বত্র জলাভাব খুব বেশী। অনেক অঞ্চল জলের অভাবের জন্য লোক-বসতিশূন্য। দেশটিকে বলা যায় মরুভূমি—যেখানে জল পাওয়া যায় সেখানে গ'ড়ে উঠেছে শহর ও গ্রাম।

কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ দিক দিয়ে এলবুর্জ পর্বত প্রসারিত রয়েছে। এর শৃঙ্গ ডেমাভেণ্ড (১৯,৪০০ ফুট) বরফের মুকুট প'রে সূর্যকিরণে ঝিক্‌মিক্ করে। অন্যান্য ছোট পাহাড়-পর্বত দেশের দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে বিস্তৃত। পারস্যের রাজধানী তেহরাণ ও অন্যান্য বড় শহর যেমন মেশেদ, তাব্রিজ প্রভৃতি উত্তর দিকে এলবুর্জ পর্বতের কাছাকাছি অবস্থিত। কি পরিমাণ জল পাওয়া যায় তারই ওপর নির্ভর করে শহর কত বড় হবে, কত লোক সেখানে বসবাস করতে পারবে। দেশে সামান্য কয়েকটি মাত্র নদী; বৃষ্টিও এক রকম নাই। তাই

লোককে পাহাড়ে জমাট বরফের ওপর নির্ভর করতে হয় জলের জন্য। বসন্তকালে বরফ গললে সেচখালগুলি জলে পূর্ণ হয়। তখন জল দেখে অধিবাসীরা আনন্দে উল্লসিত হয়। জল তাদের জীবন। শস্য বাঁচাবে, প্রাণ শীতল করবে।

পারস্যের মধ্যভাগে রয়েছে বিরাট মরুভূমি। শুষ্ক ; বৃষ্টিহীন, ফলহীন। যদি কোথাও সামান্য পরিমাণ জল মেলে তা যেন তিত বিষ ; বিস্বাদ, পানের অযোগ্য। এই মরুভূমি হয়েছে দস্যু-তস্কর ও বিদ্রোহীদের আশ্রয়স্থল। ডাকাতরা বণিকের বাণিজ্য-সম্ভার লুঠপাট ক'রে দিগন্ত-বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে আশ্রয় নেয়। এদের দমন করা সরকারের পক্ষে দুঃসাধ্য।

নদী

দেশের প্রায় চারদিকেই পাহাড়, মাঝে উঁচু মালভূমি। বৃষ্টিপাত খুবই কম। তাই পূর্বে সিন্ধুনদ থেকে পশ্চিমে শাত-এল-আরব পর্যন্ত কয়েক শত মাইলব্যাপী উপকূলে একটিও উল্লেখযোগ্য নদী নাই। সমগ্র পারস্যদেশে শাত-এল-আরবের শাখানদী কারুণ একমাত্র নৌবাহনযোগ্য নদী। ইরাণ এক নদীর দেশ।

চাষ-আবাদ

মাটি থেকে ফসল ফলাতে হ'লে ভূমিকে সিক্ত করতে হবে, গাছকে তৃপ্ত করতে হবে। জল না হ'লে কোন কিছুই সম্ভবপর নয়। ইরাণে যেখানে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানেই ফসল উৎপাদন করা হ'য়ে থাকে। গম ও যব, তুলা, আল্‌ফাল্‌ফা ঘাস, আফিং, তামাক প্রধান ফসল। উত্তরের কাস্পিয়ান সাগরের কাছাকাছি প্রদেশে ধান জন্মে। এদেশের বিবিধ ফল বিখ্যাত। আপেল, ন্যাসপাতি, কুল, আখরোট, ডুমুর, বেদানা প্রচুর ফলে। দক্ষিণ অংশের উষ্ণ অঞ্চলে উৎপন্ন হয় খেজুর ও কমলালেবু। পারস্যের আঙুর ও তরমুজ সুস্বাদের জন্য

পৃথিবীতে নাম-করা। এ ছাড়া আছে নানারকম সুন্দর ফুল; তার মধ্যে নার্সিসাস্, টিউলিপ, পারস্যের গোলাপ বিশ্বে সুপরিচিত।

শিল্প

বহুকাল থেকে পারস্য তার গালিচা ও কম্বলের জন্য বিখ্যাত। এগুলি কুটীর-শিল্পের কাজ। সুন্দর বিচিত্র রকমের নক্সা ও কারুকার্য এর বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া রেশম ও কার্পাসবস্ত্র, মাটির পাত্র ও চামড়ার বিবিধ জিনিসও লোকে বাড়ীতে ব'সে হাতে তৈরি করে। পিতল-কাঁসার বাসন-কোসন তৈরিও একটি প্রচলিত কুটীর-শিল্প। অধিকাংশ লোক তামা-পিতল-কাঁসার বাসন ব্যবহার করে; কারণ এগুলিতে মরিচা পড়ে না, সহজেই ঝক্‌ঝকে রাখা যায়। ব্যবহৃত বাসনে ও মাটির পাত্রে সুন্দর কারুকার্য ইরাণী শিল্পীদের নিপুণতার পরিচয় দেয়। মৃৎপাত্রে রঙ করা, গালিচা ও কম্বল বোনায় বালক-বালিকারাও সাহায্য করে এবং ক্রমে কাজে নিপুণ হ'য়ে ওঠে।

পারস্যের প্রধান সম্পদ হ'ল পেট্রোল। পাহাড়ময় দেশের মাটির নীচে রয়েছে বিপুল পরিমাণে খনিজ তেল। পারস্যের লোকেরা নিজেদের চেষ্টায় সে তেল খনি থেকে তুলে শোধন ক'রে বিদেশে রপ্তানি করতে পারে না; কারণ এর জন্য যে যান্ত্রিক উন্নতি ও অর্থের প্রয়োজন এদেশে তা নাই। নিজেদের দেশে যন্ত্র-চালনার যোগ্য দক্ষ লোকের অভাবে তৈল উত্তোলনের ভার দেওয়া হয় একটি বৃটিশ কোম্পানিকে। ইংরাজ কোম্পানি এই তেলের ব্যবসায় ক'রে প্রচুর লাভ করে। পারস্যোপসাগরের কাছে আবাদান নামক স্থানে পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম তৈল-শোধনাগার স্থাপিত হয়েছে। এই তৈল-শিল্প নিজস্ব ক'রে নেবার জন্য পারস্যে আন্দোলন সুরু হয়েছিল, মোহাম্মদ মোসাদেক ছিলেন এই আন্দোলনের নায়ক। কিন্তু বৃটিশ কূটনীতির চক্রান্তে এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দেশে সম্পদ থাকা সত্ত্বেও অধিবাসীরা বেশীর ভাগ তার সুফল থেকে বঞ্চিত।

লাভ করে। এজন্য বিদেশী কোম্পানি সুলতানকে প্রচুর টাকা দেয়। এই কোম্পানির একটি বড় অংশীদার হ'ল বৃটেন। ইমাম স্বভাবতঃই সুলতানের সঙ্গে ইরাক পেট্রোলিয়ম কোম্পানির চুক্তি মেনে নিতে রাজী হলেন না; তাঁর অধিকৃত অঞ্চলের মালিক তিনি, সুলতান নন। কিন্তু বিদেশী কোম্পানি এত সহজে এ অবস্থা মেনে নিতে রাজী হ'ল না। ইংরাজ সামরিক কর্মচারীদের পরিচালনায় সুলতানের সৈন্যদল ১৯৫৫ সালে অকস্মাৎ ওমান আক্রমণ ক'রে ইমাম ও তাঁর ভাইকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে এবং ওমানে সুলতানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইমাম মিশরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্বার্থলোভী বিদেশীর হস্তক্ষেপে অন্যান্য আরব রাষ্ট্র বিশেষ ক'রে সৌদি আরব ও মিশর অসন্তুষ্ট হয়। ওমানের জনগণের মধ্যেও বিক্ষোভ জেগে উঠতে থাকে। বিতাড়নের প্রায় দেড় বছর পরে ১৯৫৭ সালে ইমাম মিশর থেকে ওমানে ফিরে আসেন এবং সুলতানের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু হয়। ইমামের বিদ্রোহ দমনের জন্য সুলতান বৃটিশের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বৃটিশ বিমান-বাহিনী ও স্থলবাহিনী সুলতানের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। মধ্য-প্রাচ্যের রাজনৈতিক অবস্থা এমন যে, এখানকার রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে কলহ বা বিবাদের কারণ কেবল নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বিদেশীর স্বার্থ ও চক্রান্ত স্থানীয় ব্যাপারকে আরো জটিল ক'রে তুলেছে।

মরুচারী বেদুইন

গল্পে কবিতায় বেদুইনের ভ্রাম্যমাণ জীবন চমক্‌প্রদ আকর্ষণীয় মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে ততখানি নয়। বেদুইন শখ ক'রে মরু-প্রান্তরে ভ্রমণের নেশায় বা আনন্দের বশে ঘোরে না, ঘোরে নিতান্ত প্রাণের দায়ে। বৃষ্টিবিহীন দেশ, পানীয় জল সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য, ফসল ফলানো আরো কঠিন। পশুপালনই বেদুইনের জীবিকা। পশুর খাদ্য সর্বত্র মেলে না।

তাই বাধ্য হ'য়ে তাকে ঘাসের সন্ধানে দেশের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। সিরিয়া ও আরবের মরুভূমি থেকে মিশরের মরুভূমি এমনকি পারস্য ও তুর্কীস্থান পর্যন্ত বেদুইনদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। তাদের ঘর-দোর থাকে নিজেদের সঙ্গেই; পরিবারের সকলেই তাদের চলার সাথী। কোন রাষ্ট্রের বাসিন্দা হিসাবে খাজনা তারা দেয় না। উদার আকাশতলে তারা স্বাধীন। আলো-বাতাস ভোগ করতে যেমন কর দিতে হয় না, তারা মনে করে প্রকৃতির-দেওয়া পানীয় জল ও পশুখাদ্য তৃণ-ভূমিতেও তাদের অগাধ অধিকার।

উট হ'ল বেদুইনের জীবনের প্রধান অবলম্বন। উটের মাংস তার খাদ্য, উটের পিঠে মালপত্র এবং পরিবারের লোকদের চাপিয়ে সে ভ্রমণ করে, উটের লোম দিয়ে তৈরি হয় তাঁবুর কাপড় ও নিজেদের পরিচ্ছদ, উট তার প্রধান বিনিময়ের সম্বল। উট ছাড়া বেদুইনদের পক্ষে মরুভূমিতে বাস করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এমন প্রয়োজনীয় জন্তুটির প্রতি তার বিশেষ স্নেহ নাই। তার কারণ উটের রুক্ষ স্বভাব। মনিবের দাসত্ব উট যেন ঠিক মেনে নিতে পারেনি। মনিবের হুকুমে সে কাজ করতে রাজী নয় যদি না পিঠে, পায়ের গিঁটে লাঠির আঘাত পড়ে। উটকে বসাতে বা উঠাতে হ'লে শুধু আদেশ দিলেই চলবে না, লাঠি দিয়ে কয়েক ঘা কষাতেও হবে। ঘোড়া বেদুইনদের কাছে খুব শখের প্রাণী। এর যত্ন-আদরের সীমা নাই।


আরবের বেদুইন

কৃষক

ইরাণে কৃষকই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। গ্রামগুলি প্রায়ই উঁচু মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ; ঘরগুলি ছোট, অন্ধকার। গ্রামের মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় রাত্রিতে সকলের ছাগল, ভেড়া, উট রাখা হয়। বাড়ীগুলি ফাঁকা ফাঁকা। উঠানের চারদিকে শয়ন-ঘর ; গৃহপালিত পশুর জন্য থাকে পৃথক ঘর ও উঠান। অনেক বাড়ীর চারপাশে দেওয়াল-ঘেরা ফলের বাগান, তাতে ন্যাসপাতি, ডুমুর, আঙুর প্রভৃতির গাছ। দেশে লোকসংখ্যা কম ব'লে চাষ-আবাদের লোকের অভাব। চাষের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় না, পুরানো পদ্ধতিতেই কৃষক ফসল ফলানোর কাজ করে। দেশে এখনও জমিদারী-প্রথা প্রবর্তিত আছে। জমির মালিক ও বড় ব্যবসায়ীরা ধনশালী, সাধারণ কৃষক দুরবস্থার মধ্যেই জীবন-যাপন করে।

যাযাবর

ইরাণে অনেকগুলি যাযাবর উপজাতি আছে। এর লোকেরা ছাগলের লোমে-তৈরি তাঁবুতে বাস করে এবং তাদের ছাগলের পাল, পরিবারের লোকজন ও সংসারের জিনিস-পত্র নিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পশুচারণের উদ্দেশ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে তারা পাহাড় অঞ্চলে কাটায়, শীতের আগ দিয়ে সমতলভূমিতে নেমে আসে। তাদের দেহের গড়ন চমৎকার ; স্বাস্থ্যবান, সাহসী, দুর্দান্ত। যে পথ দিয়ে তারা চলে তার আশেপাশের গ্রাম থেকে ছাগল, ভেড়া লুঠপাট ক'রে নেওয়া তাদের স্বভাব। বৃদ্ধ ব্যক্তি, স্ত্রীলোক ও শিশুরা তাদের গরু, ছাগল, ভেড়া, উট প্রভৃতির তদারক করে, বয়স্ক সবল ব্যক্তিরা ঘোড়ায় চ'ড়ে গ্রামে হানা দিতে যায়।

ইরাণীদের পরিবারে মেয়ের চেয়ে ছেলের দাম বেশী। আগে বালকদের লেখাপড়া শেখার সুবন্দোবস্ত ছিল না। আট বছর বয়স হ'লে শিশু

মোল্লার কাছে কোরান পড়তে সুরু করতো। আরবী ভাষায় লেখা কোরানের বাক্যগুলি ও পারসীতে তার ব্যাখ্যা তোতাপাখীর মত মুখস্থ করতে হ'ত। ভাষা শিক্ষা বা অন্য কিছু শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ছেলে পড়াশুনায় অমনোযোগী হ'লে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে বেত লাগানোর রীতি ছিল। মেয়েদের লেখাপড়া শিখানোর কোন প্রচলন ছিল না; পর্দাপ্রথা ছিল কঠোর। ইদানীং পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণে আধুনিক ধরনের স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা ক'রে শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা চলেছে। বোরখা না প'রেও মেয়েরা এখন পথে চলাফেরা করে। তবে ধনী পরিবারে এখনও এর জের চলেছে। অর্থশালী লোকদের পরিবারের মেয়েদের জন্য পৃথক বাসভবন থাকে, একে বলে এ্যাণ্ডেরান। এখানে কেবল আত্মীয় ছাড়া অন্য কোন পুরুষ প্রবেশ করে না।

প্রাচীন পারস্য ও নবীন ইরাণ

প্রাচীনকালে পারস্য সামরিক শক্তি, সভ্যতা ও সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল। কাইরাস্ ও তাঁর পরবর্তী রাজাদের অধীনে পারস্য সাম্রাজ্য শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে। কাইরাস্ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী পারস্য সাম্রাজ্যের সীমা ভারতের প্রান্ত পাঞ্জাব থেকে মিশরের মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। মহাবীর আলেকজাণ্ডার পারস্য সাম্রাজ্য অধিকার ক'রে সুন্দর সমৃদ্ধ শহরগুলি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন এবং পারস্যকে একটি গ্রীক প্রদেশে পরিণত করেন।

এর প্রায় ছয় শত বৎসর পরে সাসানিয়ান রাজাদের রাজত্বকালে পারস্য পূর্ব গৌরব ও শক্তি ফিরে পায়। আবার সপ্তম শতাব্দীতে আরবরা পারস্য জয় ক'রে দেশে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করে। আরব আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত পারস্যের লোকেরা অগ্নি ও সূর্যের উপাসক ছিল।

দেশে পর পর অনেক রাজবংশের উত্থান-পতন ঘটে। অবশেষে ১৯২৫ সালে রেজা খাঁ নামে একজন সাধারণ সৈনিক নিজেকে শাহ্ ব'লে ঘোষণা ক'রে পারস্যের ময়ূর-সিংহাসনে আরোহণ করেন। রেজা শাহ্ ছিলেন উদ্যমশীল, বলিষ্ঠ চিন্তাধারায় উদ্‌বুদ্ধ। দেশের অরাজকতা দূর ক'রে পারস্যকে শক্তিশালী ও উন্নত ক'রে তুলতে তিনি চেষ্টা করেন। তাঁকেই বর্তমান অগ্রগতিশীল ইরাণের স্রষ্টা বলা যায়। নানারূপ চক্রান্তে ১৯৪১ সালে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তখন তাঁর পুত্র মহম্মদ রেজা পহলবি ইরাণের রাজপদ লাভ করেন। বর্তমান রাজাও তাঁর পিতার মত দেশকে শিল্প, শিক্ষা ও সভ্যতায় আধুনিক ক'রে তোলার পক্ষপাতী।

প্রাচীন পারস্যের গৌরব

শিল্প ও সাহিত্যের জন্য পারস্য জগৎ-জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। হারুণ-অল-রসিদের রাজত্বকালে পারস্যের জাঁকজমক ও সমৃদ্ধিতে ইতিহাসে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। পারস্যের বিখ্যাত কবি সাদী, হাফিজ, ফেরদৌসী, ওমরখৈয়ম তাঁদের রচনার জন্য অমর কীর্তির অধিকারী হয়েছেন। বিশ্বের সাধারণ লোকের কাছে ইরাণ শিল্প, সাহিত্য, সৌন্দর্য ও সুষমার দেশ।

ইরাক

ইরাক। প্রাচীন নাম মেসোপটেমিয়া। মেসোপটেমিয়া সভ্যতার লীলা-ভূমি ব'লে পরিচিত। অতি প্রাচীনকালে এখানে টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীর উপত্যকায় এক সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্য ও সভ্যতার পত্তন হয়েছিল। এখন সে রাজধানী ব্যাবিলনের চিহ্নমাত্র নাই। অতীতের চিহ্নস্বরূপ আছে কেবল কতক স্থানে রোদে-পোড়া ইটের স্তূপ।

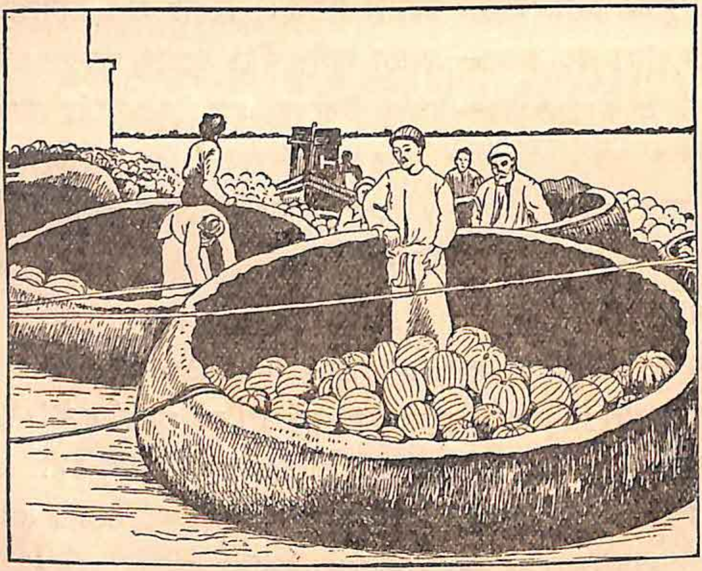
বর্তমান ইরাক যে অঞ্চল নিয়ে গঠিত তা প্রথম মহাযুদ্ধের আগে মসুল, বাগদাদ ও বসোরা নামে তুরস্কের তিনটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। দেশটি কুর্দিস্তান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। দুইটি বড় নদী—ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্—ইরাকের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে মিলিতভাবে শাত-এল-আরব নামে পারস্যোপসাগরে পড়েছে। সিন্ধুনদের পশ্চিমে এশিয়ায় এই নদী দুটি সবচেয়ে বড়। যে অঞ্চলে এক ফোঁটা জল সম্পদ ব'লে গণ্য সেখানে সুমিষ্ট জলের ধারাবাহী বিশাল দুইটি নদীকে মানুষ ভগবানের আশীর্বাদ ব'লে মনে করে।

ভূ-প্রকৃতি অনুসারে ইরাক দেশটিকে তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়। ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীর অববাহিকা অঞ্চল—এখানে জন্মে ধান, তূলা, ডাল, খেজুর ইত্যাদি ফসল। দ্বিতীয় হ'ল—বাগদাদের উত্তরে পাহাড়ময় অঞ্চল—এখানে মাটির নীচে রয়েছে অফুরন্ত খনিজ তেলের উৎস। তৃতীয়—আরো উত্তরের এবং উত্তর-পূর্বের অঞ্চল, একদিকে তুরস্ক, অন্যদিকে ইরাণ পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে সকল রকম ফল জন্মে প্রচুর পরিমাণে। দেশের অবশিষ্ট অংশ—নদী দুইটির পশ্চিমে—জনহীন, তরুলতাহীন মরুভূমি।

অধিবাসী

জীবন-যাপনের রীতি অনুসারে ইরাকের অধিবাসী চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। শহরের অধিবাসীরা ব্যবসায়-বাণিজ্যে রত। প্রাচীন রীতিনীতি পরিবর্তন ক'রে আধুনিক সভ্য জগতের সঙ্গে সমান তালে চলার জন্য এদের মধ্যে আগ্রহ জেগেছে। কিন্তু প্রাচীন সামাজিক সংস্কার এখনও দূর হয়নি। মেয়েদের এখনও পর্দাপ্রথা প্রচলিত রয়েছে ; তবে শহরের নবীন সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষ সকলের মধ্যেই পাশ্চাত্যের সামাজিক প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। আধুনিক যুগের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এদের মনোভাবেরও পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

পাহাড় অঞ্চলের লোকেরা সাধারণতঃ দীনভাবে দুস্থ জীবন যাপন করে। মাটির তৈরি ঘর, কাঠের ছাদ। তাদের খাদ্যের প্রধান উপকরণ রুটি ও দই। মাংস, চিনি, চা কদাচিৎ মেলে; এগুলি বিলাসের খাদ্য। এ অঞ্চলে পাহাড় থেকে বারো মাস জল পাওয়া যায় কিন্তু ভূমির উর্বরতা সর্বত্র সমান নয়। লোকেরা চাষ-আবাদ করে, ছাগল-ভেড়া চরায়, বনজঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে। পাহাড় অঞ্চলে স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়াও যাযাবর শ্রেণীর লোকেরা তাদের ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, সংসারের যাবতীয় জিনিস-পত্র ও পরিবারের সকলকে নিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ায়। এরা কখনও বাড়ী তৈরি ক'রে বাস করে না। সঙ্গের তাঁবুই এদের চলমান জীবনের আশ্রয়স্থল।



টাইগ্রিস্ নদীতে দেশীয় নৌকা গুফা

ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীর অববাহিকায় পল্লীতে কৃষক-শ্রেণীর বাস। এদের বলা হয় ফেলাহীন। জলসিক্ত জমিতে এরা ফসল উৎপাদন

করে। উৎপাদিত ফসল হাট-বাজারে নিয়ে যায় বিক্রির জন্য। নদী অঞ্চলের তরমুজ যেমন বড় তেমনি সুমিষ্ট ও রসাল। চাষীরা এক রকম গোলাকার ঝুড়ির মত ভেলাতে ক'রে মাল নিয়ে নদীপথে যাতায়াত করে। নলখাগড়া দিয়ে তৈরি এই গোল নৌকাকে বলে 'গুফা'। যাতে জল না ওঠে সেজন্য পিচ দিয়ে লেপে দেওয়া হয়।
ইরাকের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে প্রধান হ'ল যব; তারপরই খেজুর। বড় বড় খেজুর-বাগান—সারি সারি গাছ। ফলে প্রচুর। সুস্বাদু খেজুর অধিবাসীদের খাদ্যের একটি প্রধান উপকরণ। প্রতি বৎসর বহু পরিমাণ খেজুর বিদেশে রপ্তানি করা হয়।
নদী উপত্যকা অঞ্চলের চাষীদের জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধির ছাপ আছে। দেশে বৃষ্টিপাত খুবই কম। নদীতীরে উৎপন্ন নলখাগড়ার ঘর তৈরি হয়। জলবায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল।
ইরাকের বেদুইনরা দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মরুভূমির মধ্যে বাস করে। তারা উট, ছাগল, ঘোড়া পোষে। যেখানে সামান্য পরিমাণ জল ও পশুচারণের উপযোগী তৃণ মেলে সেখানে সেখানে তারা দলবদ্ধ হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়। স্বাধীন মুক্ত তাদের জীবন, কিন্তু সর্বদা সুখের নয়। উট ও ছাগলের লোম দিয়ে তৈরি তাঁবু তাদের বাসগৃহ। খেজুর, উটের দুধ, মাংস তাদের প্রধান খাদ্য। ছেলেমেয়ে সবাই ঘোড়া চালাতে পটু। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই পরে ঢিলা আলখাল্লা ধরনের পোষাক; ঘোমটার মত মাথায় ঢাকনি পরে সকলেই। মরুভূমির মধ্যে দিনে যেমন তীব্র রোদের তেজ, রাত্রিতে তেমনি শীতের প্রচণ্ডতা। প্রখর রোদ ও তীব্র শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্যই এমন পরিচ্ছদ দরকার হয়।

কৃষি ও শিল্প

লোকের উপজীবিকা হিসাবে ইরাকে কৃষিই প্রধান। কিন্তু কৃষকের অবস্থা সচ্ছল নয়। আধুনিক যুগের উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষের

ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রবর্তিত হয়নি। জমিতে জলসেচেরও সুবন্দোবস্ত নাই। অথচ মাঝে মাঝে এমন প্রাকৃতিক বিপদ আসে যার বিরুদ্ধে চাষীরা নিজেকে অসহায় মনে করে। পঙ্গপালের উৎপাত অত্যন্ত বেশী। ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল কালো মেঘের মত আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে উড়ে আসে; ক্ষেতের ফসল নিঃশেষ ক'রে দিয়ে চলে যায়। এ ছাড়া অনাবৃষ্টি আছে, বান আছে। ইরাকী চাষী বুদ্ধিমান, কর্মঠ এবং চাষের উন্নত প্রণালী গ্রহণে আগ্রহী। সরকারী প্রচেষ্টায় বিরাট জলাধার নির্মাণ ক'রে জলসেচের ব্যবস্থা করার আয়োজন চলেছে। এতে হাজার হাজার একর মরুসদৃশ অনাবাদী জমি চাষের যোগ্য ক'রে তোলা সম্ভবপর হবে। অনেকে আশা করেন, জলসেচের ব্যবস্থা ইরাককে 'দ্বিতীয় মিশরে' পরিণত করা সম্ভব হ'তে পারে।

ইরাকের লোকসংখ্যা মাত্র ৫১ লক্ষের কিছু বেশী। অনেক স্থান জনহীন। চাষীরা যে ফসল উৎপন্ন করে তার কিছু অংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। পৃথিবীতে ব্যবহৃত খেজুরের শতকরা ৮০ ভাগ ইরাক থেকে পাওয়া যায়। এ ছাড়া গম, যব ও কিছু পরিমাণে তুলাও বিদেশে বিক্রি হয়। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ছাগল-ভেড়ার চামড়া অন্যতম।

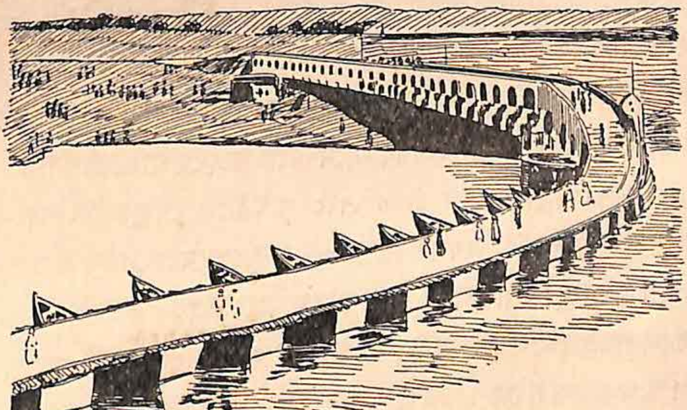
খনিজ তেল

ইরাকের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হ'ল খনিজ তেল। দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বৃক্ষহীন পাষাণময় প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে পেট্রোলিয়ম বিদ্যমান রয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে খানাকিন তৈল কোম্পানি নিয়মিত তেল উত্তোলন করছে। বাগদাদের উত্তরের অঞ্চলেই সবচেয়ে বড় কারখানা অবস্থিত। বৃটিশ, ফরাসী, মার্কিন এবং ওলন্দাজ ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানি (ইরাক পেট্রোলিয়ম কোম্পানি) পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বড়।

বছরে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টন পেট্রোল উত্তোলন করা হয়। সমুদ্রতীর থেকে কারখানার দূরত্ব ৫৬০ মাইল। জনহীন অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে ৫৬০ মাইল দীর্ঘ পাইপ দিয়ে পেট্রোল কির্কাক থেকে ভূমধ্যসাগরে সিরিয়ার উপকূলে বানিয়াসে আনা হয়। সেখান থেকে তেলবাহী জাহাজে তেল বিভিন্ন দেশের তৈল-শোধনাগারে রপ্তানি হ'য়ে থাকে। তেলের খনির জন্য মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলিতে ইউরোপ ও আমেরিকার যন্ত্র-বিজ্ঞানে উন্নত জাতিগুলির লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে এবং এরই ফলে এ অঞ্চলে দেখা দিয়েছে আন্তর্জাতিক অশান্তি।

শহর-বন্দর

ইরাকের প্রধান শহর তিনটি—বাগদাদ, মসুল ও বসোরা। আধুনিক কালে এই তিনটি শহরেরই যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। টাইগ্রিস্ নদীর



মসুল শহরের নৌকার সেতু

পশ্চিম তীরে অবস্থিত বাগদাদ শহরে নূতন নূতন প্রশস্ত পথ, আধুনিক ধরনের অট্টালিকা, হোটেল, সিনেমা, ট্যাক্সি প্রভৃতি বর্তমান যুগের সভ্যতার পরিচয় বহন করছে। আবার আগেকার দিনের পুরানো

ধরনের বাজার, সরাইখানা, ঘোড়ায়-টানা গাড়িও রয়েছে। নদীতে এখনও গুফা অর্থাৎ নলখাগড়ায় তৈরি ঝুড়ির মত নৌকা ব্যবহৃত হয়। শহরের বাড়ীগুলি অধিকাংশই পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি। ছাদ সমতল। গ্রীষ্মের তিন-চার মাস লোকেরা রাত্রিতে ছাদে শুয়ে আরাম করে। শীতকালে বৃষ্টি হয়, কখন কখনও তুষার পড়ে।

ইরাকে একটি রেলপথ আছে। কিন্তু উত্তর অঞ্চলে টাইগ্রিস্ নদী-পথেই মাল চলাচল বেশী হয়। নদীর কতক স্থান অগভীর, নদীতে আছে চর। অল্প জলেও যাতে চলতে পারে এজন্য গুফা এবং কাঠের ভেলায় ক'রে জিনিস-পত্র আনা হয়। কতকগুলি কাঠ একত্র ক'রে বেঁধে তার নীচে হাওয়া-ভরা চামড়ার থলি দিয়ে ভেলা ভাসিয়ে রাখা হয়। স্রোতের সঙ্গে ভাটি পথে বাগদাদ এসে ব্যবসায়ীরা ভেলা খুলে ফেলে, কাঠগুলি বিক্রি ক'রে দেয় এবং স্থলপথে ফিরে যায় নিজেদের বাড়ীতে।

ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ কুর্ণা নামক স্থানে একত্র মিশেছে। এখান থেকে মিলিত নদী শাত-এল-আরব নামে গিয়ে পড়েছে পারস্যোপসাগরে। এই নদীর অববাহিকা খুব উর্বর এবং পৃথিবীতে খেজুর উৎপাদনের একটি প্রধান অঞ্চল। এখানে প্রায় তুই শত রকমের খেজুর উৎপাদন করা হয়। খেজুর লোকেদের প্রধান খাদ্য এবং রপ্তানি দ্রব্য।

পারস্যোপসাগর থেকে ৭০ মাইল দূরে শাত-এল-আরবের অববাহিকায় বসোরা বন্দর অবস্থিত। ইহা রেল ও বিমানপথের একটি বড় স্টেশন ; উৎকৃষ্ট বন্দরের যে-সব সুবন্দোবস্ত থাকা দরকার এখানে তার ব্যবস্থা আছে। বসোরা বন্দরের ভিতরে এবং আশেপাশে বহু খাল ও খাড়ি আছে। তাতে নৌকাতে ক'রে যাত্রী ও মাল চলাচল করে। বসোরাকে বলা হয় 'প্রাচ্যের ভেনিস'। বসোরা ব্যবসায়-বাণিজ্যের একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র।

সিরিয়া

সিরিয়ার অতীত ইতিহাস একদিকে যেমন সমৃদ্ধি ও জাঁকজমকে পূর্ণ, অন্য দিকে তেমনি রক্তপাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ধ্বংসের কাহিনীতে ভরা। সিরিয়ার সীমানা এক সময়ে বর্তমান সিরিয়া প্রজাতন্ত্রের বাইরেও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; তখন লেবানন, ইস্রায়েল ও জর্ডানের অধিকাংশ এবং সৌদি আরবের কিছু অংশ সিরিয়ার অন্তর্গত ছিল। এ অঞ্চলটি ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার মিলনস্থলে অবস্থিত ব'লে এর সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই ঘটেছিল। প্রাচীনকালে আফ্রিকা ও ইউরোপের সঙ্গে এশিয়ার বাণিজ্য চলতো স্থলপথে সিরিয়ার মধ্য দিয়ে। এদেশে তাই সমৃদ্ধ ব্যবসায়-কেন্দ্র গ'ড়ে উঠেছিল। আবার এই দেশের মধ্য দিয়েই দেশ-বিজেতাদের সৈন্যদল বীরদর্পে আফ্রিকা ও এশিয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছে, যোদ্ধাদলের হানাহানিতে দেশের মাটি হয়েছে রক্তরাঙা। এদেশের মধ্যে এখনও রয়েছে অতীত সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ, সমৃদ্ধিশালী শহরের জীর্ণ অবশেষ। সিরিয়ার বুকের ওপর দিয়ে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের বিজয়ী সৈন্যদল আফ্রিকা জয় করতে গেছে ; সেখান থেকে বিজয়মাল্য অর্জন ক'রে ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হয়েছে। পারস্য সম্রাটের সৈন্যবাহিনী ছিন্নভিন্ন ক'রে নগর রাজধানী পুড়িয়ে দিয়ে মূর্তিমান ধ্বংসের মত তিনি এগিয়ে গেছেন। পরবর্তী যুগে রোমের বিজয়ী বাহিনী, তারপর তৈমুরলঙ্গের নিষ্ঠুর মঙ্গোল-বাহিনী, তার পরবর্তীকালে তুর্কী সৈন্যদল এবং আরো অনেকে সিরিয়ার মাটিতে দম্ভভরে পদ-নিক্ষেপ ক'রে গেছে। সিরিয়ার ভৌগোলিক অবস্থিতিই হয়েছিল তার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কারণ। সৌভাগ্যের চেয়ে দুর্ভাগ্যই বেশী।

বর্তমান সিরিয়া প্রাচীনকালের সিরিয়ার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। উত্তরে তুরস্ক, দক্ষিণে জর্ডান, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, লেবানন ও ইস্‌রায়েলের উত্তর অংশ, পূর্বে এবং দক্ষিণ-পূর্বে ইরাক। সিরিয়াকে বলা হয় প্রাচীন যুগের বাণিজ্যকেন্দ্র এবং চাঞ্চল্য ও অশান্তির অঞ্চল।

সিরিয়ার ভূমি পাহাড়ময়। দক্ষিণ অংশে কতকগুলি নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি রয়েছে। এই সব অগ্নিগিরি থেকে যে লাভা নির্গত হ'ত তা জমিকে করেছিল উর্বর। দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ প্রাচীনকাল থেকেই উর্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল শুষ্ক মরুপ্রান্তর। সিরিয়ার জলবায়ু চরমপ্রকৃতির। প্রচণ্ড শীত; গ্রীষ্মকালে দারুণ গরম। ভূমধ্যসাগরের নিকটবর্তী অঞ্চলে জলবায়ু মৃদু, নাতিশীতোষ্ণ। পশ্চিম অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় কিন্তু মরু অঞ্চল বৃষ্টিবিহীন। গ্রীষ্মের দিনে মরুভূমির দিক থেকে উষ্ণ ধূলিঝড় প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় এবং যেখান দিয়ে তা ব'য়ে যায় সেখানে রেখে যায় শুক্‌না ধূলির স্তর। এই বিচিত্র রকমের ভূমি-প্রকৃতির জন্যই প্রাচীনকালে সিরিয়ানগণ ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গ'ড়ে তুলতে পারেনি। দেশে ভিন্ন ভিন্ন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রকে অবলম্বন ক'রে ছোট ছোট জনপদের উদ্ভব হয়েছিল; এদের নিজেদের মধ্যে ছিল ঈর্ষ্যা, প্রতিযোগিতা ও কলহ। নিজেদের মধ্যে একতার অভাবে এরা সহজেই বিদেশীর পদানত হয়েছে। বহুযুগ অবধি চলেছিল এমনি বিদেশীর শাসন এবং শাসক-পরিবর্তন।

আধুনিক সিরিয়া

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত সিরিয়া তুরস্কের অটোম্যান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯২০ সালে দেশটি ফরাসীদের শাসনাধীনে আসে। দেশের মধ্যে বিদ্রোহ চলতে থাকে। কয়েকবার সৈন্যদল দিয়ে স্বাধীনতা-কামীদের দমন করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফরাসী জার্মানির নিকট আত্ম-সমর্পণ করলে সিরিয়া এক রকম ফরাসীদের কবল থেকে

মুক্তি লাভ করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে জার্মানির পরাজয় ঘটে এবং ফরাসী ও ইংরাজ সৈন্য ১৯৪১ সালে পুনরায় সিরিয়া অধিকার ক'রে নেয়। কিন্তু দেশের জনগণ কিছুতেই বিদেশী শাসন মেনে নিতে রাজী হয় না। অবশেষে ১৯৪৬ সালে বিদেশী সৈন্য দেশ থেকে অপসারিত হয়; এবং বহুযুগ পরে সিরিয়া স্বাধীনতার গৌরব অর্জন করে। সিরিয়া এখন একটি প্রজাতন্ত্রী দেশ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তার সমস্যা মেটেনি বরং নূতন আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

জর্ডানের ভূতপূর্ব রাজা আবছুল্লা সিরিয়া ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী দেশ নিয়ে একটি বড় রাজ্য গ'ড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক ও প্যালেস্টাইন নিয়ে বিশাল সিরিয়া গঠিত হবে। সিরিয়ার প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি এই পরিকল্পনা সমর্থন করে কিন্তু সৈন্যবাহিনী দাঁড়ায় এর বিরুদ্ধে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিশর ও সৌদি আরব এই পরিকল্পনায় বাধা দেয়। দেশের মধ্যে ষড়যন্ত্র, দলাদলি ও নানা বিরুদ্ধ আন্দোলন শান্তি ও অগ্রগতির পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়। দেশের শাসন-ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল না হ'লে দেশের অধিবাসীরা কখনই শান্তিতে বসবাস করতে পারে না। যেখানে শান্তি নাই সেখানে উন্নতিও নাই। বিশাল সিরিয়া পরিকল্পনা বাতিল হ'য়ে যাওয়ার পর বর্তমান প্রজাতন্ত্রী সিরিয়া দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ গ্রহণ করেছেন। কোন বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠীতে যোগ না দিয়ে স্বাধীন নিরপেক্ষভাবে স্বদেশের কল্যাণ-সাধনই বর্তমান সিরিয়া সরকারের নীতি।

অধিবাসী

সিরিয়ার প্রায় তিন ভাগের তুই ভাগ লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে এবং তারা কৃষির ওপর নির্ভরশীল। পাহাড়ের ঢালু অংশে এবং আবাদের

যোগ্য স্থানে চাষীরা নানারকল ফল, তরি-তরকারি ও খাদ্যশস্য উৎপাদন করে। পশ্চিম দিকের উষ্ণ অঞ্চলে তূলা এবং তামাক উৎপন্ন হয়। দেশে চাষীর অবস্থা শোচনীয়। জমির মালিকরা সাধারণতঃ বাস করে শহরে এবং ফসল বাড়ানোর কোন প্রচেষ্টাতেই চাষীর সহায়তা করে না কিন্তু উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক তাদের প্রাপ্য। ফসল কাটার সময় হ'লে মালিকের প্রতিনিধিরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রাপ্য অংশ আদায় ক'রে নিয়ে যায়।

বেতুইনরা যেমন তুঃস্থ জীবন যাপন করে, চাষীর অবস্থাও প্রায় তেমনি। বেতুইনদের লুঠপাট থেকে শস্য রক্ষার জন্য চাষীকে সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। চাষের সরঞ্জাম তার সেই আদিম কালের। কাঠের লাঙ্গল ; ষাঁড়, উট কিংবা গাধা দিয়ে টানানো হয়। কখন কখনও চাষী নিজেও টানে। মাটির ঘরে সে বাস করে। বাড়ীতে একখানা কি তুইখানা ঘর। পালিত পশুর সঙ্গে একই ঘরে সে রাত্রি কাটায়। ভূমিহীন মজুরের অবস্থা আরো শোচনীয়। যখন ফসল পাকে তখনই সে কেবল পেট ভ'রে খেতে পায়। শীতকালে তাকে বাঁচতে হয় শস্যের দান আর ঘাসের রুটি খেয়ে।

সিরিয়ার লোকেরা অধিকাংশই জাতিতে আরব। এদের ভাষা আরবী যদিও কতক লোক আর্মেনিয়ান, তুর্কী, কুর্দিস ও সিরিয়াক ভাষায় কথা বলে। দেশের বেশীর ভাগ লোক মুসলমান এবং সুন্নী সম্প্রদায়-ভুক্ত। অবশিষ্টদের মধ্যে আছে ইহুদি ও খ্রীষ্টান।

সিরিয়ার বেতুইনরা পাহাড় অঞ্চলে বাস করে। তাদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার এবং জীবনযাপন-প্রণালী হাজার বছর আগে যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনি আছে। বেতুইনদের মধ্যে আছে বিভিন্ন উপজাতি বা গোষ্ঠী। এরা কখনও পরস্পর মিলেমিশে থাকে না ; বরং পরস্পরের সঙ্গে কলহ ও হানাহানিই এদের বৈশিষ্ট্য। কিশোর তরুণ

বেদুইনরা অপর দলকে আক্রমণ ক'রে লুঠপাট করার ভিতরেই দৈহিক শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়ে প্রশংসা অর্জন করে। এরূপ কাজ করাতেই সে দলের যোগ্য সদস্যরূপে বিবেচিত হয়। বেদুইনরা ছাগল, ভেড়া, উট প্রভৃতি চরানোর জন্য বিভিন্ন দলের জন্য এলাকা নির্দিষ্ট ক'রে নেয়। একের এলাকায় অপরে এলে হানাহানি অনিবার্য। মধ্য-প্রাচ্যে প্রায় সকল দেশেই মরুবাসী বেদুইন যাযাবর দল আছে। ভ্রাম্যমাণ জীবনে এরা স্থায়ী সামাজিক জীবনের আইন-কানুন মেনে চলে না। উন্মুক্ত আকাশের নীচে, তরুহীন প্রান্তরে এরা তাঁবু খাঁটিয়ে বিশ্রাম করে। দিনে প্রচণ্ড রোদ, রাত্রিতে প্রচণ্ড শীত। এতেই এরা অভ্যস্ত।

সিরিয়ার আয়তন ৬৬ হাজার বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৩২ লক্ষ ৫৩ হাজার। রাজধানী দামাস্কাস। দামাস্কাস পুরাতন শহর কিন্তু আধুনিক কালের সাজ-সরঞ্জাম এবং উন্নত ধরনের অট্টালিকাও গ'ড়ে উঠেছে। দামাস্কাসের বাজার বিখ্যাত। ফাঁকা জায়গায় প্রায় সকল প্রকার জিনিস বিক্রির জন্য সমবেত করা হয়—খাদ্যবস্তু, বিবিধ রকমের ফল, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসন-পত্র থেকে রেডিও, টাইপ-রাইটার এবং উট, ছাগল, ঘোড়া, ভেড়া পর্যন্ত। মধ্যযুগে দামাস্কাসের ইস্পাত ও তরবারি পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিল। এমন ধারালো তরবারি এখানে তৈরি হ'ত যা দিয়ে লোহার অস্ত্রশস্ত্রও অনায়াসেই কেটে ফেলা চলতো।

লেবানন

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে ছোট এক ফালি দেশ। আয়তন ৪০ হাজার বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১৩ লক্ষ। উত্তর এবং পূর্বে সিরিয়া, দক্ষিণে ইস্রায়েল, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর। লেবানন রাষ্ট্রটি ১৯২০ সালে তুরস্কের পাঁচটি জেলা নিয়ে গঠিত হয়। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ইহা ফরাসীদের

অধীনে ছিল ; ১৯৪৪ সালে লেবানন প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে স্বাধীনতা লাভ করে। বর্তমান জগতে স্বাধীন রাষ্ট্রহিসাবে লেবাননের বয়স অল্প হ'লেও এর অতীত ইতিহাস প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ। লেবানন ছিল ফিনিশীয়দের দেশ। ফিনিশীয় বণিকরা এককালে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশসমূহে বাণিজ্য ক'রে খ্যাতি অর্জন করেছিল। তারা ছিল কাঠের জাহাজ তৈরি করতে পটু এবং সমুদ্রে জাহাজ-চালানোতে দক্ষ। প্রাচীন লেবাননের সামুদ্রিক বন্দর টায়ার এবং সিডন সেযুগে বিখ্যাত ছিল। টায়ারের লোকেরা মুরেক্স নামক একপ্রকার সামুদ্রিক মাছ থেকে উৎকৃষ্ট গাঢ় লাল রঙ তৈরি করতো। সেযুগে এর তুলনা ছিল না। এ ছাড়া সুন্দর সুন্দর কাচের জিনিস এখানে প্রস্তুত হ'ত। লেবাননের পাহাড় থেকে যে সিডার কাঠ পাওয়া যেত, তার চাহিদা ছিল সকল দেশে। বর্তমান বেইরুটের মাইল কুড়ি উত্তরে লেবাননের বাইব্লস শহর অবস্থিত ছিল। এখান থেকে প্যাপিরাস্—যাতে তখনকার দিনে লেখা হ'ত এবং যা থেকে পেপার (কাগজ) কথাটি এসেছে—যথেষ্ট পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা হ'ত। গ্রীকরা প্যাপিরাস্ দিয়ে যে পুঁথি তৈরি করতো তাকে বলতো বাইব্লস। এই শব্দ থেকে বাইবেল এবং বুক্ অর্থাৎ বই শব্দটি গঠিত হয়েছে।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ইউরোপের লোকেদের বাণিজ্য চলতো স্থলপথে—সিরিয়া, ইরাক, ইরাণ এবং আফগানিস্থানের ভিতর দিয়ে। স্থলপথের শেষ সীমানা ছিল লেবাননের বন্দরগুলি। এখান থেকে বাণিজ্য-দ্রব্য জাহাজে ক'রে নেওয়া হ'ত ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে। ফিনিশীয় বণিকরাই ছিল প্রধান বাহক ও সওদাগর। আফ্রিকা মহাদেশে যাওয়ার স্থলপথ ছিল লেবাননের ভিতর দিয়ে। এই পথে বণিকের দল গেছে বাণিজ্য-সম্ভার নিয়ে। রণমত্ত সৈন্যদল গেছে মৃত্যু ও ধ্বংস বহন ক'রে।

ভৌগোলিক অবস্থানের ভোগ এবং দুর্ভোগ দুই-ই জুটেছে লেবাননের ভাগ্যে।

লেবানন পাহাড়ময় দেশ। লেবানন পর্বত উপকূলের সমান্তরালভাবে একশো মাইলের বেশী প্রসারিত হয়েছে। পূর্বদিকে রয়েছে এ্যান্টি-লেবানন পর্বতমালা। দুই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে সংকীর্ণ বেকা উপত্যকা। এর মধ্য দিয়ে দুইটি নদী প্রবাহিত—ওরোনাটস উত্তর দিকে প্রায় আড়াইশো মাইল প্রবাহিত হ'য়ে তুরস্কে প্রবেশ করেছে এবং অবশেষে ভূমধ্যসাগরে গিয়ে পড়েছে; লিটানি নদী ওরোনাটসের কাছাকাছি উৎপন্ন হ'য়ে ব'য়ে গেছে দক্ষিণ দিকে জর্ডানের অভিমুখে। এ নদীটি গভীর গিরিখাতের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত; কাজেই এর জল জমিতে সেচের কাজে লাগানো চলে না।

দেশে জলবায়ু সর্বত্র সমান নয়। সমুদ্রতীরে সংকীর্ণ সমভূমিতে শীতকাল মৃদুভাবাপন্ন, আরামদায়ক; গ্রীষ্মের তাপ খুব প্রখর নয়। বৃষ্টিপাত হয় প্রচুর। কিন্তু পাহাড় অঞ্চলে শীত অত্যন্ত তীব্র। পাহাড়ের চূড়াগুলি বরফাচ্ছন্ন হ'য়ে সূর্যকিরণে ঝলমল করে। লেবেন কথাটির অর্থ শুভ্রতা। তুষারমণ্ডিত পর্বতশৃঙ্গ থেকেই দেশের নাম হয়েছে। একদিকে ভূমধ্য-সাগরের গাঢ় নীল জল, ঢেউএর আন্দোলন; অন্যদিকে নীল আকাশের গায়ে সাদা পাহাড়ের চূড়া যেন অচল শুভ্র তরঙ্গ। পাহাড়ের ধাপে ধাপে সুশ্রী সিডার, সাইপ্রেস ও পাইন বন। দৃশ্য মনোমুগ্ধকর।

বেকা উপত্যকায় শীতকাল স্নিগ্ধ শীতল কিন্তু গ্রীষ্ম উষ্ণ ও বৃষ্টিহীন। বৃষ্টি সুরু হয় অক্টোবরে। ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত কয়েক মাস বারিবর্ষণ হয় প্রচুর।

চাষ-আবাদ, শিল্প

লেবানন কৃষিপ্রধান দেশ। প্রাচীন পদ্ধতিতে বলদে-টানা লাঙ্গল দিয়ে চাষীরা চাষ করে। জমি উর্বর ব'লে ফসল ফলে প্রচুর। যে অঞ্চলে

শীতকালে বৃষ্টি হয় সেখানে দেখা যায় ফলের প্রাচুর্য—আঙুর, কমলালেবু, আপেল, ন্যাসপাতি, জলপাই। এ ছাড়া উৎপন্ন হয় গম, যব, পেঁয়াজ, ভুট্টা, আলু, টমাটো, তরমুজ, তামাক, তুলা। রেশম উৎপাদন এদেশে একটি প্রচলিত কুটীর-শিল্প। মূলবেরি গাছের পাতা খাইয়ে রেশম-কীট পালন করা হয়। প্রায় কৃষক পরিবারই রেশম-কীট পালন অর্থ উপার্জনের অতিরিক্ত উপায় হিসাবে গ্রহণ করে। জাপানে যেমন মেয়েরা রেশম-কীট পালন ও গুটি থেকে সূতা তৈরি করে, লেবাননেও তেমনি এ শিল্প প্রচলিত আছে।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের অঞ্চল হিসাবে এখনও লেবাননের বিশিষ্ট স্থান আছে। দুইটি পেট্রোলের পাইপ-লাইন এর বন্দরে এসে শেষ হয়েছে—একটি এসেছে ইরাকের কির্কাক তৈলখনি থেকে ট্রিপোলি বন্দরে; অন্যটি এসেছে সৌদি আরবের আব্‌কাইক তৈলখনি থেকে সিডন বন্দরে। লেবাননে পেট্রোল শোধনাগার আছে—এখানে খনি থেকে উত্তোলিত অবিশুদ্ধ তেল শোধিত ক'রে পেট্রোলে পরিণত করা হয়। তাছাড়া দেশে সাবান, দেশলাই, সিগারেট, জুতা, সূতিবস্ত্র, রেশমবস্ত্র প্রভৃতি তৈরির কারখানা আছে।

লেবানন আয়তনে ছোট হ'লেও শিল্প, সভ্যতা ও সমৃদ্ধিতে পার্শ্ববর্তী অনেক দেশ থেকেই উন্নত। শতকরা প্রায় ৮০ জন লেবানিজ লিখতে পড়তে জানে কিন্তু আরবের অন্যান্য দেশগুলিতে এরূপ লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা শতকরা ১০ জনের বেশী নয়। রাজধানী বেইরুট শহর সমৃদ্ধ এবং সুশ্রী। এখানকার দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়—সেণ্ট জোসেপ বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় এ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। অধিবাসীদের অর্ধেক মুসলমান, বাকি অর্ধেক হ'ল খ্রীষ্টান।

খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ

লেবানিজদের প্রধান খাদ্যবস্তু হ'ল রুটি, আলু, মাখন, দুধ ও ফল। মাংসও প্রচলিত খাদ্য তবে তা সাধারণ খাদ্য-তালিকায় পড়ে না, তা হ'ল বিলাসের উপকরণ। পল্লী অঞ্চলের লোকেরা শহরের বাসিন্দাদের চেয়ে অসচ্ছল জীবন যাপন করে। শুষ্ক বৃষ্টিবিহীন অঞ্চলে জলকষ্ট আছে। অনেক সময় মেয়েদের অনেক দূর থেকে পাত্র ভ'রে জল নিয়ে আসতে হয়।

শহরে স্ত্রী-পুরুষ ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করে—প্যাণ্ট, সার্ট, জুতা, মোজা। কেউ কেউ প্যাণ্টের সঙ্গে ওভারকোটের বদলে উটের লোমে-তৈরি শাল পরে। পল্লীতে মেয়েরা পরে পা-জামা বা স্কার্টের সঙ্গে ঢিলা ব্লাউজ, সার্ট ও মাথায় দেয় ঘোমটার মত ওড়না। লেবাননে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ঘটেছে। অধিবাসীদের জীবন-যাপনে, পরিচ্ছদে, খাদ্যে, শিক্ষায় ইউরোপের ও এশিয়ার ছাপ সুস্পষ্ট।

লেবাননে পাঁচশো মাইলের মত রেলপথ আছে। দেশের ভিতরের পথগুলি সুন্দর, মোটর-চলাচলের বিশেষ উপযোগী। লেবানিজরা কর্মদক্ষ এবং উৎসাহী। বিদেশে গিয়ে অর্থোপার্জন ক'রে স্বদেশে ফিরে আসা এদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য।

ইস্রায়েল

যে দেশ পূর্বে প্যালেস্টাইন নামে পরিচিত ছিল তা একই সঙ্গে আরবের মরুভূমির পশ্চিম সীমা এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল। এই দিক দিয়ে প্যালেস্টাইন হ'ল এশিয়া এবং ইউরোপের মিলনভূমি। একে দুই মহাদেশেরই অন্তর্গত বলা যায়। ভূমির প্রকৃতি এবং জলবায়ুতে যেমন বিপরীত অবস্থা পাশাপাশি রয়েছে, তেমনি মানুষের

জীবন ও চিন্তাধারাতেও দেখা যায় বৈচিত্র্য। একদিকে মরু অঞ্চলের জলবায়ু—উষ্ণ বাতাস, বৃষ্টিহীন উষর প্রান্তর ; মরুবাসীর জীবনযাপন-রীতি, ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থা। অন্য দিকে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু—কোমল সূর্যকিরণ, মৃদু বৃষ্টিপাত ; নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের শস্য ও জীবজন্তু। খাড়া পাহাড় এবং গভীর পাষাণময় উপত্যকা দেশটিকে যেন চিরে ফালাফালা করেছে, আবার এক পাশে রয়েছে দীর্ঘ একটানা সমতলভূমি। প্যালেস্টাইনের ভৌগোলিক অবস্থা এমনি বিপরীতের সমন্বয়। দেশের অধিবাসীদের মধ্যে ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, সামাজিক আচার-ব্যবহার কোনটিই ঐক্যবদ্ধ জাতিগঠনের অনুকূল নয়। অধিবাসীর মধ্যে দুই জাতির লোকই প্রধান—আরব ও ইহুদি। এদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ক্রমে প্রবল হ'য়ে ওঠে। মিলেমিশে একই দেশে পাশাপাশি বাস করা, পরস্পর সহযোগিতা ক'রে দেশ শাসন করা এদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

অবশেষে রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইন দুই ভাগে বিভক্ত হয়—এক ভাগ ইহুদিদের রাষ্ট্র ইস্‌রায়েল, অন্য ভাগ আরব প্যালেস্টাইন। কিন্তু সীমানা নিয়ে গোলযোগ সুরু হ'ল এবং বেধে উঠলো নিজেদের মধ্যে হানাহানি, যুদ্ধ। উভয় পক্ষেরই রক্তপাত হ'ল। ১৯৪৯ সালে নূতন ক'রে সীমানা নির্ধারিত হ'ল—ইস্‌রায়েল হ'ল পৃথক রাষ্ট্র, প্যালেস্টাইনের আরব অংশ জর্ডানের অন্তর্ভুক্ত হ'ল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের সমুদ্রের তীরবর্তী গাজা অঞ্চল গেল মিশরের অধিকারে। আরব রাষ্ট্রগুলি—সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, সৌদি আরব, মিশর—সকলেই ইস্‌রায়েলীদের বিরোধী। বিধর্মী ইহুদিদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র ছেড়ে দেওয়াতে এদের ঘোরতর আপত্তি। ইস্‌রায়েলীদের প্রধান সহায় হ'ল ইউরোপ ও আমেরিকার খ্রীষ্টান রাষ্ট্রগুলি।

ইস্রায়েলের আয়তন ৮০৫০ বর্গমাইল। ভূমধ্যসাগরের উপকূল দিয়ে ১২০ মাইল দীর্ঘ এবং প্রায় ১৮ মাইল চওড়া একটি উর্বর সমতলভূমি বিস্তৃত রয়েছে। পূর্বদিকে তুইটি গিরিশ্রেণী উত্তরে সিরিয়ার পর্বত থেকে বের হ'য়ে দক্ষিণে মরু অঞ্চলে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই তুই গিরিমালার ভিতর দিয়ে ব'য়ে চলেছে জর্ডান নদী। এর খাত অত্যন্ত গভীর। টাইবেরিয়াস হ্রদের কাছে জর্ডান নদী সমুদ্রতল থেকে ৭০০ ফুট নীচ দিয়ে প্রবাহিত; মরু সাগরে গিয়ে নদীটি পড়েছে। সেখানে এর খাত সমুদ্রতল থেকে ১৩০০ ফুট নীচে। জর্ডান যেন পাতালের নদী! জর্ডান নদীর পশ্চিম দিকে যে পাহাড়ের শ্রেণী আছে আর মধ্যে একটি প্রশস্ত সমভূমি; নাম এসড্রায়েলন, আক্রা উপসাগর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তৃত। জর্ডান উপত্যকার অল্প অংশই পড়েছে ইস্রায়েলের ভাগ্যে, বেশীর ভাগ জর্ডান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সর্ব-দক্ষিণে রয়েছে নেগেব নামে ত্রিভুজাকার মরুসদৃশ অঞ্চল; এর এক প্রান্ত লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

ইস্রায়েলের রাজধানী জেরুসালেম দেশের প্রায় মাঝামাঝি একেবারে পূর্ব-সীমান্তে অবস্থিত। এ অঞ্চলটি উঁচু মালভূমি। এর উত্তরে এবং দক্ষিণে ভূমি ক্রমশঃ ঢালু হ'য়ে গেছে। এ অঞ্চলে জমি অসমান, পাহাড় প্রায়ই বৃক্ষহীন নিরেট প্রস্তর-স্তূপের মত, কদাচিৎ পাহাড়ের গায়ে দেখা যায় জলপাই গাছের বন। নিম্নভূমি বসন্তকালে সবুজ ঘাস ও ফুলে ছেয়ে যায়। বসন্তের শেষে আর কোন চিহ্ন থাকে না। সমভূমির প্রান্তর উর্বর এবং শস্য উৎপাদনের পক্ষে উৎকৃষ্ট। ইস্রায়েলীদের কাছে এ অঞ্চল 'তুধ ও মধুপূর্ণ', মনোরম আকর্ষণীয়। ইস্রায়েলের সমভূমিতে উৎকৃষ্ট ধরনের আঙুর, কমলালেবু, গম উৎপন্ন হয়। শুষ্ক পাহাড়ময় অঞ্চলে জন্মে জলপাই। বর্তমানে ইস্রায়েলের অধিবাসীরা জলসেচের ব্যবস্থা ক'রে এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে

ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি ক'রে ফসলের পরিমাণ বহুগুণ বেশী করতে সমর্থ হয়েছে।

ইহুদিদের কৃতিত্ব

প্যালেস্টাইন ভাগ ক'রে ইস্‌রায়েল রাষ্ট্র গঠিত হবার পর নূতন ছোট রাষ্ট্রের সামনে কতকগুলি বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন, জমির উর্বরতা বাড়িয়ে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা, পৃথিবীর নানাদেশ থেকে যে সকল ইহুদি স্বদেশে ফিরে আসে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, শত্রুবেষ্টিত হ'য়ে থেকে আত্মরক্ষার যোগ্য আয়োজন করা। ইহুদিরা অল্পকালের মধ্যেই সকল দিকেই যোগ্যতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে।

যে সকল অঞ্চল আগে ম্যালেরিয়াপূর্ণ ছিল সেখানকার জলাভূমি ভরাট ক'রে চাষের যোগ্য ক'রে তোলা হয়েছে। এখন সেখানে সোনা ফলে। ইস্‌রায়েলকে পৃথিবীর ইহুদিদের জাতীয় মাতৃভূমি ব'লে ঘোষণা করার ফলে ৭ লক্ষের বেশী ইহুদি বিদেশ থেকে ইস্‌রায়েলে বসবাস করতে এসেছে। দেশ-বিভাগের ফলে প্রায় ৮ লক্ষ আরব ইস্‌রায়েল ছেড়ে পার্শ্ববর্তী জর্ডান, মিশর, সিরিয়া ও লেবাননে চলে যায়। বিদেশ থেকে আগত ইহুদিরা আরবদের গ্রামগুলিতে সমবায়-প্রথায় কৃষিক্ষেত্র গ'ড়ে তোলে, আধুনিক ধরনের কৃষির যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে সুরু করে এবং বিবিধ প্রকার ফসল, শাক-সব্জী ও ফল উৎপাদন করতে থাকে। নূতন নাগরিকদের উদ্যম ও চেষ্টার কাছে প্রকৃতিও নত হয়; যেখানে আগে কিছুই উৎপন্ন হ'ত না সেখানেও ফসল ফলানোর কাজ চলে। আরব অধিবাসীরা সকলেই ইস্‌রায়েল ছেড়ে চলে যায়নি। এখনও ইস্‌রায়েলে প্রায় একশতটি গ্রামে এক লক্ষের ওপর আরব মুসলমান বাস করছে। ইস্‌রায়েলের লোকসংখ্যা ১৬ লক্ষ ৭ হাজার। এর মধ্যে ১৪ লক্ষ ৩০ হাজার ইহুদি। বাস্তুহারা হ'য়ে যে ইহুদিরা ইস্‌রায়েলে এসেছে তারা

দেশের সমৃদ্ধি গ'ড়ে তোলার কাজে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অর্থসাহায্য পেয়ে শরণার্থীরা জমি কিনে সমবায়-প্রথায় কৃষির প্রবর্তন করে। প্রথমে সাগর-তীরবর্তী উর্বর অঞ্চলে পরে দেশের অভ্যন্তরেও কৃষিক্ষেত্র ও ফলের বাগান রচনা করা হয়। এখন ভূমধ্যসাগরের তীরে বন্দর তেল-আবিব থেকে হাইফা, হাইফা থেকে টাইবেরিয়াস—সব দিকেই চাষের ক্ষেত আর ফলের বাগান চোখে পড়ে। আঙুর, কমলা ও অন্যান্য লেবু, খাদ্যশস্য, আলু ও অন্যান্য তরকারি উৎপন্ন করা হয় প্রচুর পরিমাণে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ ক'রে সকল বিষয়েই এরা সুফল পেয়েছে। ইস্রায়েলে এখন যে ভার্জিনিয়া তামাক উৎপন্ন করা হয় তা আসল ভার্জিনিয়ার চেয়ে উৎকৃষ্ট। কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পশুপক্ষী পালন সুরু করা হয়েছে; দক্ষিণ দিকে মরুপ্রায় নেগেব অঞ্চলে মেষ চারণ ও পালনের ব্যবস্থা হয়েছে। আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে কাজে ব্রতী হ'য়ে ইহুদিরা অল্পকালের মধ্যেই দেশে পুনর্বাসন ও খাদ্য-সমস্যার প্রায় সমাধান ক'রে ফেলেছে। আঙুর ও লেবু এদের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য; অন্যান্য জিনিসের উৎপাদন বৃদ্ধি ক'রে নিজেদের অতিরিক্ত লোকের চাহিদা মিটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিল্প

চাষ-আবাদের ক্ষেত্রে যেমন শিল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি ইহুদিরা অসাধারণ পরিবর্তন এনেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন জলপাই থেকে কেবল সাবান তৈরির কারখানা ছিল, তা-ও অতি সাধারণ উপায়ে। কিন্তু এখন বিদেশী মূলধনের সাহায্যে অনেকগুলি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কমলা ও অন্যান্য লেবু থেকে বিদেশে রপ্তানিযোগ্য খাদ্য, আঙুর থেকে সুরা, সিগারেট, বস্ত্র, রেশম-বস্ত্র, চামড়ার জিনিস, নকল দাঁত, দেশলাই, ধাতুদ্রব্য, আসবাব-পত্র প্রভৃতি ইস্রায়েলের রপ্তানি দ্রব্য। গৃহ-নির্মাণের উপযোগী দ্রব্য

উৎপাদনে ইস্‌রায়েল অল্পদিনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। বাসগৃহ, কারখানা, স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলতে যে উপাদান দরকার তা দেশেই উৎপাদন করা হয়।

নূতন রাষ্ট্র দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানোর চেষ্টায় কয়েকটি বড় শিল্প গ'ড়ে তুলেছে। তার মধ্যে প্রধান হ'ল মরু সাগরের লবণাক্ত জল থেকে খনিজ লবণ আহরণ করার কাজ। এইভাবে পানের অযোগ্য লবণতিক্ত জল থেকে যে পটাস্‌ যন্ত্রের সাহায্যে বের ক'রে নেওয়া হয় জমির সারহিসাবে তা খুব উপকারী। দেশে কয়লার একান্ত অভাব। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক'রে জ্বালানিহিসাবে কয়লার অভাব মিটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষি এবং শিল্প উভয় দিকে নজর নিয়ে নূতন রাষ্ট্র তার খাদ্য, পুনর্বাসন এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে তাদের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে একথা ঠিক যে, বিদেশ থেকে শরণাগত ইহুদি আসার আগে ইস্‌রায়েলে জীবন-যাত্রার মান যেমন ছিল এখনও তেমন হ'তে পারেনি। নূতন রাষ্ট্র গ'ড়ে তোলার কাজে একটি বড় অন্তরায় হ'ল সৈন্যবাহিনী আত্মরক্ষার জন্য সর্বদা মোতায়েন রাখা। যদিও বর্তমানে যুদ্ধ চলছে না তবু ইস্‌রায়েলের প্রতিবেশী রাষ্ট্র—মিশর, জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন—সকলেই এখনও শত্রুভাবাপন্ন; ইস্‌রায়েলের অস্তিত্বই এরা বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নয়।

এরূপ অবস্থায় ইস্‌রায়েলের সৈন্যবাহিনীকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। ১৮ থেকে ৪৫ বৎসর বয়স্ক সকল পুরুষ এবং ৩৪ বৎসর বয়স্কা সন্তান-হীনা স্ত্রীলোক নিয়ে সৈন্যদল গঠিত। বেশী বয়সের লোকদিগকে সংরক্ষিত বাহিনীতে রাখা হয় এবং প্রতি বৎসর একবার ক'রে তাদের অল্পকালীন ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ইস্‌রায়েলের সৈন্যদল পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সৈন্য থেকে কিছুটা বিশেষ ধরনের। এখানে

স্ত্রী-পুরুষকে কেবল ভালো সৈনিক হ'তেই শিক্ষা দেওয়া হয় না, তারা যাতে সু-নাগরিক হ'তে পারে সেরূপ ব্যবস্থাও করা হয়। প্রাথমিক ট্রেনিং-এর পর সৈন্যবাহিনীতে নূতন যোগদানকারীদের কয়েক মাস কৃষি উপনিবেশে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানে তারা শেখে চাষের কাজ, ভূগোল, হিব্রুভাষা, ইতিহাস এবং পৌরবিজ্ঞান। এ ছাড়া তাদের কারিগরি শিক্ষা এবং বিভিন্ন ব্যবসায় শিখানো হয় যাতে জীবিকা অর্জনের কোন পন্থা গ্রহণ করা সহজ হয়। ইস্‌রায়েলী সৈন্যদলে অনেকেই বিদেশ থেকে আগত ইহুদি। নূতন দেশের ভূগোল ও অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে নবাগতরা স্বজাতীয়দের সঙ্গে ভাবের এবং উদ্দেশ্যের মিল অনুভব করে।

তেল-আবিব ও হাইফা সাগরতীরের প্রধান বন্দর। জেরুসালেম জর্ডান সীমান্তে অবস্থিত রাজধানী। প্রাচীন জেরুসালেমের পাশেই পশ্চিম দিকে নূতন রাজধানী শহর গ'ড়ে তোলা হয়েছে। দেশের মধ্যে ৩২৫ মাইল রেলপথ ও ১৫০০ মাইল পাকা রাস্তা আছে। নূতন রাষ্ট্র লাভ ক'রে ইহুদিরা এর উন্নতির জন্য যেমন উদ্যমশীল, এর রক্ষার জন্যও তেমনি সদাপ্রস্তুত।

জর্ডান

ইস্‌রায়েলের মত জর্ডানও একটি নূতন রাজ্য। প্যালেস্টাইন ভাগ ক'রে এক ভাগ হয়েছে ইস্‌রায়েল, অন্য ভাগ জর্ডানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। জর্ডানের উত্তরে সিরিয়া, উত্তর-পূর্বে ইরাক, পূর্বে এবং দক্ষিণে সৌদি আরব, পশ্চিমে ইস্‌রায়েল। দেশের আয়তন ৩৭,৭০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ।

জর্ডানের পশ্চিম সীমান্তের মাঝামাঝি মরু সাগর। জর্ডান নদী এসে এতে পড়েছে। মরু সাগর থেকে কোন নদী বেরিয়ে যায়নি। এটি

সমুদ্র-সমতল থেকে ১৩০০ ফুট নীচু। প্রচণ্ড সূর্যতাপে মরু সাগরের জল বাষ্প হ'য়ে উঠে যায়; জল এমন তীব্র লবণাক্ত যে এতে কোন প্রাণী বাঁচতে পারে না। এমন কি কোন কিছু ডোবেও না এর জলে।

সমগ্র জর্ডান দেশটি উচ্চ মালভূমি, পাহাড়ময়। সমুদ্র-সমতল থেকে প্রায় ৩ হাজার ফুট উঁচু; পশ্চিম দিকে অকস্মাৎ নীচু হ'য়ে এসে মরু সাগরের কাছ দিয়ে গভীর খাতের মত সৃষ্টি হয়েছে। সমগ্র জর্ডানে কেবল জর্ডান নদী ও কয়েকটি উপনদী ছাড়া অন্য কোন অঞ্চলে নদী নাই। প্রধান উপনদী জেরকা পাষাণময় স্থানের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে এসে জর্ডান নদীতে পড়েছে।

জর্ডানের যে কয়টি শহর আছে তা উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত। দক্ষিণে পাষাণময় অঞ্চল, পূর্বে বিস্তীর্ণ মরুভূমি সৌদি আরব পর্যন্ত প্রসারিত। তরুহীন বালুর সমুদ্র। যতদূর চোখ যায় কেবল অন্তহীন বালি। লোকে বলে 'শূন্য দেশ'। জর্ডানের উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রচুর বৃষ্টি হয়। যতই পূর্বে অগ্রসর হওয়া যায় ততই বৃষ্টিপাত কম। মরু অঞ্চলে কোনদিনই আকাশ থেকে জল পড়ে না। দেশটি দরিদ্র। দেশের সম্পদ মাটি এখানে রুক্ষ, অকরুণ। দেশের মাত্র ৫ ভাগ জমি কৃষিকাজের উপযোগী; বাকি ৯৫ ভাগ বন্ধ্যা, ফসলহীন। জলের অভাব অত্যন্ত বেশী। চাষী ফেলাহীনরা সুড়ঙ্গ কেটে মাঠে জল আনার ব্যবস্থা করে। একে বলে কানাট। প্রথমে কূয়া খুঁড়ে জল পর্যন্ত পৌঁছে তারপর সেই কূয়ার সোজা আর একটি কূয়া খুঁড়ে এবং সুড়ঙ্গ কেটে একটি অন্যটির সঙ্গে যোগ ক'রে দেয়। এমনিভাবে মাটির নীচ দিয়ে খাল কেটে কেটে চাষী তার জমি পর্যন্ত নিয়ে যায়। কূয়া আর সুড়ঙ্গের মাটি ওপরে তুলে কূয়ার মুখের চারদিকে ঢিপি ক'রে রাখে। এইভাবে কয়েকশো গজ পর পরই কূয়া খুঁড়তে হয়।

জর্ডানে প্রাকৃতিক সম্পদ খুবই কম। কোন শিল্প নাই, ব্যবসায়-বাণিজ্য চালানোর মত দ্রব্য দেশে উৎপাদন হয় না। যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় এবং যেখানে সুড়ঙ্গের সাহায্যে জলসেচ করা সম্ভবপর সেখানে গম, যব, আঙুর উৎপাদন করা হয়। ছাগল, ভেড়া, উট প্রভৃতি পশুপালন অনেক লোকের উপজীবিকা। দেশে অর্থশালী লোক খুব কম। অধিবাসীদের বেশীর ভাগই বেদুইন যাযাবর। তারা দল বেঁধে ছাগল, ভেড়া নিয়ে দেশের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। পানীয় জল আর পশুচারণের জন্য ঘাসের জমির সন্ধানে তারা ফেরে। এর খোঁজে তারা অনেক সময় দূর-দূরান্তে এমন কি অন্য দেশের এলাকার মধ্যেও চলে যায়।

জর্ডানের ইতিহাস

রাজ্য-হিসাবে জর্ডান নূতন হ'লেও যে অঞ্চল নিয়ে এদেশ গঠিত তার ইতিহাস প্রাচীন। জর্ডান ছিল প্যালেস্টাইনের অংশ। প্যালেস্টাইন ষোড়শ শতাব্দী থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ অবধি তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সিরিয়ার রাজা প্রথম ফৈজাল প্যালেস্টাইন অধিকার ক'রে নেন কিন্তু তা অল্পকালের জন্য। ফরাসীগণ আক্রমণ ক'রে রাজা ফৈজালকে প্যালেস্টাইন ত্যাগ করতে বাধ্য করলে ইংরাজগণ দেশটি অধিকার ক'রে নেয় এবং আশ্রিত রাজ্য-হিসাবে শাসন করতে থাকে। তখন একে বলা হ'ত ট্রানস্-জর্ডান। ১৯২৩ সালে বৃটিশ সরকার হাশেমী বংশের আবদুল্লাকে জর্ডানের রাজা ব'লে স্বীকার ক'রে নেয়। এর পরিবর্তে বৃটেন জর্ডানে ইংরাজ সৈন্য মোতায়েন রাখার অধিকার এবং আরো কতক সুবিধা লাভ করে। জর্ডান প্রথম দিকে ছিল এক রকম শৃঙ্খলাবিহীন রাজ্য; কার্যকরী শাসন-ব্যবস্থা ছিল না, দেশের অধিবাসী ছিল অত্যন্ত দরিদ্র; বেদুইন-গণ শাসন-শক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যেখানে-সেখানে লুঠপাট ক'রে বেড়াত; কোন আইন-কানুন তারা মানত না।

বৃটেন প্রথমে জর্ডানে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রবর্তন করে। বেদুইনদের অত্যাচার কঠোর হাতে দমন করা হয়, প্রজার জমি-সম্পত্তির সীমানা নির্ধারণ ক'রে দেওয়া হয়, রাজ্য-শাসনের ব্যয় বহনের জন্য প্রজার ওপর কর বসানো হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে অরাজকতা দূর ক'রে শাসন-নীতি চালু করা হয়। এ-সব ব্যাপারে সৈন্যদল বিশেষ সহায়ক হয়। ক্যাপ্টেন পিক নামক একজন ইংরাজ আরব বাহিনী (Arab Legion) গ'ড়ে তোলেন। সামরিক শৃঙ্খলা ও তৎপরতায় এই বাহিনী সুখ্যাতি অর্জন করে।

১৯৪৬ সালে জর্ডান একটি রাজ্য ব'লে ঘোষিত হয় এবং রাজা আবদুল্লা বৃটেনের সঙ্গে মিত্রতার সন্ধি স্থাপন করেন। ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইন ভাগ ক'রে ইস্‌রায়েল রাষ্ট্র গঠন করা হ'লে সীমানা নিয়ে যুদ্ধ বেধে যায়। আরব রাষ্ট্রগুলি দাঁড়ায় ইস্‌রায়েলের বিরুদ্ধে। তখন জর্ডানের 'আরব বাহিনী' বিশেষ শক্তি ও কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। আবদুল্লা এই অঞ্চলে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গ'ড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছিলেন। সিরিয়ার প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সহায়তা পেয়ে এবং আরব বাহিনীর সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর ক'রে তিনি পরিকল্পনা করেন সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, জর্ডান প্রভৃতি দেশ নিয়ে এক 'বৃহত্তর সিরিয়া' স্থাপন করবেন। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তিনি ইস্‌রায়েলীদের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা করতেও প্রস্তুত ছিলেন। আবদুল্লার এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দাঁড়াল মিশর ও সৌদি আরব। দেশের মধ্যে চক্রান্ত ও দলাদলি সুরু হ'ল। ১৯৫১ সালে রাজা আবদুল্লা আততায়ীর হাতে নিহত হলেন; এই সঙ্গে বৃহত্তর সিরিয়া গঠনের পরিকল্পনারও অবসান ঘটলো। রাজা আবদুল্লার পুত্র হোসেন হলেন জর্ডানের রাজা।

'আরব বাহিনী' কেবল যে যুদ্ধক্ষেত্রেই শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছিল তা নয়, দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রেও এদের প্রভাব খুব বেড়ে যায়। এই সময়

একজন মেজর জন গ্লাব্ নামে একজন ইংরাজ ছিলেন বাহিনীর অধিনায়ক। জর্ডানে গ্লাবের প্রতিপত্তি হয়েছিল অসাধারণ। জনসাধারণের কাছে তিনি গ্লাব্ পাশা নামে পরিচিত ছিলেন। রাজা হোসেন ইংরাজদের কূটনীতিতে বিরূপ হ'য়ে বৃটেনের সঙ্গে মিত্রতার সন্ধি লোপ ক'রে দেন এবং অধিনায়ক গ্লাব্‌কে পদচ্যুত ক'রে নিজের লোককে সে পদে নিযুক্ত করেন এবং প্রকারান্তরে আরব বাহিনীর ওপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। জর্ডানের আর্থিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে বিদেশী শক্তি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রভৃতি—মধ্য-প্রাচ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা ক'রে চলেছে। বৃটেনের প্রভাব কিছুটা ক্ষুণ্ণ হওয়ার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থসাহায্য করার প্রস্তাব নিয়ে জর্ডানে এবং অন্যান্য আরব রাষ্ট্রে নিজের প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টায় আছে। মধ্য-প্রাচ্যের খনিজ তৈল-সম্পদ, রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্যের অভাব এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও দলাদলির জন্য বিদেশী কতক রাষ্ট্র এখানে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করছে। এর ফলে এ অঞ্চলে অশান্তি ও আন্দোলন প্রায় লেগেই আছে।

জর্ডানের প্রায় সকল অধিবাসীই মুসলমান। রাজধানী আম্মানের লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৭০ হাজার। রাজ্যের মধ্য দিয়ে একটি রেলপথ আম্মান থেকে দামাস্কাস পর্যন্ত গেছে। পাকা রাস্তা ৪২২ মাইলের মত। জর্ডানের লোকেরা পাথর বড় বড় ইটের মত ক'রে কেটে তা দিয়ে ঘর তৈরি করে। দেশে তো পাথরের অভাব নাই। মিস্ত্রীরা বাটালি দিয়ে কেটে পাথরের ইটগুলি সমান আকারের ও মসৃণ করে।

সৌদি আরব

আরব একটি উপমহাদেশ। আয়তনে প্রায় ভারতের সমান। কিন্তু লোকসংখ্যা মাত্র ৬০ লক্ষ। এর বেশীর ভাগ স্থানই মরুভূমি, কেবল

এক-তৃতীয়াংশ ভূমিতে স্থায়ী বাসিন্দা আছে। আরবে বিস্তৃত বালির মরুভূমি আছে, আবার পাষাণময় শুষ্ক অঞ্চলও আছে যেখানে মাঝে মাঝে অল্প-স্বল্প ঘাস এবং ছোট ছোট ঝোপ দেখা যায়। মরু অঞ্চলের মধ্যে মধ্যে আছে মরূদ্যান—চারিদিকের শূন্যতার মধ্যে সতেজ খেজুর-কুঞ্জ এবং সবুজ ঘাসে-ঢাকা মাঠ। কোথাও আছে বিস্তীর্ণ উপত্যকা; গাছপালা সেখানে সবুজের ছোপ লাগায়। আরব বেদুইনরা সেখানে তাদের ছাগল, ভেড়া, উটের দল চরায়। মরুভূমি, মরীচিকা, মরূদ্যানের দেশ আরব একদিকে যেমন রহস্যময়, অন্য দিকে জগতের মুসলমানদের কাছে তেমনি প্রিয় এবং পবিত্র। আরবের মক্কা নগরী ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের জন্মস্থান; মদিনাতে আছে তাঁর সমাধি। প্রতি বৎসর এক লক্ষেরও বেশী মুসলমান এই দুই তীর্থস্থান দর্শন করতে যায়।

আরবের পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্বে পারস্যোপসাগর, দক্ষিণে আরব সাগর, উত্তরে ইস্রায়েল, জর্ডান এবং সিরিয়ার মরুভূমি; উত্তর-পূর্বে ইরাকের শস্যশ্যামল উর্বর উপত্যকা। লোহিত সাগরের ধারে পশ্চিম উপকূলে হেজাজ প্রদেশ। এখানে মক্কা ও মদিনা এবং এই দুই তীর্থে যাওয়ার একমাত্র বন্দর জেদ্দা অবস্থিত। আরবের মধ্যভাগে এবং পূর্বে পারস্যোপসাগরের দিকে বিস্তৃত প্রদেশের নাম নেজ্‌দ। হেজাজ এবং নেজ্‌দ সৌদি আরবের দুইটি প্রধান বিভাগ। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে ছোট একটি রাজ্য—ইয়েমেন। প্রাচীন রোমানদের যুগ থেকেই এটি Arabia Felix অর্থাৎ সৌভাগ্যশালী আরব নামে পরিচিত। কারণ আরবের অন্যান্য অংশের মত এ অঞ্চল বৃষ্টিহীন, অনুর্বর মরুভূমি নয়। এখানে বৃষ্টিপাত হয়, জমি উর্বর এবং লোক-বসতি অনেক।

সৌদি আরবের পত্তন

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে প্রায় সমগ্র আরবদেশ তুরস্কের অধীন ছিল। কিন্তু তখন থেকেই আমীর ইবন্ সৌদ নেজ্‌দ অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য গঠন ক'রে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত তা বিস্তৃত করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আব্‌দুল ওয়াহাব নামে এক ব্যক্তি আরব মুসলমানদের মধ্যে একটি নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সাধু দরবেশদের কবর-পূজা ও অন্যান্য কতকগুলি ধর্মাচরণের ক্রিয়া বন্ধ ক'রে ইসলাম ধর্মের সংস্কার সাধন করা। এই সম্প্রদায় ওয়াহাবী সম্প্রদায় নামে পরিচিত। খ্রীষ্টানদের মধ্যে ক্যাথোলিকরা যেমন ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষদের মূর্তি ও অন্যান্য প্রতীকের পূজা করে ব'লে পিউরিট্যানরা এর প্রতিবাদে নূতন দল গঠন করে, ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যও তেমনি। ইবন্ সৌদ এই সম্প্রদায়ের প্রধান। আরবে রাজনৈতিক দলাদলি ছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ধর্মসম্প্রদায়গত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমে প্রবল হ'য়ে ওঠে।

প্রথম মহাযুদ্ধ চলার সময় আরব হ'য়ে উঠলো বৃটিশ কূটনীতি ও চক্রান্তের প্রধান কেন্দ্র। আরবের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে বৃটেন তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে উৎসাহ দিতে থাকে। বিভিন্ন প্রধান ব্যক্তিদের নানাপ্রকার লাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং প্রচুর অর্থ-সাহায্য ক'রে এদের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ইন্ধন যোগানো হয়। এমন কি আরবের যে যে গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে বিবাদে রত ছিল তাদের সকলকেও অর্থসাহায্য করা হয়। বৃটিশের প্ররোচনায় মক্কার শেরিফ হোসেন তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন হজরত মহম্মদের বংশধর। ইংরাজদের কাছ থেকে তিনি এই প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন যে, তাঁকে সম্মিলিত আরব রাষ্ট্রের সুলতান ক'রে দেওয়া হবে।

তুরস্কের সুলতান কেবল আরবের সম্রাটই ছিলেন না, তিনি ছিলেন খলিফা, মুসলমানদের ধর্মজগতের প্রধান। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় শেরিফ হোসেন আরবের এবং অন্যান্য দেশের মুসলমানদের কাছে অপ্রিয় হ'য়ে ওঠেন। ইবন্ সৌদ এই সময়ে ইংরাজদের কাছ থেকে মাসিক ৭০ হাজার টাকা সাহায্য লাভ ক'রে নিজে নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি দেন এবং নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন।

যুদ্ধে মিত্রশক্তি জয়লাভ করে। যুদ্ধের পর বৃটেন শেরিফ হোসেন ও ইবন্ সৌদকে হাতের পুতুলের মত ব্যবহার ক'রে সমগ্র আরবে সর্বময় কর্তৃত্ব লাভের চেষ্টা সুরু করে। শেরিফ হোসেন ও তাঁর পুত্রদের বিভিন্ন রাজ্যে রাজপদ দিয়ে দেওয়া হ'ল—হোসেন হলেন হেজাজের রাজা, এক ছেলে ফৈজালকে দেওয়া হ'ল সিরিয়ার সিংহাসন এবং অন্য ছেলে আবদুল্লা পেলেন ট্রানস্-জর্ডান। আরবে বৃটেন এমনি শক্তিমান হ'য়ে পড়লো যে যাকে খুশি তাকেই যেন রাজা ক'রে দিতে পারে! কিন্তু ভোজবাজীর ভেল্কির মত সিংহাসন বিলি করা বেশী দিন চললো না। ফরাসীরা সিরিয়া থেকে ফৈজালকে বিতাড়িত করলো; হোসেনের রাজত্বও অল্পদিনের মধ্যে বিলীন হ'য়ে গেল গল্পের আবু হোসেনের একদিনের বাদশাগিরির মত। আরবের অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে ইবন্ সৌদ হেজাজ আক্রমণ করলেন। হোসেন জনসাধারণের সমর্থন হারিয়েছে দেখে চতুর ইংরাজগণ তাঁর অর্থসাহায্য বন্ধ ক'রে দেয়। অসহায় তিনি ওয়াহাবী সৈন্যদলের সামনে টিকতে পারলেন না। হেজাজ থেকে হোসেন বিতাড়িত হ'লেন; মক্কা, মদিনা ও জেদ্দার ওপর ইবন্ সৌদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এইভাবে তিনি ইয়েমেন ছাড়া প্রায় সমগ্র আরবের শাসন-ক্ষমতা লাভ করলেন। ইবন্ সৌদ তাঁর অধিকারভুক্ত রাজ্যের নাম দিয়েছেন সৌদি আরব।

অধিবাসী

আরব মুসলমানদের দেশ। এদের মধ্যে দুইটি সম্প্রদায়—শিয়া ও সুন্নী। আরবের অধিবাসীদের দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায় —মোটামুটি স্থায়ী বাসিন্দা যারা শহরে বন্দরে এবং তার কাছাকাছি বসবাস করে কিংবা জমি চাষ ক'রে জীবিকা অর্জন করে; আর আছে চির-ভ্রাম্যমাণ বেদুইন দল, এরা নিজেদের পালিত পশু ও পরিবার-পরিজন নিয়ে স্থান হ'তে স্থানান্তরে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়।

আরবদের পোষাক স্ত্রী-পুরুষের প্রায় একই রকম—সার্ট, ঢিলা পায়জামা কোমরে ফিতা দিয়ে বেঁধে রাখা হয়, তার ওপর ঢিলে-হাতা আলখাল্লা। আলখাল্লার ওপর রঙিন চাদরের মত উত্তরীয় পরা হয়। মাথায় বড় রুমালের মত একটি কাপড়, চাঁদির ওপর পশমের সূতায় পাকানো দড়ি দিয়ে দুটি গোলাকার ফিতার চাকা আট্‌কানো। এর সাহায্যে ঘেরাটোপটি মাথায় পরতে সুবিধা হয়। আরবদেশের প্রচণ্ড সূর্যের তাপ থেকে চোখ-মুখ রক্ষার জন্য এমনি আবরণ একান্ত প্রয়োজন। লোকেরা পায়ে স্যাণ্ডেল পরে; দিনের বেলায় খালি পায়ে চলাফেরা করা এক রকম অসম্ভব। তাতে পায়ে ফোস্কা পড়বে নিশ্চয়।

বাড়ী-ঘর আরবের সর্বত্র একই রকম নয়। যে অঞ্চলে চূণাপাথর পাওয়া যায় সেখানে পাথর দিয়ে তৈরি হয় ঘর। কোথাও কোথাও উট-ছাগল-ভেড়ার চামড়া বা লোম দিয়ে তৈরি তাঁবুই লোকেদের ঘর। শহরে গেলে দেখতে পাই চার রকমের বাসগৃহ। ধনীদের বাড়ী-ঘর সুন্দর, ইট-পাথরের তৈরি; চমৎকার কাঠের কারুকার্য-করা আসবাবপত্র, দেওয়াল। সাধারণ লোকেরা থাকে মাটির ঘরে; ছাদ সমতল—কাঠ ও নলখাগড়া বিছিয়ে তার ওপর মাটি লেপে দিয়ে সমান-করা। গরীবরা নলখড় মাটি দিয়ে কুঁড়েঘর তৈরি করে।

দূর অঞ্চল থেকে যারা ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে অল্পদিনের জন্য আসে তারা শহরের বাইরে তাঁবু খাঁটিয়ে বাস করে। শহরের মধ্যে আছে উচ্চ মিনারওয়ালা মসজিদ। সেখান থেকে দিনরাত্রিতে পাঁচবার নমাজ পড়ার জন্য মসজিদের মুয়াজ্জিন উচ্চকণ্ঠে আহ্বান জানায়।

হাট-বাজারের দিনে আরবদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। অনেক দূর দূর থেকে লোকে হাটে আসে—পায়ে হেঁটে, উটে বা ঘোড়ায় চ'ড়ে। কেউ আসে জিনিস কিনতে, কেউ আসে বিক্রি করতে। চাটাই ও মাদুরের অস্থায়ী তাঁবু খাঁটানো হয় অনেকখানি জায়গা জুড়ে। নানারকম জিনিসের সমাবেশ—পশম, পশমী ও সূতী কাপড়, মাদুর, চাটাই, খেজুরপাতা, স্তূপীকৃত খেজুর, আঙুর, ন্যাসপাতি, তরমুজ প্রভৃতি নানা জাতীয় ফল, ছাগল, ঘোড়া, উট, ভেড়া প্রভৃতি পালিত প্রাণী। এ ছাড়া আছে স্থায়ী দোকানদারের মালপত্র—পিতল-কাঁসা-তামার বাসন-কোসন, খাদ্যবস্তু, কলকব্জা ইত্যাদি। হাটে সমবেত কত রকমের লোক—দর্জি, কুমার, কামার, মিস্ত্রী, চাষী। হাজার লোকের কল-কোলাহলে স্থান মুখরিত হ'য়ে ওঠে।

আমরা যারা বারো মাস স্থায়িভাবে একই স্থানে সামাজিক জীবন যাপন করি, তাদের কাছে আরবের মরুচারী লোকেদের জীবন রহস্যময় আকর্ষণীয় মনে হয়। তাদের জীবনে রয়েছে চলার গতি, নূতন নূতন পরিস্থিতির মধ্যে জীবন-যাপনের রোমাঞ্চকর অনুভূতি। অবস্থাপন্ন আরবদের শিবির-জীবনে রুচি ও বিলাসিতার অভাব নাই। তাঁবুগুলি সুন্দর। দেওয়ালে চমৎকার কারুকার্য-করা। মেঝেতে গালিচা বিছিয়ে এক পাশে অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য তাকিয়া ও মখমলের আসন পেতে দেওয়া। তাঁবুর দেওয়ালে মেয়েদের তৈরি নানা প্রকার সূচীকাজ ঝুলিয়ে দিয়ে কক্ষের সৌন্দর্য বাড়ানো হয়।

দেওয়ালের সঙ্গে আরো দেখা যাবে বন্দুক, অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিপাটি ক'রে সাজানো। মেঝেতে পানপাত্র সাজানো—কফি ও উটের দুধই প্রিয় পানীয়।

আরবদের প্রধান খাদ্য হ'ল ছাগল-ভেড়ার মাংস, ভাত, রুটি, খেজুর, দুধ দিয়ে তৈরি পিঠা। উপকূলের কাছাকাছি মেলে মাছ। উটের দুধ প্রিয় পুষ্টিকর খাদ্য। পিপাসার্ত হ'লে জলের পরিবর্তে একজন আরব বরং এক ভাঁড় উটের দুধ ঢক্ ঢক্ ক'রে খেয়ে ফেলবে। কোন উৎসবের সময় এরা চাল ও মাংস দিয়ে পোলাও-এর মত উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করে। খাওয়া হ'য়ে গেলে পিতলের তামার পাত্র একে একে সকলের কাছে নেওয়া হয়, তাতে তারা হাত-মুখ ধুয়ে ফেলে।

ভ্রাম্যমাণ আরবদের দলে কখন কখনও এক হাজারেরও বেশী উট, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশু থাকে। এরা দলপতির সঙ্গে সপরিবারে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে জল ও পশু-চরানোর উপযোগী ঘাস মেলে সেখানে তারা তাঁবু ফেলে কিছুদিন কাটায়। ঘোড়ায় চ'ড়ে একজন স্থান নির্বাচনের জন্য বাহিনীর আগে আগে চলে এবং যে স্থান উপযোগী মনে হয় সেখানে ঘাসের ওপর একখানা চাদর বিছিয়ে রাখে। তা থেকেই বোঝা যাবে সে স্থানটি নির্বাচিত হ'য়ে গেছে, অন্য দলের কেউ সেখানে এসে আর তাঁবু খাঁটাবে না।

দল যখন চলে, শেখ (দলপতিকে আরবরা শেখ বলে) আগে আগে চলে ঘোড়ায় চ'ড়ে। পরিবারের স্ত্রীলোকেরা থাকে উটের পিঠে, চারিদিক-ঘেরা ডুলির মধ্যে। উট যখন চলে ডুলিতে লাগে ঝাঁকানি। পথ উঁচু-নীচু হ'লে ঝাঁকানির মাত্রাও সেই অনুপাতে বাড়ে। মহিলারা পর্দানশীন কিন্তু দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় তাদের কম পরিশ্রমের কাজ করতে হয় না। উটের পিঠে মালপত্র তোলা এবং নামানো,

সাময়িক সংসার গুছিয়ে নেওয়া, রান্নার যাবতীয় কাজকর্ম করা মেয়েদের। অবসর সময়ে তারা পশমের সূতা কাটে, তাঁবুর কাপড় বোনে, সেলাই-এর কাজ করে।

জলের অভাবে আরবে ফসল ফলানো অসম্ভব হ'য়ে পড়ে, জলের অভাবে গাছপালাও জন্মানো কঠিন। যেখানে ভূমির কিছুটা নীচেই জলের স্তর সেখানে ঝোপগাছ জন্মে, খেজুরগাছ বেড়ে ওঠে, মরূদ্যানের সৃষ্টি হয়। রাজা ইবন্ সৌদ আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে নলকূপের সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা ক'রে অনেক জায়গায় ফসল উৎপাদনের সুযোগ ক'রে দিয়েছেন। পশুর খাদ্যের সন্ধানেই বাধ্য হ'য়ে কতক আরব যাযাবর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়। কৃষিকাজের এবং পশুচারণের স্থায়ী সুযোগ ক'রে দিয়ে রাজা সৌদ অনেক বেদুইনকে স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত করেছেন। নেজ্‌দ অঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকায় কল চালিয়ে ভূমি সমতল ক'রে পাম্প ও পাইপের সাহায্যে জমিতে জলসেচ ক'রে অফলা মাটি থেকেও ফসল তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। জমি চাষের জন্য ক্রমশঃই বেশী সংখ্যায় কলের লাঙ্গল ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু বলদ ও উটের সাহায্যে চাষ করার প্রাচীন পদ্ধতিও চলেছে এখনও।

সৌদি আরব যদিও একই রাজার অধীনে তবু এর মধ্যে দুইটি রাজ্য—হেজাজ এবং নেজ্‌দ। রাজধানীও দুইটি—হেজাজের রাজধানী মক্কা, নেজ্‌দের রাজধানী রিয়াধ্। নেজ্‌দে রাজা একাই সর্বেসর্বা, তিনি তাঁর প্রজাবর্গের প্রধান। হেজাজে মন্ত্রিসভা এবং একজন প্রেসিডেণ্ট নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র। একজন রাজপুত্রই সাধারণতঃ প্রেসিডেণ্ট। ইবন্ সৌদ হেজাজের রাজা এবং নেজ্‌দের রাজা। ইসলামের শরিয়ৎ অর্থাৎ কোরানের নিয়ম-কানুন অনুসারে বিচারপতির অধীনে আদালতে বিচারের ব্যবস্থা আছে।

নেজ্‌দের উৎপন্ন দ্রব্য খেজুর, গম, যব, আঙুর, তরমুজ প্রভৃতি ফল। পশুপালন অনেক লোকের উপজীবিকা। পশম, চামড়া, ঘি, মাংস পাওয়া যায় এই সব পশু থেকে। হেজাজের উৎপন্ন দ্রব্য প্রধানতঃ খেজুর, মধু ও ফল। প্রতি বছর মক্কা ও মদিনাযাত্রীদের কাছ থেকে পাওয়া শুল্ক সরকারের বেশ মোটা পরিমাণ রাজস্ব আদায় হ'য়ে থাকে। দেশের অভ্যন্তরে রাস্তাঘাট বেশী নাই। তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতের জন্য রেলপথ ও মোটর-পথ আছে। তীর্থযাত্রীদের ওপর যাতে বেদুইন দস্যুদের উপদ্রব না হয় সেজন্য বর্তমান সরকার বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

আরবের প্রান্তিক দেশ

আরবের বেশীর ভাগ অংশ সৌদি আরবের রাজ্যভুক্ত। দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের উপকূলবর্তী অংশে কতকগুলি ছোট ছোট অঞ্চলে বৃটিশের প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তৃত হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে; এখনও তা বজায় রয়েছে। আরবের মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলে শস্য-সম্পদ না থাকলেও মাটির নীচে আছে তৈল-সম্পদ। এরই লোভে পাশ্চাত্য দেশগুলির দৃষ্টি পড়েছে এদেশের ওপর।

এডেন

আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে লোহিত সাগরের প্রবেশের মুখে অবস্থিত বন্দরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এডেন ও তার পার্শ্ববর্তী স্থান—ছোট এডেন, শেখ ওথ্‌মান এবং ইমাদ ও হিসোয়া গ্রাম—বৃটিশের অধিকারে। এর আয়তন প্রায় ৭৫ বর্গমাইল। পূর্বে ভারত যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তখন এডেন ছিল ভারত সরকারের শাসনাধীন। ১৯৩৭ সাল থেকে এডেন খাস বৃটিশ সরকারের অধীনে ক্রাউন কলোনী হিসাবে শাসিত হচ্ছে। পেরিম দ্বীপ, সকোত্রা দ্বীপ

ও কুরিয়া মুরিয়া দ্বীপগুলিও এই ক্রাউন কলোনীর অন্তর্গত। সমুদ্রগামী জাহাজ এডেন বন্দর থেকে জ্বালানি তেল ও কয়লা নিয়ে থাকে। ভূমধ্যসাগরের প্রবেশ-পথে জিব্রাল্টার দ্বীপ এবং লোহিত সাগরের প্রবেশ-পথে এডেন বন্দর বৃটিশের সুরক্ষিত ঘাঁটি।

এডেনের বাইরেও আরবের উপকূলস্থ কতক অংশ বৃটিশের আশ্রিত অঞ্চল আছে। এর আয়তন হবে প্রায় ৪০ হাজার বর্গমাইল। আরবের ভিন্ন ভিন্ন বেদুইন সম্প্রদায় তাদের দলপতি শেখের অধীনে বাস করে। এই বেদুইন শেখেরা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হ'লেও বৃটিশের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক বজায় রেখে চলে।

হাদ্রামৎ

আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে হাদ্রামৎ রাজ্যে বেদুইনদের বাস। উপকূল দিয়ে দীর্ঘ বালিয়াড়ি, তার উত্তর দিক দিয়ে উপত্যকা ভূমি। উপত্যকা পার হ'য়ে গেলেই সুরু হয় আরবের বিরাট মরুভূমি। উত্তর দিকের দিগন্ত-বিস্তৃত মরু ও দক্ষিণে বালির বাঁধের মত দীর্ঘ বালুকাময় দেওয়ালের মধ্যবর্তী অংশ উর্বর ও লোক-বসতির যোগ্য। এই অঞ্চলে বেদুইনরা অন্য এলাকার বেদুইনদের মত যাযাবর নয়। এরা নিজেদের পরিবার-পরিজন ও পালিত পশু নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে না বেড়িয়ে এক স্থানেই বাস করে। কাদা-মাটির ঘর কিংবা পাহাড়ের গুহা এদের বাসগৃহ।

ওমান ও মস্কট

আরবের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে স্বাধীন রাজ্য ওমান ও মস্কট। আয়তন প্রায় ৮২ হাজার বর্গমাইল, লোকসংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষ। শাসনকর্তাকে বলা হয় সুলতান। ওমানের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হ'ল খেজুর। লোকেদের জীবিকার উপায় হ'ল খেজুর-চাষ ও উট-পালন। ইয়েমেন

যেমন কফি উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ, ওমান তেমনি প্রসিদ্ধ এখানকার উৎকৃষ্ট খেজুরের জন্য। খেজুর, বেদানা, লেবু, শুক্‌না মাছ এখান থেকে রপ্তানি হয় আর আমদানি করা হয় চাউল ও কফি। রাজধানী মস্কট সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। এখানে উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় আছে। মস্কট শহর দেশের অভ্যন্তর দিক থেকে এমন পাহাড়-পর্বত দিয়ে ঘেরা যে, তা পার হ'য়ে যাওয়া একরকম দুঃসাধ্য।

মস্কটের সুলতান নামে মস্কট ও ওমানের শাসক হ'লেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর শাসন উপকূলবর্তী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। দেশের অভ্যন্তরে বিশেষ ক'রে ওমানের পাহাড়ময় দুর্গম অংশে সুলতানের কর্তৃত্ব নাই। ওমানের ইমাম প্রায় ৪০ বৎসর যাবৎ অভ্যন্তরের অঞ্চলে শাসন পরিচালনা করছেন। ওমানের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই মুসলমান। এদের মধ্যে ইবাটিয়া সম্প্রদায়ের লোকেই বেশী। এদের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা অনুসারে এরা ধর্মগুরু বা ইমাম নির্বাচন ক'রে থাকে। মস্কটের সুলতানের সঙ্গে ইমামের বিরোধ অনেক দিন থেকে চলে আসছে। ওমানের ওপর সুলতানের কর্তৃত্ব ইমাম এবং তাঁর অনুগত লোকেরা মেনে নিতে রাজী নন। ১৯১৩ সালে বিদ্রোহের পর ইমাম রাজনৈতিক শাসন-ক্ষমতা লাভ করেন এবং এই শর্তে সন্ধি হয় যে, ইমামের এলাকার শাসন-ব্যাপারে মস্কটের সুলতান কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবেন না।

এর পর ইমাম ঘালিব ইবন্ আলি ওমানকে একটি স্বাধীন আরব রাজ্যে পরিণত করার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁর ভাই শেখ তালিব এই কাজে তাঁর প্রধান সহায়। কিন্তু বিদেশীর স্বার্থ জড়িত হ'য়ে পড়ায় ইমামের পক্ষে প্রবল বাধার সৃষ্টি হয়। আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে মাটির নীচে তেলের খনি থাকায় বিদেশী তৈল-কোম্পানি এখানে তেল তোলার কাজ সুরু করেছে। ইরাক পেট্রোলিয়ম কোম্পানি মস্কটের সুলতানের কাছ থেকে ওমান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তৈল-উত্তোলনের অধিকার

আরবের নেজ্‌দ ও নীলনদের নিকটবর্তী মরু অঞ্চলে কতক বেতুইন স্থায়িভাবে বসবাস আরম্ভ করেছে। উট এবং ঘোড়া পালনই এদের উপজীবিকা। ঘোড়া ও উটের বাচ্চার চাহিদা সব সময়েই। কাজেই পেশাহিসাবে এটি লাভজনক এবং এতে যাযাবর জীবনের অনিশ্চয়তা ও দুঃখও অনেক কম।

চলমান জীবন

বেতুইনদের মধ্যে শ্রেণী-ভেদ আছে—কতক হীন অবস্থাপন্ন, অল্পসংখ্যক উটের মালিক, কারো বা হয়ত অল্প কয়েকটি ছাগলই সম্বল। উচ্চ শ্রেণীর বেতুইনদের পালিত পশুর সংখ্যা বেশী। তারা অনেকে এক সঙ্গে দল বেঁধে বাস করে। দলের সর্দার শেখ হ'ল চালক। শেখের পোষাক-পরিচ্ছদে বৈশিষ্ট্য আছে। তার তাঁবুও বড় এবং সাজানো। ঘোড়ায় চ'ড়ে সে চলে। পরণে রঙিন আব্বা অর্থাৎ ঢিলা পায়জামা ও আলখাল্লা। কোমরে রিভলভার, ছোরা অথবা তরবারি ঝুলানো; পিঠের সঙ্গে চামড়ার ফিতা দিয়ে বাঁধা বন্দুক।

মেয়েদের পোষাকও প্রায় অনুরূপ। মাথায় রঙিন রুমাল বা উত্তরীয় বাঁধা। বেতুইন মেয়েরা খুব গহনা পরতে ভালবাসে; বিশেষ ক'রে নেকলেস, চুড়ি, বালা, রঙিন পাথরের মালা। মেয়েদের গায়ের রঙ উজ্জ্বল বাদামী, সুন্দর বড় বড় টানা চোখ। চলাফেরায় আছে গাম্ভীর্য এবং সৌন্দর্য।

বেতুইনের জীবনে রয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সংযোগ। দিনে প্রখর সূর্যতাপ; রাত্রিতে মরুভূমির মধ্যেও কন্‌কনে শীত। দিনে কোন মরূদ্যানে গাছের ছায়ায় বা কূয়ার কাছাকাছি তাঁবুর মধ্যে দিন কাটাতে হয়। পালিত পশুগুলি চ'রে বেড়ায়, তাদের ওপর নজর রাখতে হয়। অন্য দলের বেতুইনরা যাতে অকস্মাৎ আক্রমণ ক'রে তাদের সম্পত্তি লুঠপাট ক'রে নিয়ে না যায়, সেজন্য তাদের

সতর্ক থাকতে হয়। দিনে মাঝে মাঝে তাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হ'তে হয়। আকস্মিক ঘূর্ণিঝড় বিপদের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। তীব্রবেগে রাশি রাশি বালি চোখে-মুখে এসে লাগে। লোকেরা তাঁবুর মধ্যে ঢুকে কাপড় দিয়ে মাথা ভালভাবে ঢেকে মাটিতে প'ড়ে থাকে। উটের চোখের ওপরের পাতা বেশ মোটা। চোখ বন্ধ ক'রে বালির ঝাপটা থেকে চোখ বাঁচায়। নাক বন্ধ ক'রে রাখে ব'লে বালিতে নাকের ফুটা বন্ধ হ'য়ে যায় না। উন্মুক্ত আকাশের নীচে বসবাস করতে করতে বেদুইনরা হয়েছে সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু, কতকটা বেপরোয়া।

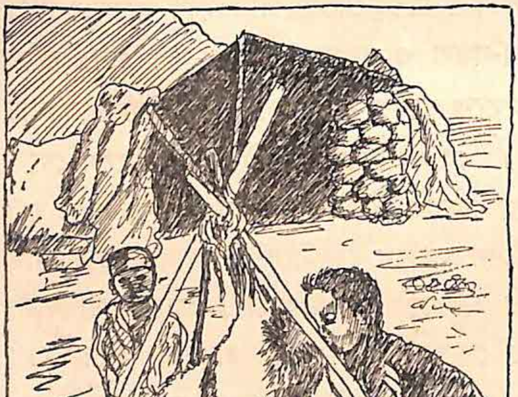
সুযোগ পেলেই অন্যের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া, পথিকদের আক্রমণ ক'রে তাদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা ও মূল্যবান জিনিস-পত্র জোর ক'রে কেড়ে নেওয়া, বণিকের দলকে পথের মধ্যে আটকিয়ে জিনিস লুঠপাট করা বেদুইনদের স্বভাব। যে-সব মুসলমান তীর্থযাত্রী বিদেশ থেকে আরবে যায় তাদের কাছ থেকেও এরা টাকা আদায় করতে ছাড়ে না। এরা মনে করে, তাদের দেশ আরবে যে বিদেশীই আসবে তার কাছ থেকে কর আদায় করার অধিকার তাদের আছে। অনেক তীর্থযাত্রী ও ব্যবসায়ী কোন দলের শেখের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে যায় এবং একজন প্রতিনিধি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাদের মরু অঞ্চল পার ক'রে দিয়ে আসে। এক দল বেদুইন যখন অন্য দলের কাছাকাছি আসে তখন আগে থেকেই তারা তাদের আব্বা বা আলখাল্লা উড়িয়ে বুঝায় যে, তাদের আক্রমণের অভিসন্ধি নাই। এরূপ না করলে বোঝা যাবে সে দলের লুঠপাটের অভিপ্রায় আছে।

বেদুইনরা দুর্ধর্ষ প্রকৃতির হ'লেও এরা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। কোন ব্যক্তি কোন বেদুইন পরিবারের অতিথি হিসাবে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করলে তার আর লাঞ্ছিত হওয়ার ভয় থাকে না। কথায় বলে, যে

একবার বেছুইনের লবণ খেয়েছে তার বেছুইনের হাতে বিপদের আশঙ্কা নাই।

শেখের তাঁবুতে

মরূদ্যানের মধ্যে অনেকগুলি তাঁবু খাঁটানো হয়েছে। শেখের তাঁবুটি অন্যগুলির চেয়ে সুন্দর। তাঁবুর সামনে কিছুটা জায়গা বেড়া দিয়ে ঘিরে উঠানের মত করা হয়েছে। সন্ধ্যায় তার মাঝখানে আগুন জ্বালানো হয়েছে। এতে পাশের তাঁবুগুলিতে আলোর কাজ চলছে, আগুনে জল গরম করা হচ্ছে। কয়েকজন অতিথি এসেছে, এদের খানাপিনা হবে শেখের তাঁবুতে। মেয়েরা রান্নার কাজ করছে; তাঁবুর বাইরে উটগুলি মাটিতে হামা-গুড়ি দিয়ে বিশ্রাম করে —আব্ছা অন্ধকারে বড় বড় ঢিপির মত দেখায়।



বেছুইন ছেলেরা ছাগলের চামড়ার থলি থেকে জলপান করছে।

তাঁবুর মধ্যে মাছুর বিছিয়ে খাওয়ার জায়গা করা হয়। পুরুষরা সবাই বসে একসঙ্গে। খাবার আসে—আটা ও তেল দিয়ে রান্না-করা মাংস, গরম ভাত, খেজুর এবং ছুধের তৈরি পিঠা। খাবার জিনিসগুলি মাটির পাত্রে ক'রে প্রত্যেকের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়, প্রত্যেকে তা থেকে

তুলে নেয় নিজের পাতে। একটি জলপাত্রও এমনিভাবে হাতে হাতে ঘোরে—সবাই তা থেকে চুমুক দিয়ে খেয়ে নেয়। জল তো নষ্ট করা চলে না। অতিথির যখন ভোজন চলে শেখের অনুচরদের কেউ তাঁবুর বাইরে ব'সে বাঁশী বাজায়। মেয়েদের জন্য পৃথক তাঁবু, তার সামনে পর্দা ঝুলানো। কৌতূহলের বশে কেউ সেখান থেকে উঁকি দিয়ে দেখে নূতন অতিথিকে। মেয়েদের চাপাকণ্ঠের হাসি ও কথাবার্তাও ভেসে আসে।

ভোজনের পর হুঁকায় ক'রে তামাক দেওয়া হয়। অতিথিকে সিগারেটও দেওয়া হয়, আর দেওয়া হয় গরম কফি। কফি প্রিয় পানীয়। একটি ধূপদানিতে আগুন দিয়ে তাতে ধূপের গুঁড়া ছিটিয়ে দিয়ে সেটি দেওয়া হয় প্রত্যেকের হাতে হাতে। তা থেকে সুগন্ধির ঘ্রাণ নেয় সবাই। তারপর গল্প-গুজবে সময় কাটে। অবশেষে অতিথিরা নমস্কার প্রতি-নমস্কার ক'রে বিদায় নিয়ে যায় তাদের নির্দিষ্ট তাঁবুতে। তাঁবুর মেজেতে বিছিয়ে দেওয়া হয় মাদুর ও কম্বল। শুয়ে পড়ে সবাই। তাঁবুগুলি সব নিস্তব্ধ হ'য়ে যায় কেবল যেখানে ছাউনী ফেলা হয়েছে তার চারদিকে বন্দুক-হাতে কয়েকজন প্রহরী জেগে থাকে সারারাত ধ'রে। মাঝে তাদের পালা বদল হয়, কিন্তু অন্য কারো নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না।

তুরস্ক

তুরস্ক দুইটি অংশে বিভক্ত। মর্মর সাগর এবং বস্‌ফরাস ও দার্দানালেস প্রণালী দিয়ে দুইটি স্থলভাগ বিচ্ছিন্ন। ছোট অংশে ইউরোপ অবস্থিত, বৃহত্তর অংশ এশিয়ায়। ইউরোপীয় অংশের উত্তরে এবং পশ্চিমে বুলগেরিয়া ও গ্রীস। এশিয়ার অংশ আনাতোলিয়ার উপদ্বীপ অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত। এর উত্তরে কৃষ্ণসাগর, পূর্বে সোভিয়েট

রাশিয়া এবং ইরাণ, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর, সিরিয়া ও ইরাক, পশ্চিমে ইজিয়ান সাগর। তুরস্ক প্রায় ১ হাজার মাইল দীর্ঘ এবং ৩৫০ মাইল চওড়া। আয়তন ২,৯৬,১৮৫ বর্গমাইল ; এর মধ্যে ইউরোপীয় অংশের আয়তন ৯,২৫০ বর্গমাইল।

ভূমির প্রকৃতি অনুসারে তুরস্ককে দুইটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যায় —উপকূল অঞ্চল এবং দেশের মধ্যভাগের অঞ্চল। উপকূল অঞ্চল তিনটি—কৃষ্ণসাগরের উপকূল, মর্মর ও ইজিয়ান সাগরের উপকূল এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূল। দেশের মধ্যভাগ এবং পূর্বদিক পাহাড়ময়। কৃষ্ণসাগরের উপকূলের কিছু দক্ষিণ দিয়ে উপকূলের সঙ্গে সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত রয়েছে।

আনাতোলিয়ার জলবায়ু দেশের সর্বত্র এক রকম নয় ; বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমের। উপকূলভাগে জলবায়ু মৃদু, নাতিশীতোষ্ণ, আরামদায়ক। দেশের মধ্যভাগে পাহাড়ময় অংশে শীত, গ্রীষ্মকাল অল্পকালস্থায়ী। উপত্যকা ও মালভূমি উর্বর ও শস্যসমৃদ্ধ। কেবল মধ্যভাগের এবং দক্ষিণ অংশের উপত্যকা ঊষর মরুসদৃশ। দেশের মধ্যে জলবায়ুর বৈচিত্র্য এত বেশী যে, দুই-তিন ঘণ্টার ভ্রমণেই তুষার-ঢাকা মালভূমি থেকে পুষ্প-সমাচ্ছন্ন গাছে-ঢাকা উর্বর শ্যামল প্রান্তরে এসে পৌঁছানো যায়।

তুরস্কে নদীর সংখ্যা খুবই কম। চোরোখ, ইয়েসিল, ইরমাক প্রভৃতি কয়েকটি নদী কৃষ্ণসাগরে পড়েছে। টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ যা ইরাকের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে গেছে তা উৎপন্ন হয়েছে আনাতোলিয়ার মালভূমিতে। কিন্তু পাষাণময় অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত ব'লে আনাতোলিয়ার কোন নদীই নৌবাহনযোগ্য নয়।

আনাতোলিয়ায় অনেকগুলি হ্রদ আছে ; এর মধ্যে ভ্যান হ্রদই সবচেয়ে বড়। এর জল অত্যন্ত লবণাক্ত। দেশের অনেক অঞ্চল জুড়ে

রয়েছে বিস্তৃত বন। বেশীর ভাগ বড় বনই কৃষ্ণসাগরের উপকূলভাগে অবস্থিত। দেশের মধ্যভাগে উপত্যকা অঞ্চলেও আছে মূল্যবান কাঠের বন। এগুলি দেশের জাতীয় সম্পদ।

তুরস্কের ইউরোপীয় অংশের উপকূলবর্তী অঞ্চলের জলবায়ু ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ দেশের মত। শীতকাল আরামদায়ক। এই সময় বৃষ্টিপাত হয় ; গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয় না ; জলবায়ু উষ্ণ ও শুষ্ক।

তুরস্কের আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ খুব বেশী না হ'লেও অধিকাংশ লোকই কৃষিকাজের দ্বারাই জীবিকা অর্জন করে। উৎপন্ন ফসল বিবিধ প্রকার নয় কিন্তু গুণে এগুলি উৎকৃষ্ট। দেশের মধ্যভাগের মালভূমি অঞ্চল উৎকৃষ্ট গম উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। যব, বার্লি প্রভৃতি খাদ্যশস্যও উৎপন্ন হয়। গম লোকেদের প্রধান খাদ্য। এ ছাড়া তুরস্কের তামাক, কিসমিস, ডুমুর, আফিং-বীজ, জলপাই, জলপাই তেল, শন, মসলা, গোলাপের আতর পৃথিবীতে বিখ্যাত।

দেশের ভূমির প্রায় ৪০ ভাগ তৃণাচ্ছাদিত এবং পশুচারণের উপযোগী। কাজেই পশুপালন অনেক লোকের জীবিকার অবলম্বন। দেশে ভেড়া, বড় কোমল লোমযুক্ত ছাগল, গরু, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি যথেষ্ট সংখ্যায় পালিত হয়। তুরস্কের আঙ্গোরা ছাগলের কোঁক্‌ড়ানো, কোমল এবং দীর্ঘ লোম পৃথিবীতে নাম-করা। এই লোমকে বলে টিফ্‌টিক অথবা মেহেয়ার। এ দিয়ে আঙ্করা সফু নামে একপ্রকার মিহি, চক্‌চকে সুন্দর বস্ত্র তৈরি হয়। গরমের দিনে সৌখিন লোকেরা মসলিনের মত সফু ব্যবহার করে। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে প্রধান হ'ল কয়লা, লোহা, লবণ, তামা, লিগনাইট, ম্যাঙ্গানিজ, পারদ, এ্যাস্‌বেস্‌টস্‌, গন্ধক, এ্যান্টিমনি প্রভৃতি। তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে খনিজ তেল আছে। বর্তমানে দেশী এবং বিদেশী কোম্পানির সহায়তায় তৈল উত্তোলনের আয়োজন চলেছে।

তুরস্কের শিল্পদ্রব্যের মধ্যে আছে কাপড়, চিনি, কাগজ, চামড়া, জুতা, টিনে-ভর্তি খাদ্যবস্তু এবং মদ্যজাতীয় পানীয়। বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের প্রধান দ্রব্য হ'ল লোহা ও ইস্পাত, ধাতুর কাজ, সিমেণ্ট, গৃহ-নির্মাণের উপকরণ, রাসায়নিক দ্রব্য। তুরস্কের শিল্প-কারখানা প্রকৃতপক্ষে গত কুড়ি বৎসরের মধ্যেই গ'ড়ে তোলা হয়েছে এবং এই শিল্পায়নের ফলেই দেশ হয়েছে সমৃদ্ধ, স্বাবলম্বী এবং উন্নত।

শিল্পায়ন

বহুকাল যাবৎ তুরস্ক কেবল খাদ্যশস্য ছাড়া অন্য যাবতীয় নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করেছে, অথচ দেশে কাঁচামালের অভাব ছিল না। এই সব কাঁচামাল অতি অল্পমূল্যে বিদেশে বিক্রি হ'ত এবং বিদেশ থেকে তা দিয়ে প্রস্তুত নানাবিধ দ্রব্য দেশে আমদানি হ'ত এবং বেশী দামে তা কিনতে হ'ত। তূলা, পশম, মেহেয়ার প্রভৃতি দেশের ভিতর কোন প্রকার বৃহৎ যন্ত্রশিল্পে ব্যবহার করার ব্যবস্থা ছিল না। এর ফলে দেশের বহু অর্থ চলে যেত বিদেশে। এই অবস্থার প্রতিকার ক'রে দেশের সম্পদ দেশেই কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে বৃহৎ যন্ত্রশিল্প স্থাপনের চেষ্টা সুরু হয়। ১৯৩৪ সালে তুরস্ক প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই হ'ল দেশকে শিল্পায়িত করার প্রথম পদক্ষেপ। প্রথম পরিকল্পনা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সম্পূর্ণ হয় এবং এর সুফল জনসাধারণকে উৎসাহিত করে। ১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রে খনি ও বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের দিকে নজর দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য হ'ল শিল্পায়ন ও দেশকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করা। নূতন নূতন কারখানা স্থাপন, রেলপথ নির্মাণ, পথ ও সেতু নির্মাণ, হাসপাতাল ও স্কুল স্থাপন প্রভৃতির ভিতর দিয়ে দেশে জীবন-যাত্রার মান উন্নত করা এবং সামাজিক জীবন সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়।

১৯৩৮ সালে একটি চতুর্থবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল—দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য গঠনমূলক কাজের প্রবর্তন। কৃষ্ণসাগরের তীরে দুইটি নূতন পোতাশ্রয় নির্মাণ, মাংস রপ্তানির জন্য কারখানা ও দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরির কারখানা স্থাপন এবং খনি অঞ্চলে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপন ছিল এর কার্যসূচীর অন্তর্গত।

বছর কুড়ির মধ্যে তুরস্কে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা বিস্ময়কর। একটি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র থেকে অতি অল্পকালের মধ্যে একটি আধুনিক, সমৃদ্ধ শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়েছে। এর জন্য দেশবাসীকে অবশ্য যথেষ্ট ত্যাগ-স্বীকার এবং কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে।

নবীন তুরস্ক

তুরস্কের প্রাচীন ইতিহাস বৈচিত্র্যময়। ইউরোপ ও এশিয়ার প্রান্ত-সীমায় অবস্থিত এই দেশটি যুগে যুগে শক্তিমান রাষ্ট্রের শক্তি-প্রদর্শনের লীলাক্ষেত্র হ'য়ে উঠেছিল। এক সময়ে গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মধ্যযুগে মুসলমানদের অধিকারে আসে এবং এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য গ'ড়ে ওঠে তুরস্ককে কেন্দ্র ক'রে। মুসলমান-বাহিনী সমগ্র আরবদেশ, আফ্রিকার উত্তর অঞ্চল এবং স্পেন পর্যন্ত মুসলমান সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তার করে। অটোম্যান সাম্রাজ্য নামে ইতিহাসে তা পরিচিত।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তুরস্কের সুলতান ও খলিফা ছিলেন ওয়াহিদ-উদ্দীন। এই যুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষে যোগদান করে এবং মিত্রশক্তির নিকট পরাস্ত হয়। তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতন ঘটলো, আরবের বিভিন্ন অংশের ওপর তুরস্কের সুলতানের যে আধিপত্য ছিল তার অবসান হ'ল।

রাজধানী কনস্টান্টিনোপোল মিত্রশক্তির দখলে, নিকটবর্তী সমুদ্রে বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ উদ্ধত দম্ভে কামানের মুখ শহরের দিকে উঁচিয়ে নোঙর ক'রে রইলো। তুরস্ক পার্লামেণ্ট ভেঙে দেওয়া হ'ল। দেশের মধ্যে হতাশা ও নৈরাশ্যের ভাব। উল্লসিত মিত্রশক্তি গোপন চুক্তিতে তুরস্ককে খণ্ড খণ্ড ক'রে নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নেবার আয়োজন করতে লাগল।

জাতির এই সংকটের সময় মুস্তাফা কামাল পরাজিত সৈন্য ও জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার ক'রে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য সেনাদল গঠনের চেষ্টা করতে লাগলেন। সুলতান ইংরাজদের হাতের মুঠোর মধ্যে। তিনি কামালের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তাঁকে হত্যা করার জন্য আদেশ জারি করলেন। কিন্তু কামালের জনপ্রিয়তা ক্রমে বেড়ে চললো। সৈন্যদল গঠন ক'রে তিনি আক্রমণকারী সেনাবাহিনীকে পরাজিত ক'রে দেশ থেকে বিতাড়িত করলেন। গ্রীকসৈন্য তুরস্কের কিছু অংশ দখল করার আশায় আনাতোলিয়ায় প্রবেশ ক'রে আঙ্কারা পর্যন্ত বিজয়দর্পে এগিয়ে গিয়েছিল কিন্তু প্রবল প্রতিরোধের সামনে সাকারিয়া নদীর তীর থেকে তাদের ফিরতে হ'ল। এইবার সুরু হ'ল তুর্কীদের জয়লাভের পালা। গ্রীকসৈন্য পিছু হটে পালিয়ে আসতে লাগল। যেখান দিয়ে তারা যায় তা পুড়িয়ে ধ্বংস ক'রে দেয়। তুর্কীরাও গ্রীকদের নির্মূল ক'রে ফেলতে লাগল। অধিকাংশই নিহত হ'ল, সামান্য সংখ্যক সাগর পার হ'য়ে পালিয়ে ফিরে গেল দেশে। এর পর রাজধানী কনস্টান্টিনোপোল (ইস্তাম্বুল) অধিকারের চেষ্টা। তুর্কী জাতির আহত অভিমান ও দুর্জয় সংকল্প জয়যুক্ত হ'ল। তুরস্ক স্বাধীন জাতিরূপে স্বীকৃত হ'ল। রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে স্থাপন করা হ'ল প্রজাতন্ত্র। মুস্তাফা কামাল হলেন প্রথম প্রেসিডেণ্ট।

অটোম্যান সাম্রাজ্যের সময়ে খাস তুরস্কের বাইরে যে-সব অঞ্চলের ওপর সম্রাটের অধিকার নামমাত্র হ'লেও ছিল, তা ছেড়ে দেওয়া হ'ল। আনাতোলিয়া এবং ইউরোপের সামান্য অংশ নিয়ে গঠিত হ'ল নবীন তুরস্ক। মুস্তাফা কামাল অল্প সময়ের মধ্যে কৃষি ও যন্ত্রশিল্পের উন্নতির ভিতর দিয়ে দেশকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রজাতন্ত্র হ'লেও তিনি হলেন সমগ্র দেশের প্রিয়তম নেতা—পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি অনুরক্ত, মধ্যযুগীয় সংস্কার ও সামাজিক প্রথার বিলোপ ক'রে সকল বিষয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার পক্ষপাতী। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একদিকে যেমন কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রে শিল্পায়নের ভিতর দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ় করার এবং দেশকে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা চলতে লাগল, অন্যদিকে পুরানো কতক সামাজিক প্রথার পরিবর্তে নূতন প্রথা এমন কি নূতন ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ আইন ক'রে লোকের পক্ষে ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা হ'ল।

নূতন সংস্কার

শুঁয়াপোকা কিছুদিন গুটির মধ্যে অবস্থান ক'রে যখন বেরিয়ে আসে তখন আগের রূপের সঙ্গে তার সাদৃশ্য থাকে না। ছিল পোকা, হ'ল প্রজাপতি। তেমনি অল্পকালের মধ্যে মুস্তাফা কামাল তুরস্কের রূপই বদলিয়ে দিলেন। বহুদিন থেকে মুসলমানদের শিরস্ত্রাণ ছিল ফেজ। ফেজের পরিবর্তে প্রবর্তন করা হ'ল ইউরোপীয় ধরনের টুপি। আব্বা আলখাল্লার পরিবর্তে কোট-প্যাণ্ট হ'ল জাতীয় পোষাক। মেয়েদের পর্দাপ্রথা বিলোপ করা হ'ল। তারা ইউরোপীয় মহিলাদের মত পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা আরম্ভ করলো।

আইন-কানুনে আনা হ'ল বিরাট পরিবর্তন। এতদিন পর্যন্ত অনেক ব্যাপারে শরিয়ৎ অনুসারে অর্থাৎ কোরানের নীতি অনুযায়ী বিচার

চলতো। কামাল এর পরিবর্তে সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক আইন, ইতালির দণ্ডবিধি এবং জার্মানির ব্যবসায়-সংক্রান্ত আইন তুরস্কে প্রবর্তন করলেন। এর ফলে পূর্বে যে আইন অনুসারে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হ'ত তার আমূল পরিবর্তন ঘটলো। বহুবিবাহ-প্রথা লোপ করা হ'ল। ইসলাম ধর্মের নিয়ম অনুসারে দেশে মানুষের ছবি আঁকা, ভাস্কর্যে মানুষের আকৃতি গড়া বারণ ছিল। কামাল বালক-বালিকাদের জন্য শিল্প-শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন করলেন এবং শিল্প-সুরুচি-সুষমার ব্যাপারে ধর্মের গোঁড়ামি নির্মূল ক'রে ফেললেন। মানুষের মেলামেশার সময় অভিবাদনের রীতিও তিনি পাল্‌টিয়ে দিলেন। 'সালাম' দেবার পরিবর্তে কর-মর্দনের রীতি প্রবর্তিত হ'ল। ভাষার ক্ষেত্রে নূতন ধরনের পরিবর্তন ঘটানো হ'ল। এতদিন পর্যন্ত তুর্কীভাষা আরবী হরফে লেখা হ'ত। কামাল ব্যবস্থা করলেন—তুর্কীভাষা রোমান হরফে অর্থাৎ ইংরাজী অক্ষরে লিখতে হবে। দুই বৎসর প্রস্তুতির পর একটি দিন নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হ'ল যার পর তুরস্কে আরবী ভাষায় আর কোন কিছুই লেখা চলবে না, সবই লিখতে হবে নূতন ইংরাজী হরফে। খবরের কাগজ, বই, আইন-কানুন সবই লেখা হ'ল এই হরফে। ষোল থেকে চল্লিশ বৎসর বয়সের সকলকেই নূতন অক্ষর শেখার স্কুলে ভর্তি হ'তে হ'ল। যে কর্মচারী নূতন অক্ষর আয়ত্ত করতে পারবে না সে চাকুরি থেকে বরখাস্ত হবে, কয়েদী যদি জেলে থাকতেই নূতন অক্ষর শিখতে না পারে তবে তার মেয়াদ শেষ হ'য়ে গেলেও খালাস পাবে না—এমনি হ'ল নিয়ম।

এক সময়ে তুরস্কের সাম্রাজ্য অনেক অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত থাকলেও সমগ্র দেশের মধ্যে সংহতি ছিল না, জনগণের ঐক্যের অভাবে এবং সুলতানের শাসন-পরিচালনার অক্ষমতায় দেশ ছিল দুর্বল। তুরস্ক তখন 'ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি' ব'লে অবহেলা ও বিদ্রূপের বিষয় ছিল।

কামালের উদ্যমে ও দূরদর্শিতায় তুরস্ক এখন জাতি হিসাবে সংহত, শক্তিমান এবং আধুনিক। কামালকে দেশের লোকেরা উপাধি দিয়েছে আতাতুর্ক অর্থাৎ 'দেশের জনক'।

নেপাল

ভারতের উত্তর সীমায় হিমালয় পর্বতের কোলে তিনটি রাজ্য আছে। তা হ'ল নেপাল, সিকিম ও ভুটান। ভারতের সঙ্গে এদের নিবিড় যোগসূত্র বিদ্যমান। নেপালের উত্তর দিকে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়, পূর্বে সিকিম, পশ্চিমে ও দক্ষিণে ভারতের অঞ্চল। ভৌগোলিক দিক দিয়ে একে একরকম ভারতেরই অন্তর্গত বলা যায়। রাজ্যটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫০০ মাইল এবং প্রস্থে ৯০ থেকে ১৪০ মাইল। নেপালের আয়তন প্রায় ৫৪ হাজার বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৬৫ লক্ষ।

ভূমির প্রকৃতি হিসাবে দেশটি চারটি অংশে বিভক্ত; এর প্রতি অংশে বিভিন্ন প্রকারের জীবজন্তু ও উদ্ভিদ দেখা যায়। রাজ্যের সর্ব-দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত তরাই অঞ্চল; পাহাড় যেখানে ক্রমে নীচু হ'য়ে এসে সমভূমির সঙ্গে মিশেছে। তরাই-এর বাইরের দিকের অংশ চাষ-আবাদের যোগ্য এবং ভারতের সীমান্তের ভূমির মতই এর অবস্থা। এখানে ধান, গম, আখ, তামাক এবং আফিংএর চাষ হয়। ফসল ফলে প্রচুর। দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে বাইরে রপ্তানিও করা হয়। তরাই-এর ভিতরের দিকে শাল, শিশু প্রভৃতি কাঠের বিশাল বন। প্রচুর বৃষ্টি পায় ব'লে গাছপালার বৃদ্ধি খুব বেশী, বিরাট বনস্পতি সগর্বে আকাশের দিকে মাথা উঁচু ক'রে উঠেছে। সূর্যালোক লাভের জন্য গাছের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা চলে; গাছগুলি তাই দীর্ঘ ও সরল। বনে আছে হাতী, বাঘ, ভালুক, চিতাবাঘ, বুনো মোষ এবং বিভিন্ন জাতের পাখী। তরাই অঞ্চল বন্যজন্তু শিকারের পক্ষে

উৎকৃষ্ট স্থান। তরাই-এর অভ্যন্তর-ভাগ মানুষের বাসের অযোগ্য—স্যাঁৎসেঁতে, ম্যালেরিয়াপূর্ণ, নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছন্ন।

তরাই-এর উত্তর দিকে অনুচ্চ শিবালিক পর্বতমালা বিস্তৃত, মাঝে মাঝে উপত্যকা দিয়ে বিচ্ছিন্ন। পাহাড়ের গা দিয়ে রয়েছে গভীর বন; উপত্যকায় চাষ-আবাদ চলে। গম, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, রসুন এ উপত্যকা অঞ্চলের প্রধান ফসল। এ ছাড়া নানাজাতীয় ফল, যেমন আপেল, ন্যাসপাতি, কুল প্রভৃতি প্রচুর জন্মে।

শিবালিকের উত্তর দিকে হিমালয়ের পাদভূমি চার হাজার থেকে দশ হাজার ফুট উঁচু। এর পরই তুষারাবৃত হিমগিরি নেপাল ও তিব্বতের মধ্যে দুর্জয় প্রাচীরের মত প্রসারিত।

প্রাকৃতিক সম্পদ

বন-সম্পদে নেপাল সমৃদ্ধ। তরাই ও শিবালিক পর্বতের সানুদেশে শাল, শিশু, পাইনজাতীয় গাছের বিস্তৃত বন থেকে ভারতে রপ্তানির জন্য প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করা হয়। উৎকর্ষের জন্য এগুলির চাহিদা খুব বেশী। দেশে খনিজ সম্পদও অনেক। পাহাড় অঞ্চলে আছে তামা, গন্ধক, লোহা। উত্তর অংশে আছে সোনা ও রূপা। তামার খনি অগভীর ব'লে এখানে খনি থেকে তামা তোলা সহজ হয়েছে। দেশে কয়লার অভাবে এবং পরিবহণের জন্য পথ ও রেলপথের সুবিধা না থাকায় অধিক পরিমাণে খনিজ পদার্থ আহরণ করা সম্ভবপর হ'য়ে উঠেনি।

অধিবাসী

নেপালে কয়েক জাতির লোক বসবাস করে। এদের অধিকাংশই মঙ্গোলীয় জাতি থেকে উদ্ভূত। এদের মধ্যে প্রধান হ'ল রাজপুতদের বংশধর গুর্খা এবং নেওয়ার। এ ছাড়া আছে লেপচা, ভুটিয়া, গুরুং এবং মগর প্রভৃতি। গুর্খারা সাহসী, রণকুশল, কষ্টসহিষ্ণু। নেওয়াররা

কুশলী শিল্পী। নেপালের সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত মন্দিরগুলি বেশীর ভাগ এদেরই তৈরি।

নেপালীদের মধ্যে কয়েকটি ভাষার প্রচলন আছে। গুর্খারা যে ভাষা ব্যবহার ক'রে তা নেপালের সরকারী ভাষা। একে বলা হয় পর্বতীয়া বা পাহাড়ি। এটি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত এবং লেখা দেবনাগরী হরফে। অন্য ভাষাগুলি তিব্বতী ভাষার অপভ্রংশ বা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নেপালে বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম পাশাপাশি রয়েছে। হিন্দুধর্মের বহু ক্রিয়াকলাপ ও আচরণ এখানকার বৌদ্ধদের ধর্মের মধ্যে স্থানলাভ করেছে। সামাজিক রীতিনীতি ভারতীয় হিন্দুদের কতক কতক ব্যাপারে পৃথক। স্ত্রী-পুরুষ সকলের পক্ষেই বহুবিবাহ এখানে প্রচলিত। পুরুষ যেমন একাধিক বিবাহ করতে পারে, স্ত্রীলোকও একই সঙ্গে একাধিক পতি গ্রহণ করতে পারে। স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদ করা অত্যন্ত সহজ—কোন আইন-আদালতের আশ্রয় নেবার প্রয়োজন হয় না; স্বামীর বালিশের ওপর একটি পানপাতা রেখে দিলেই বিবাহ বিচ্ছেদ হ'য়ে গেল।

নেপালীদের প্রধান খাদ্য ভাত, রুটি, ছাগল ও মোষের মাংস, ডিম, হরিণ ও পাখীর মাংস। পাহাড়ের নিম্ন অংশে যারা বাস করে তারা মাছও খায়। এদের পোষাক স্ত্রী-পুরুষের এক রকম নয়। পুরুষ পরে ব্রিচেসের মত পায়ের নীচের দিকে চাপা প্যাণ্ট, সার্ট, কোট। মেয়েরা ঘাগরা ও ব্লাউস পরে।

ভুটান

নেপাল ও সিকিমের পূর্বে হিমালয়ের পাদদেশে ভুটান অবস্থিত। নেপালের মত এর উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে ভারত, পশ্চিমে সিকিম ও দার্জিলিং জেলা, পূর্বে তিব্বতের টোয়াং অঞ্চল। ভারতের সীমানা

দিয়ে ভুটান প্রায় ২০০ মাইল বিস্তৃত ; আয়তন প্রায় ২০ হাজার মাইল। লোকসংখ্যা তিন লক্ষের বেশী নয়। দেশের সর্বত্র যে ধ্বংসাবশেষ আছে তা থেকে বোঝা যায় এক সময়ে অনেক বেশী লোক এখানে বাস করতো।

ভুটানের সমগ্র অঞ্চলটিই পাহাড়ময়। গিরিশ্রেণী হিমালয় থেকে ছোট ছোট জটার মত উত্তর-দক্ষিণে লম্বিত হ'য়ে এসেছে, এদের মাঝে রয়েছে গভীর উপত্যকা। ভূমি দক্ষিণ দিক থেকে উত্তরে ক্রমশঃ ধাপে ধাপে উঁচু হ'য়ে গেছে। উচ্চতা অনুসারে দেশটিকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। সর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলটি ত্রিশ মাইলের মত চওড়া। মৌসুমী বায়ুতে যে মেঘ ভেসে আসে তার প্রথম ধাক্কা পড়ে এই অঞ্চলে। এখানে বৃষ্টিপাত বছরে ২০০ থেকে ৩০০ ইঞ্চি, অঞ্চলটি ঘন বনে সমাচ্ছন্ন। হাতী, গণ্ডার, বাঘ, হরিণ ও অন্যান্য প্রাণী দেখা যায় এই সব বনে। দ্বিতীয় অঞ্চলটি চল্লিশ মাইলের মত বিস্তৃত, অসংখ্য উপত্যকা ও গিরিখাতে পূর্ণ। সাড়ে তিন হাজার থেকে দশ হাজার ফুট উঁচু অঞ্চলে চাষ-আবাদ হয় ; এখানেই বেশীর ভাগ লোকের বসতি। তৃতীয় অঞ্চল ক্রমশঃ উচ্চ হ'তে উচ্চতর হ'য়ে হিমালয়ের দেহের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। কোন কোন স্থান ২৪ হাজার ফুট উঁচু। ১৮ হাজার ফুট পর্যন্ত উদ্ভিদ দেখা যায়—মাথা সরু পাইনজাতীয় গাছ, স্তরে স্তরে পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই অঞ্চলে উৎকৃষ্ট পশুচারণ-ক্ষেত্রও রয়েছে, সেখানে লোকেরা দীর্ঘ লোমযুক্ত চমরী গরু, ছাগল প্রভৃতি চরায়।

ভুটানের মধ্য দিয়ে চারিটি বড় নদী প্রবাহিত হ'য়ে এসে ব্রহ্মপুত্রে পড়েছে। সিকিম ও ভুটানের সীমানায় চুম্বি উপত্যকার ভিতর দিয়ে ব'য়ে চলেছে আমু-চো। অপর নদী ওয়াং-চু, মাচু এবং মানস। মানসই এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়।

আর্থিক দিক দিয়ে ভুটান অনুন্নত। ভূমির প্রকৃতি এমন যে ব্যাপক কৃষিকার্যের সুবিধা কোথাও নাই। পাহাড়ের গায়ে অল্প কিছু কিছু স্থান সমান ক'রে নিয়ে চাষের ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে গম, ধান, যব, ভুট্টা, সরিষা, লঙ্কা প্রভৃতির আবাদ হয়। লোকেরা যব থেকে এক প্রকার দেশী মদ তৈরি করে এবং সবাই তা পান করে। এদের কুটীর-শিল্পের মধ্যে প্রধান হ'ল লতার ঝুড়ি তৈরি, মাদুর তৈরি, সূতী ও পশমের মোটা কাপড় বোনা, ধাতুর বাসন তৈরি প্রভৃতি।

ভুটানের অধিবাসীদের বলা হয় ভুটিয়া। জাতিতে এরা তিব্বতীয়। দেহের গড়ন ও আচার-ব্যবহারে এদের সঙ্গে অনেক মিল। ভুটিয়া সমাজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত—লামা অর্থাৎ পুরোহিত সম্প্রদায়, পেনলপ অর্থাৎ প্রধান এবং চাষী। ভুটানে নয়টি প্রদেশ আটজন পেনলপ কর্তৃক শাসিত। শাসক পেনলপরা সুরক্ষিত দুর্গে বাস করে, এই দুর্গকে বলা হয় জং। দেশে নিম্নস্তরের বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত। এরা ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব বিশ্বাস করে। লামারা বৌদ্ধ মন্দিরে বাস করে। জনসাধারণের ওপর এদের প্রভাব খুব বেশী। ভুটিয়া বিশ্বাস করে যে, লামারা অলৌকিক শক্তির অধিকারী। প্রধান লামাকে বলা হ'ত ধর্মরাজ এবং প্রধান শাসকের উপাধি ছিল দেবরাজ। পূর্বে ধর্মরাজ এবং দেবরাজ একত্রে দেশের শাসন পরিচালনা করতেন। বর্তমানে ধর্মরাজের শাসন-ক্ষমতার বিলোপ হয়েছে; ভুটানের মহারাজা দেশ শাসন করেন। এই ক্ষমতা মহারাজ-বংশে উত্তরাধিকারসূত্রে মহারাজ-কুমারের ওপর অর্পিত হয়। ভারতের সঙ্গে ভুটানের প্রীতির সম্পর্ক বিরাজিত রয়েছে। ভারত ভুটানের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করে না কিন্তু এর বৈদেশিক নীতি ভারতের পরামর্শ অনুসারেই নির্ধারিত হয়।

ভুটানের রাজধানী ছুটি। শীতকালের রাজধানী পুণাখা, গ্রীষ্মকালের রাজধানী তাসি-জং। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আসামের দিক থেকে ভুটানে যাওয়ার একটি ক'রে গিরিপথ আছে। খাড়া পাহাড়ের গা দিয়ে পথ বড়ই ছুর্গম। মাঝে মাঝে পথ তুষারে আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে।

তিব্বত

প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিন্ধ্য পর্বত ছিল ভারতের উত্তর সীমানা। তখন দাক্ষিণাত্য নিয়েই ছিল ভারতভূমি। বিন্ধ্য পর্বতের উত্তর থেকে এশিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশ পর্যন্ত স্থানে বিরাজিত ছিল সমুদ্র। এক সময়ে প্রবল ভূমিকম্পের ফলে এই সাগরের তলদেশ উঁচু হ'য়ে ওঠে, জন্ম হয় হিমালয় পর্বতের। সাগরের জল সরে যায়, এশিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশ ও চীনদেশের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এই বিরাট পরিবর্তনের চিহ্ন পাওয়া গেছে হিমালয় পর্বতের পাথরের মধ্যে। চার হাজার ফুট উঁচুতে বিরাট সামুদ্রিক জীবের অস্থি পাওয়া গেছে যা পাথরে পরিণত হয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায়, এক সময় এই অঞ্চল ছিল সমুদ্রের তলায়। এখন বিশাল হিমালয় পর্বতমালা দীর্ঘ প্রাচীরের মত নীল আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এর শৃঙ্গ তিন থেকে সাড়ে পাঁচ মাইল উঁচু, মেঘের স্তর তা ডিঙিয়ে যেতে পারে না। হিমালয়ের দক্ষিণে নদীবাহিত ভারতের সমভূমি কিন্তু উত্তরে উচ্চ মালভূমি, শুষ্ক বৃষ্টিহীন, শীতল ও শ্যামলতা-বর্জিত। এই উচ্চ পাথুরে দেশ তিব্বত। তিব্বতে লামাদের প্রভাব খুব বেশী। প্রধান লামাকে বলা হয় দলাইলামা। দলাইলামাকে তিব্বতীরা জীবন্ত বুদ্ধ মনে ক'রে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। দলাইলামা দেশের শাসকও।

বহুদিন লামারা কেবল চীনা ছাড়া অন্য কোন জাতির লোককে রাজধানী লাসায় প্রবেশ করতে দেয়নি। লাসাকে বলা হ'ত নিষিদ্ধ নগরী। পরিব্রাজক বা ভ্রমণকারীকে লাসাতে প্রবেশের আগেই ফিরিয়ে দেওয়া হ'ত ; অনেকে তিব্বতীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের ওপর দুর্গ, তাতে সজাগ প্রহরী। তিব্বতীরা বিদেশীদের সন্দেহের চোখে দেখত, তাদের দেশের মধ্যে অন্য দেশের লোক আসবে তা তারা পছন্দ করতো না। তবে বাঙালীদের তিব্বতের সম্বন্ধ কিছুটা অন্য ধরনের।

বহুশত বৎসর পূর্বে তিব্বতের রাজার বিশেষ আমন্ত্রণে বাঙালী জ্ঞানসাধক দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্মের জ্ঞান ও ধর্মনীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। দীপঙ্কর তিব্বতেই দেহত্যাগ করেন। তিব্বতীরা এখনও তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। রাজা রামমোহন রায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী লামাদের সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে নানা বিষয় আলোচনার জন্য মাত্র ষোল বৎসর বয়সে হিমালয় অতিক্রম ক'রে তিব্বতে গিয়েছিলেন। কেবল চীনদেশ ছাড়া তিব্বতের সঙ্গে অন্য দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল না। ১৯০৪ সালে ভারত সরকার তিব্বতের সঙ্গে সোজাসুজি বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেশ্যে লাসায় একটি মিশন প্রেরণ করেন। একরকম জোর ক'রে তিব্বতকে ভারতের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে রাজী করানো হয়। দলাইলামা লাসা ছেড়ে চলে যান। গার্টক, ইয়াটুং এবং গিয়ান্‌সি বাজারে ভারতীয় মালপত্র বেচাকেনা চলবে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর পর তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলতে থাকে। তিব্বতীরা ভেড়া ও ইয়াকের পিঠে পশম ও অন্যান্য দ্রব্য চাপিয়ে ১৪ থেকে ১৮ হাজার ফুট উঁচু গিরিপথ দিয়ে মালপত্র নিয়ে দার্জিলিং ও কালিম্পঙ-এর কাছাকাছি বেচাকেনা করতে আসত। ক্রমে তিব্বতের ওপর ব্রিটিশের প্রভাব

বেশী হ'তে থাকে। ১৯১০ সালে চীন তিব্বত অভিযানের আয়োজন করলে দলাইলামা ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ সরকার চীনের হাত থেকে তিব্বত রক্ষা করেন। ১৯১৩ সালে দলাইলামা তিব্বতে ফিরে গিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিব্বত চীনের প্রভাবমুক্ত হ'তে পারে না। ১৯৫০ সালে কম্যুনিস্ট চীন সরকার তিব্বত পূরামত দখলে আনার চেষ্টা করতে থাকেন এবং বছরখানেকের মধ্যেই অধিকার সম্পূর্ণ হয়। চীন সরকার এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না এবং দলাইলামার প্রভাব-প্রতিপত্তি যেমন আছে তেমনি থাকবে।

সিকিম ও তিব্বতের মধ্যে ইয়াটুং উপত্যকা। বসন্তকালে এখানকার দৃশ্য হয় নয়নলোভন। পাহাড়ের গায়ে সবুজ পাইনগাছের সারি—মাঝে মাঝে রডোডেনড্রন ফুলের গাছ লাল রঙের অজস্র ফুলে ভরা, যেন প্রকৃতির মধ্যে আবীর খেলার উৎসব। চুম্বি উপত্যকা অতিক্রম ক'রে পোঁছতে হয় তিব্বতের উচ্চ মালভূমিতে। বছরের বেশীর ভাগ সময় দারুণ শীত। বড় বড় লোমওয়ালা তিব্বতী চমরী গরু এখানকার একমাত্র পালিত প্রাণী। বরফের কণামিশ্রিত প্রবল বাতাস ঝড়ের বেগে বইতে থাকে। জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর নীচে ২৫ পর্যন্ত নেমে যায়। চারিদিক বরফে আচ্ছন্ন, মাইলের পর মাইল কেবল বরফ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

মধ্য-এশিয়ার মালভূমিকে বলা হয় পৃথিবীর ছাদ। তিব্বতের গড় উচ্চতা সমুদ্র-সমতল থেকে ১৫ হাজার ফুট; পৃথিবীর মধ্যে তিব্বতই সবচেয়ে উঁচু দেশ। এশিয়ার অনেকগুলি বড় নদী তিব্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে—যেমন চীনদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হোয়াং হো, ইয়াং-সি-কিয়াং, ভারতে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, শতদ্রু প্রভৃতি। তিব্বতে ব্রহ্মপুত্রের নাম সাংপো অর্থাৎ পবিত্র নদী। এদেশে

অনেকগুলি হ্রদ আছে ; সেগুলির মধ্যে মানস সরোবর হ্রদ বিশেষ পরিচিত।

পাষাণময় অঞ্চলের ওপর দিয়ে সাংপো খরস্রোতে ব'য়ে চলেছে। এই নদীটি তিব্বতে যাত্রী ও মাল-চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয়। স্রোত খুব প্রবল ব'লে কাঠের নৌকা চালানো নিরাপদ নয়, কারণ পাথরে ধাক্কা লেগে যে-কোন সময়েই তা চূর্ণ হ'য়ে যেতে পারে। তিব্বতীরা চামড়ায় তৈরি হাল্কা নৌকায় ক'রে যাতায়াত করে। নৌকাগুলি লা নামক গাছের কাঠের কাঠামোর ওপর চমরী গরুর চামড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া।

অধিবাসী

তিব্বতীরা জাতিতে মঙ্গোলীয় ; বেঁটে, দেহের গড়ন মজবুত। এরা সাহসী, পরিশ্রমী ও আমোদপ্রিয়। তিব্বতীদের মধ্যে দৈহিক পরিচ্ছন্নতা খুবই কম। তীব্র শীতের দেশ ব'লে এরা কাপড়-চোপড় বিশেষ কাচে না, দেহও অপরিষ্কার। মাথার চুল না কেটে বেণী ক'রে পিঠের দিকে ঝুলিয়ে রাখে। পুরুষের চেয়ে মেয়েরা বেশী পরিশ্রম ও কাজকর্মে তৎপর। পুরুষরা কতকটা অলস-প্রকৃতির। চাষ-আবাদ, গৃহস্থালীর কাজ সবই মেয়েরা করে।

তিব্বতীরা পশমের তৈরি কাপড় ও ঢিলে কোট পরে ; চমরী গরু ও হরিণের লোমযুক্ত চামড়া দিয়েও পোষাক তৈরি করা হয়। শীত-নিবারণের জন্য কোমল লোমের দিক হয় জামার ভিতরের দিক।

তিব্বতী চাষীরা গম, ভুট্টা ও কিছু পরিমাণ ধান এদেশে উৎপন্ন করে। ভেড়া, ছাগল ও চমরী গরু প্রধান গৃহপালিত পশু। চমরী গরুর মত উপকারী প্রাণী তিব্বতীদের আর কিছু নাই। এর দুধ, মাংস, পশম, চামড়া সবই লাগে এদের কাজে। জীবিত অবস্থায় চমরী গরু মালপত্র বহন করার কাজে লাগানো হয়। পশম ও চামড়া তিব্বতীদের প্রধান

রপ্তানি দ্রব্য। তারা খচ্চর বা চমরী গরুর পিঠে বোঝা চাপিয়ে গিরিপথ পার হ'য়ে কতক মাল নিয়ে আসে ভারতের সীমান্তে, কতক বা নিয়ে যায় চীনদেশের দিকে।

রুটি ও মাংস হ'ল তিব্বতীদের প্রধান খাদ্য। এরা প্রচুর পরিমাণে চা খায় কিন্তু চা তৈরির প্রণালী আমাদের মত নয়। দুধ ও চিনি চায়ের সঙ্গে না মিশিয়ে তার পরিবর্তে মাখন ও সোডা দিয়ে চা বানায়। এই চা এদের প্রিয় পানীয়।

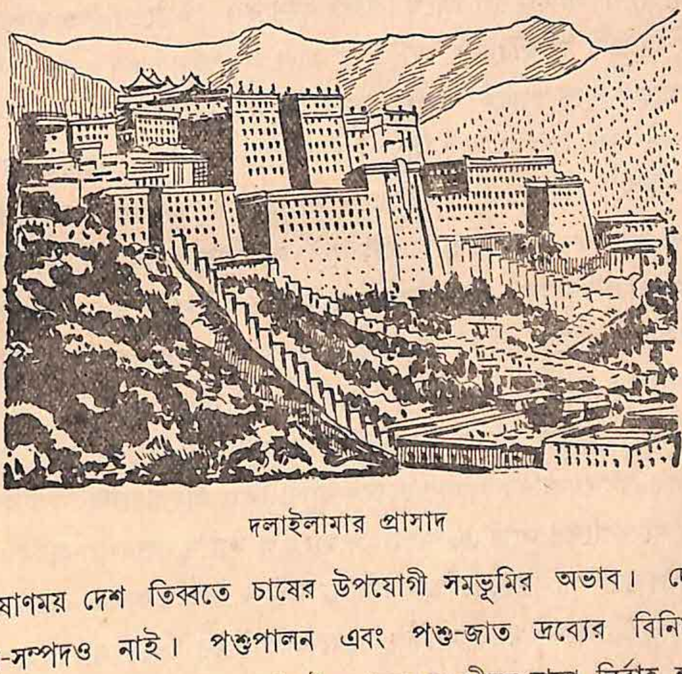
তিব্বতীদের মধ্যে লেখাপড়ার বিশেষ প্রচলন নাই। লামারা বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে এবং বৌদ্ধমঠে শিষ্যদের শিক্ষা দেয়। সাধারণ লোকে লামা ও অপর শিক্ষিত ব্যক্তিকে খুব সম্মান দেখিয়ে থাকে।

তিব্বতীরা বৌদ্ধ। এদের ধর্ম-আচরণ কতকটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। লামারা পাথরের জপমালা হাতে নিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে—ওম্ মণিপদ্মে হুঁ। চাকার গায়ে কাগজে এই প্রার্থনা-মন্ত্র লিখে আট্‌কিয়ে দেওয়া হয়। বাতাসে চাকাটি ঘোরে, যতবার ঘোরে ততবার জপ-করা হ'ল! এমনি ছোট প্রার্থনা-চক্র লোকেরা হাতে নিয়ে চলাফেরা করে, মাঝে মাঝে চাকাটি ঘুরিয়ে দেয়। কাজও হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে কৌশলে প্রার্থনা করাও হ'য়ে যাচ্ছে এই ভাব। প্রতি বাড়ীতেই এই ধরনের প্রার্থনা-চক্র বা ধর্মচক্র লাগানো থাকে, সেগুলি বাতাসে ঘোরে। কখনও বা দীর্ঘ খুঁটির সঙ্গে পাতলা কাপড় নিশানের মত উড়িয়ে দেওয়া হয়। তাতে প্রার্থনা-মন্ত্র-লেখা। নিশানটি বাতাসে ওড়ে এবং লোকেদের বিশ্বাস যে, যে-লোক এই নিশান স্থাপন করেছে তার প্রার্থনা করার কাজ ঐভাবেই হ'য়ে যাচ্ছে।

তিব্বতীরা সাধারণতঃ মৃতদেহ কবর দেয় না বা পোড়ায় না। দেহ টুক্‌রা টুক্‌রা ক'রে কেটে পাহাড়ের ধারে ফেলে দেয় যাতে শকুনি-গৃধিনী প্রভৃতি পাখী খেতে পারে। মৃতদেহকে বৃথা মাটির নীচে পচিয়ে

বা পুড়িয়ে না ফেলে তা কোন প্রাণীর সেবায় লাগুক এই উদ্দেশ্য থেকেই এ প্রথা প্রচলিত হয়েছে। কুষ্ঠরোগীদের মৃতদেহ থলিতে পূ'রে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

রাজধানী লাসাতে দলাইলামার প্রাসাদ দোতলা—একাধারে দুর্গ, বৌদ্ধ-মঠ ও রাজপ্রাসাদ। পাহাড়ের ওপর অদ্ভুত গঠনের বাড়ী। লাল রঙের প্রাসাদ, ছাদ সোনালি রঙে রঞ্জিত। সূর্যকিরণে ঝলমল করে।



দলাইলামার প্রাসাদ

পাষাণময় দেশ তিব্বতে চাষের উপযোগী সমভূমির অভাব। দেশে বন-সম্পদও নাই। পশুপালন এবং পশু-জাত দ্রব্যের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ ক'রেই লোকেদের জীবন-যাত্রা নির্বাহ হয়। দেশে খনিজ সম্পদের মধ্যে সোনা, সোহাগা ও লবণ আছে কিন্তু এ-সব আহরণের সুবন্দোবস্ত নাই। তিব্বতের আয়তন ৪ লক্ষ ৬৯ হাজার। লোকসংখ্যা ৩৭ লক্ষ অর্থাৎ কেবল কলিকাতা শহরেই সমগ্র তিব্বতের চেয়ে বেশী লোক আছে।

সিংকিয়াং

সিংকিয়াং চীনা তুর্কীস্থান নামেও পরিচিত। এটি চীনদেশের সর্ব-পশ্চিমের প্রদেশ। চীনের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সিংকিয়াং-এর মিল বিশেষ নাই। এখানকার ভূমি-প্রকৃতি ও জলবায়ুই তার প্রধান কারণ। পামীর থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রসারিত তিয়েনসান পর্বত-মালা সিংকিয়াংকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। উত্তরের উচ্চ মালভূমি অংশের নাম জুঙ্গেরিয়া। দক্ষিণের অংশ আয়তনে বড়। এর বেশীর ভাগ স্থান জুড়ে রয়েছে তাক্‌লামাকান মরুভূমি। উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ—তিন দিক থেকেই সিংকিয়াং পাহাড়ে-ঘেরা। পাহাড়ের চূড়া-গুলি বরফে আবৃত। বসন্তকালে বরফ যখন গলতে সুরু করে তখন বরফ-গলা জলে কতকগুলি নদী পুষ্ট হ'য়ে তাক্‌লামাকান মরুভূমির দিকে প্রবাহিত হয়। এদের কতক শুষ্ক মরুর বালির স্তরে শুকিয়ে যায়, কতক বা গিয়ে পড়ে লবণাক্ত হ্রদে। লবণ হ্রদের মধ্যে লবনর সুপরিচিত।

সিংকিয়াং প্রদেশ চীনের কাছে বিশেষ মূল্যবান, কারণ স্থান দুর্গম হ'লেও এখানে খনিজ সম্পদ রয়েছে প্রচুর কিন্তু যানবাহনের অসুবিধার জন্য বহির্জগতের সঙ্গে এর সহজ যোগাযোগ স্থাপন সম্ভবপর হয়নি। এ অঞ্চলে রেলপথ নাই, নৌচালনযোগ্য নদী নাই; একমাত্র বাহন হ'ল ঘোড়া, উট অথবা গরুর গাড়ি। ঘোড়া ও উটের পিঠে মাল বোঝাই ক'রে বণিকদল শত শত মাইল পথ অতিক্রম ক'রে থাকে।

সিংকিয়াংকে এক কথায় বলা যায় মরুভূমির দেশ যদিও বরফ-গলা নদীর জল মরুভূমির মধ্যে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবার আগেই তা দিয়ে সেচের কাজ ক'রে কিছু পরিমাণ ফসল ফলানোর ব্যবস্থা করা হয়। এখানে বৃষ্টিপাত নাই; তিন দিকে পর্বত-দিয়ে-ঘেরা দেশটি বিরাট পাখীর বাসার

মত। উত্তরে সাইবেরিয়া, পূর্বে চীনের কান্‌সু প্রদেশ ও গোবি মরুভূমি, দক্ষিণে তিব্বত ও ভারতের সীমান্ত, পশ্চিমে রাশিয়ার তুর্কীস্থান ও আফগানিস্থান। উরুম্‌চি (তিহোয়াফু) হ'ল রাজধানী কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য কাসগড়, ইয়ারখন্দ এবং খোটান-ই সমধিক প্রসিদ্ধ। সিংকিয়াং-এর জলবায়ু সমুদ্র থেকে বহুদূরে অবস্থিত অন্যান্য দেশের মতই—গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরম, শীতকালে তীব্র শীত। বসন্তকালে এখানে ঝড়ের মত প্রবলবেগে হাওয়া বয়; তখন ধূলির মেঘে সারা দেশ ঢেকে যায় এবং এই ধূলির আস্তরণ অনেক দিন পর্যন্ত বাতাসে ভেসে বেড়ায়।

জীবন-যাত্রা

জুঙ্গেরিয়া অঞ্চল চাষ-আবাদ ও লোকের বসবাসের পক্ষে উপযোগী নয়; কেবল যেখানে মরূদ্যান আছে কিংবা জলসেচের ব্যবস্থা ক'রে লোকেরা জমি চাষের উপযোগী ক'রে নিয়েছে সেখানেই আছে লোকবসতি। এই সব মরূদ্যান হ'ল ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র। বণিকের দল উটের পিঠে বিবিধ সামগ্রী বোঝাই ক'রে বর্শার সঙ্গে নিশান বেঁধে এক মরূদ্যান থেকে অন্য মরূদ্যানে যাতায়াত করে। খাদ্যশস্য ও অন্যান্য জিনিসের বিনিময়ে এরা এখান থেকে সংগ্রহ করে পশম, কম্বল, রঙিন পাথর, রেশম এবং তুলা। পাহাড়ের উপরকার দুর্গম পথ দিয়ে অনেক সময় যাত্রীদলকে চলতে হয়। এইভাবেই এরা কাশ্মীর ও রাশিয়ার তুর্কীস্থানের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য ক'রে থাকে। মরূদ্যানগুলি পরস্পর থেকে অনেক দূরে দূরে অবস্থিত এবং যাতায়াতের সহজ উপায় না থাকায় সমগ্র দেশের ওপর শাসন-ব্যবস্থা স্বভাবতঃই শিথিল।

দেশের বেশীর ভাগ লোক যাযাবর। পশুপালন তাদের প্রধান উপজীবিকা। ঘোড়া, উট, গরু, ছাগল নিয়ে লোকেরা দল বেঁধে পাহাড়ময় অংশে চরাতে যায়। শীতকালে তারা নেমে আসে সমভূমিতে।

বরফ-গলা জলে পাহাড়ের সানুদেশ ও মরুভূমির প্রান্তদেশ সবুজ ঘাসে ছেয়ে যায়। এই তৃণক্ষেত্র পশুচারণের পক্ষে খুবই উপযোগী। ক্ষীণস্রোতা নদী বালুর ওপর দিয়ে খুব বেশী দূর অগ্রসর হ'তে পারে না। মরুভূমির পিপাসা মিটাতে তা শুকিয়ে বালুর মধ্যে বিলীন হ'য়ে যায়।

যাযাবররা যখন গরু-ঘোড়া নিয়ে সপরিবারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানের উদ্দেশ্যে চলতে থাকে তখন মহা সোরগোল প'ড়ে যায়। স্বাস্থ্যবান কিশোর ও তরুণরা আগে আগে ঘোড়াগুলি চালিয়ে নেয়, বয়স্ক ব্যক্তিরা চালায় উটগুলি, মন্থরগতি ষাঁড়গুলি চালানোর ভার মেয়েদের ওপর, শিশুরা ঘোড়ার বা ষাঁড়ের পিঠে চ'ড়ে ছাগলের পাল খেদিয়ে নিয়ে চলে। উটের ছোট বাচ্চাগুলি সমান তালে চলতে পারে না ; তাই তাদের বেঁধে দেওয়া হয় উটের পিঠে। ছাগল-মেষ শাবক থলিতে ক'রে দেওয়া হয় ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে। এইভাবে পশুর বাহিনী নিয়ে, হল্‌দে ধূলির মেঘ উড়িয়ে যাযাবরগণ নূতন তৃণভূমির সন্ধানে চলতে থাকে। রাত্রিতে আস্তানা ফেলে বিশ্রাম করে সবাই। চামড়ার তাঁবু হ'ল এদের বাসগৃহ। ছাগ ও মেষের মাংসের বড় বড় টুক্‌রা লোহার শিকে বিঁধিয়ে আগুনে ঝল্‌সে নিয়ে খাদ্য বানায়।

দেশে গাছপালা খুবই কম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে নাই স্নিগ্ধ শ্যামলতা যা চোখকে তৃপ্তি দেয়। উচ্চ মালভূমি অঞ্চলে দিগন্তে দেখা যায় লাল রঙের পর্বতশৃঙ্গ—পাথরের রঙ লাল। তার ওপর বরফের স্তর সূর্যকিরণে ঝক্‌মক্‌ করে ; শুভ্র কুয়াসা বাতাসে ভেসে বেড়ায়, সময় সময় মনে হয় পাহাড়ের চূড়া থেকে সাদা নিশান উড়ছে যেন। কুয়াসা যখন মিলিয়ে যায়, নীল আকাশের নীচে শুভ্র তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গগুলি হীরার স্তূপের মত ঝলমল করতে থাকে। দেশটি চারদিক থেকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। যে সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে অন্য দেশে

যাতায়াত করা হয় তা বরফে আচ্ছন্ন থাকে। এর মধ্য দিয়ে হিমবাহ প্রবাহিত হয় ব'লে মানুষের পক্ষে চলাচল প্রায় অসম্ভব এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপজ্জনক। তুষার-পথ নামক গিরিপথটি এমনি ধরনের। দক্ষিণ দিকে আক্সু এবং কুল্ঝার মধ্যবর্তী গিরিপথটিই লোকে বেশী ব্যবহার করে—দুর্গম হ'লেও এ পথ দিয়েই বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ রাখতে হয়।

অধিবাস

সিংকিয়াং প্রদেশের লোকসংখ্যা অল্প। কয়েকটি বিভিন্ন উপজাতির লোক নিয়ে জনসমষ্টি গঠিত—যেমন কাশ্‌গরি, কিরঘিজ, তরঞ্চি প্রভৃতি। এদের সকলকেই বলা হয় 'তুর্কী'। এদের বেশীর ভাগই মুসলমান। চীনদেশের অংশ হ'লেও চীনাদের চেয়ে পশ্চিম এশিয়ায় ইরাণীয়দের সঙ্গেই এদের দৈহিক সাদৃশ্য বেশী। তুর্কীরা সদাপ্রফুল্ল, সরলমনা। শিক্ষায় বা সভ্যতায় উন্নতি করার জন্য এদের কোন আগ্রহ নাই। সরল চিরাচরিত জীবন-যাপন করতে পারলেই এরা খুশি—বর্তমানের যান্ত্রিক সভ্যতা বা শাসন-ব্যাপারে ক্ষমতার প্রতি এদের কোন মোহ নাই।

তুর্কীরা মেয়ে-পুরুষ সকলেই ঘোড়ায় চড়তে খুব পটু। ঘোড়া, গাধা, ষাঁড়—সব-কিছুর পিঠেই এরা চড়তে অভ্যস্ত। এদের ঘরগুলি নীচু, মাটি দিয়ে তৈরি। এতে জানালা নাই, কোন রকম কারুকার্যের দিকেও লোকেদের ঝোঁক নাই। যেমন-তেমন ঘর হ'লেই হ'ল। পল্লী অঞ্চলের লোকেদের ঘরের সঙ্গে আছে বারান্দা ও উঠান। বাড়ী প্রায়ই গাছপালা দিয়ে ঘেরা। গ্রীষ্মকালে মেয়েরা গাছের নীচে ব'সে ব'সে কাপড় বোনে। এ কাপড় মোটা হ'লেও এ দিয়েই হয় তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ।

হাটের দিন তুর্কীদের কাছে একটি বিশেষ আনন্দের দিন। ভাল জামা-কাপড় প'রে ঘোড়া, গাধা বা ষাঁড়ের পিঠে চ'ড়ে সবাই এসে জমা হয় হাটে। ছেলেমেয়ে, বয়স্ক ব্যক্তির ভিড় জমে যায়। পুরুষেরা পরে পায়জামার মত লম্বা প্যাণ্ট, দীর্ঘ রঙিন কোট। কোট হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে পড়ে, কোমরে বাঁধে ফিতা। কোটের হাতা বেশ লম্বা; আস্তিন গুটিয়ে রাখে, খুলে দিলেই হাত-ঢাকা দস্তানার কাজ চলে। মাথায় পরে সূতী বা মখমলের টুপি; পশমী সূতা দিয়ে তার কিনার বোনা ও কারুকার্য-করা। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই টুপি পরে। শীতের দেশ। কাজেই সকলকেই জুতা ব্যবহার করতে হয়। হাঁটু-পর্যন্ত-ঢাকা চামড়ার জুতা—যেন চামড়ার মোজা—তার ওপর পরে চামড়ার চটি। ঘরে ঢোকার সময় চটিজুতা বাইরে রেখে দেয়, পায়ে থাকে কেবল চামড়ার ঢাকনি।

মেয়েদের সৌখিন পোষাক হ'ল সুন্দর সূচিকাজ-করা রেশমের বুক-আঁটা কোট। তার ওপর পরে লম্বা কোট এবং সকলের ওপর থাকে সাদা মসলিনের আলখাল্লা, তা ঝুলে পড়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত। স্ত্রীলোকদের মধ্যে ঘোমটা পরার প্রচলন আছে। মিহি সূতার জালি-করা কাপড়, তাতে নক্সার কারুকার্য-করা। মুখের ওপর দিয়ে ঝালরের মত তা ঝুলিয়ে রাখে। গ্রীষ্মের দিনে গরম যখন খুব বেশী বোধ হয়, সবাই পরে সাদা ঢিলা আলখাল্লার মত পোষাক।

সিংকিয়াং শীতল মরুভূমির দেশ হ'লেও এখানে লোকেদের খাদ্যদ্রব্য অপ্রচুর নয়। আটার রুটি, মাংস, ভাত, আলু, পেঁয়াজ ও নানা সব্জী তরকারি মেলে। চা লোকেদের প্রধান পানীয়। চায়ের দোকানগুলি খুবই জনপ্রিয়। দোকানী চীনামাটির পাত্রে ক'রে চা গ্রাহকদের দেয়, চায়ে চিনি দেওয়া হয় কিন্তু দুধ দিবার রীতি নাই। চায়ের সঙ্গে ছোট ছোট আকারের পিঠা খুব পছন্দসই খাদ্য। চায়ের

দোকানগুলিতে যখন গ্রাহকের খুব ভিড় জমে, দেখা যাবে দোকানী চা বিক্রি ক'রে পয়সা নিয়ে রাখছে তার মুখে। মুখ যেন তার পয়সার থলে! মুখ থেকে পয়সা বের ক'রে গ্রাহককে ভাঙানিও দিচ্ছে!

লোকেদের খাদ্যের মধ্যে মাংস একটি প্রধান উপকরণ। ভেড়ার মাংস ও গোমাংসই বেশী ব্যবহৃত হয়; ঘোড়ার মাংস এদের কাছে খুব উপাদেয় এবং এর দামও বেশী। বিশেষ উৎসবের সময় ঘোড়ার মাংস আর পোলাও হ'ল তুর্কীদের নাম-করা খাবার। এর সঙ্গে থাকে ঘোড়ার দুধ। ঘোড়ার দুধ বাসি ক'রে ঈষৎ পচিয়ে নিয়ে ঘোড়ার চামড়ার থলিতে ভ'রে ঝাঁকিয়ে ঘোল টানার মত টেনে তা দিয়ে তৈরি করা হয় অতি উপাদেয় পানীয়। একে বলে কুমিস্। খাবারের সঙ্গে তুর্কীরা নানাজাতীয় ফল খেয়ে থাকে। তরমুজ, আপেল, ন্যাসপাতি, আখরোট, বেদানা, কুল প্রভৃতি এদেশে জন্মে প্রচুর, লোকেরা খায়ও প্রচুর।

তুর্কীরা আমোদপ্রিয় জাতি। নানা ধরনের খেলাধূলার প্রচলন আছে এদের মধ্যে, তবে সবচেয়ে আনন্দদায়ক খেলা হ'ল 'বাইগু'। খেলোয়াড় হয় একশো থেকে দেড়শো জন। সবাই ঘোড়ায় চ'ড়ে এ খেলায় অংশ গ্রহণ করে। নূতন ধরনের বল খেলা; বল হ'ল একটি ছাগল বা ভেড়ার মৃতদেহ। সব খেলোয়াড় ঘোড়ায় চ'ড়ে এক লাইনে দাঁড়ায়, এক ব্যক্তি মৃতদেহের 'বলটি' নিয়ে দেয় ছুট। অন্য সবাই তাকে ধাওয়া করে। যে বলটি কেড়ে নিয়ে প্রধান অতিথির কাছে হাজির করবে তারই হবে জিৎ। কাড়াকাড়ি, হুড়াহুড়ি, ঘোড়া থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া সবই চলে। দর্শকদের উল্লাস-ধ্বনি আর খেলোয়াড়দের দাপাদাপিতে মাঠ মুখরিত হ'য়ে ওঠে। খেলার শেষে হয় পান-ভোজন, নৃত্য ও সঙ্গীত।

তাক্‌লামাকান মরুভূমি

একদিকে তারিম নদী অন্য দিকে খোটান দরিয়া। এর মধ্যে বিস্তীর্ণ বালির সমুদ্র। উঁচুনীচু অসংখ্য বালিয়াড়ির স্তূপ—ষাট থেকে তিন হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু। সমগ্র অঞ্চলে যেন কোন মহাশিল্পী শিশু ছোট-বড় বালির ঢিপি রচনা ক'রে খেলায় রত রয়েছে। যখন প্রবলবেগে ঝড় বইতে থাকে রাশি রাশি বালি শোঁ শোঁ ক'রে উড়তে উড়তে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে চলে। নীচু স্থান হয় উঁচু, উঁচু স্থান সমতল হ'য়ে পড়ে। এমনি চলমান বালির রাজ্যে জীবজন্তু বাস করতে পারে না। দেশ-আবিষ্কারক স্বেন হেডিন তাক্‌লামাকান মরুভূমি পার হ'য়ে আসার সময় প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেয়েছিলেন। এক সময়ে এ অঞ্চলে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল ; তার চিহ্ন এখনও ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে। এ অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতা বালিস্তূপের নীচে চাপা প'ড়ে গেছে। আস্তে আস্তে মানুষকে পরাভূত ক'রে প্রকৃতি সেখানে বিস্তার করেছে তার নির্মম আধিপত্য। এককালে যা ছিল জনবহুল সমৃদ্ধ স্থান, এখন সেখানে জীবন্ত মানুষের চিহ্নমাত্র নাই।

মঙ্গোলিয়া

হলদে রঙের বালুময় অঞ্চল। দূরে নীল মেঘের মত পাহাড়ের সারি, সূর্যকিরণ উজ্জ্বল নীল আকাশ থেকে ঝ'রে পড়ে। নির্মল আবহাওয়ায় এই হ'ল মঙ্গোলিয়ার রূপ। পাহাড়ময় প্রান্তরে ছোট ছোট ঝোপঝাড়, কোথাও ছোট ঘাসে-ঢাকা মাঠ—এতে ঘোড়া, ছাগল, উট, ভেড়া চ'রে বেড়ায়। দিনরাত্রির তাপমাত্রায় পার্থক্য অনেকখানি। দুপুরে উত্তাপ হয় ১৪০ ডিগ্রী, রাত্রিতে তা ৭০ ডিগ্রীতে নেমে আসে। পাহাড়ময়

প্রদেশ থেকে মরুভূমি অঞ্চলই বেশী ভয়ংকর। তীব্র বালির ঝড় মাঝে মাঝে ভীষণ বেগে শোঁ শোঁ শব্দ ক'রে ছুটে আসে। তার কবলে পড়লে পথিকের নিস্তার পাওয়া ভার; মুহূর্তের মধ্যে তার শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে যাবে। মরুভূমির বালির আঁধিকে অধিবাসীরা বড়ই ভয় করে।

মঙ্গোলিয়ায় বসন্তকালে বৃষ্টি হয়। তখন কোন কোন অঞ্চলে সবুজ ঘাস জেগে ওঠে। কিন্তু পশ্চিম মঙ্গোলিয়ার মাটি লবণাক্ত ও বালুময়। এই অঞ্চলে অবস্থিত রয়েছে গোবি মরুভূমি। একে বলা হয় শুক্‌না সাগর। এককালে এই নিম্নভূমি জুড়ে ছিল সমুদ্র। সমুদ্র শুকিয়ে গেছে কিন্তু মাটিতে রয়েছে লবণ আর স্থানে স্থানে রয়েছে নীচু খাদ। গোবি মরুভূমির গড় উচ্চতা হ'ল চার হাজার ফুট। মঙ্গোলিয়ার তৃণ অঞ্চলে ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া প্রভৃতি পালিত পশুপালনের সুবিধা। চাষ-আবাদের চেয়ে পশুপালনই মঙ্গোলীয়দের জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায়। মরুভূমি অঞ্চলে গাছ মোটেই দেখা যায় না। পূর্ব-পশ্চিমে হাজার মাইলের মধ্যে এবং উত্তর-দক্ষিণে পাঁচশো থেকে ছয়শো মাইলের মধ্যে গাছ চোখে পড়ে না, ক্বচিৎ দেখা যায় ছোট ঝোপঝাড়। নদী নাই, ঝরণা নাই; জল মেলে কেবল কূয়াতে আর কদাচিৎ মেলে ছোট ছোট হ্রদ। এইরূপ রুক্ষ ঊষর প্রান্তরের মধ্য দিয়ে বাণিজ্যের সম্ভার নিয়ে চলাচলের পথ রয়েছে। এর দৈর্ঘ্য হবে সাড়ে তিন হাজার মাইল। অতি প্রাচীনকাল থেকে লোকেরা এই পথ ব্যবহার ক'রে আসছে। চেঙ্গিস্ খাঁ, তৈমুরলঙ্গ, তাঁদের দুর্ধর্ষ সৈন্যদল নিয়ে এই পাহাড় ও মরুময় পথ অতিক্রম ক'রে ইউরোপ ও এশিয়ায় হানা দিয়ে মানুষের শান্তিপূর্ণ জীবন তছনছ ক'রে দিয়েছিলেন। সে পথ দিয়ে এখনও উট, ঘোড়ার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে নিয়ে ধূলির মেঘ উড়িয়ে বণিকের দল যাতায়াত করে।

মঙ্গোলিয়া বিশাল দেশ। আয়তন প্রায় ২০ লক্ষ বর্গমাইল। কিছুটা চীনদেশের অধিকারে। দেশে লোকসংখ্যা খুবই কম। দেশটিকে কতকগুলি পাহাড় চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। উত্তরে সাইবেরিয়া, দক্ষিণে সিংকিয়াং। পশ্চিম মঙ্গোলিয়ার ভিতর দিয়ে গেছে আলতাই পর্বতমালা। পাহাড়-পর্বত দিয়ে ঘেরা থাকায় দেশের মধ্যে যে বায়ু-প্রবাহ আসে তা শুক্‌না ঝর্‌ঝরে—জলীয় বাষ্প যা-কিছু বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসে তা থেকে যায় পাহাড়-পর্বতের চূড়ায় তুষাররূপে। কাজেই দেশের মধ্যভাগে বৃষ্টিপাত খুবই কম।



মঙ্গোলিয়ার তৃণ অঞ্চলে ইয়াকের দল

আলতাই পর্বত অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে খনিজ পদার্থ আছে, আর এই অঞ্চল খুবই উর্বর। পাহাড়ের গায়ে দেখা যায় মূল্যবান কাঠ—পাইন, লার্চ, বার্চ প্রভৃতির বন। গ্রীষ্মকালে সবুজ সতেজ ঘাস ও বিচিত্র বর্ণের ফুলে পাহাড়ের সানুদেশ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছেয়ে যায়। ধূসর পরিবেশের মধ্যে এ সময়ে সজীবতা ও সৌন্দর্যের অপরূপ ছাপ লাগে প্রকৃতির বুকে।

মঙ্গোলিয়ার ভূমি কৃষিযোগ্য নয়। কেবল গ্রীষ্মকালে যে সামান্য বৃষ্টির ধারা পড়ে তাতে ফসল ফলানোর মত রস মাটিতে সঞ্চারিত হয় না। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তৃণভূমির সৃষ্টি হয়। কাজেই এদেশের অধিবাসী মঙ্গোল, কাল্‌মুক, চীনারা এই তৃণ অঞ্চলে পশুপালন ক'রে জীবিকা নির্বাহ করে। মরু অঞ্চলের কোথাও চাষ-আবাদ করা সম্ভবপর হয় না। প্রায় দশ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত স্থানে কেবল ভেড়া, ইয়াক, গাধা, উট, ঘোড়া ও বন্য হরিণ প্রতিপালিত হয়। তৃণ অঞ্চলে দলে দলে বুনো ঘোড়াকে চরতে দেখা যায়।

মঙ্গোলদের পোষাক-পরিচ্ছদ ঢিলা আলখাল্লার মত, হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত। রঙিন আলখাল্লার নীচে সার্ট ও গরম কাপড়ের আস্তরণ। শীতকালে এগুলির পরিমাণ হয় বেশী। কারণ তখন শীত হয় অত্যন্ত তীব্র। মাথায় পরে পশমী টুপি, ধার উল্টানো ; চূড়া উঁচু ও রঙিন। সবাই পরে হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ চামড়ার জুতা। পায়ের মাপের চেয়ে জুতা অনেকখানি বড়। কারণ যতই বেশী শীত পড়তে থাকে লোকেরা পশমী মোজার সংখ্যাও ক্রমে বাড়াতে থাকে—এক মোজার ওপর আরেকটি, তার ওপর আরেকটি, এমনি। মেয়েদের পোষাকও পুরুষের মতই। দীর্ঘ চুল তারা বেণী ক'রে বেঁধে মাথার ওপর উল্‌টিয়ে রাখে। বেণীর আগায় বাঁধে রূপার গহনা, রঙিন পাথরের দানা। কানে ও গলায় রঙিন মূল্যবান পাথর ও গহনা পরার দিকে মেয়েদের খুব ঝোঁক।

মঙ্গোলদের মধ্যে মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা অদ্ভুত ধরনের। মৃত-দেহের কবর না দিয়ে এগুলি এরা ফাঁকা জায়গায় কুকুর দিয়ে খাওয়ানোর জন্য ফেলে রাখে। কয়েক দিনের মধ্যে যদি তা কুকুরে না খায়, তবে এরা ধ'রে নেয় যে, লোকটি জীবিত অবস্থায় এমনি দুষ্ট-প্রকৃতির ছিল যে কুকুর পর্যন্ত তার মাংস খেতে রাজী না! মৃত ব্যক্তির

পরিবারবর্গের ওপর শাস্তি দিয়ে এর প্রায়শ্চিত্ত করা হয় যাতে মরার পরে এদেরও ঐ রকম দশা না ঘটে !

মঙ্গোলিয়ায় অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা বড়ই কঠোর। অপরাধী ব্যক্তিকে একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে ভ'রে রাখা হয়। বাক্সটি লম্বায় পাঁচ ফুট, উঁচু দুই ফুট, চওড়া দুই ফুট। এরূপ মাপের বাক্সের মধ্যে দাঁড়ানো অসম্ভব। লম্বা হ'য়ে শুয়ে থাকাও কঠিন। কয়েদীকে সর্বদা হামাগুড়ি দেওয়ার মত অস্বস্তিকর অবস্থায় কাটাতে হয়। এই অবস্থায় কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে শাস্তির মেয়াদ কম-বেশী হ'য়ে থাকে। দিনের মধ্যে কয়েক মিনিটের জন্য কয়েদীকে বাক্সের বাইরে আনা হয়। খাবার দেওয়া হয় বাক্সের এক পাশে ছোট একটি ফুটা দিয়ে। রাত্রিতে শীত-নিবারণের জন্য আসামীকে পরতে দেওয়া হয় একটি ভেড়ার চামড়ার কোট। শাস্তি ভোগ ক'রে মুক্তিলাভ করার পর প্রায়ই দেখা যায় কয়েদী বিকলাঙ্গ হ'য়ে গেছে।

রাজনৈতিক দিক থেকে মঙ্গোলিয়া দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত—অন্তর্মঙ্গোলিয়া ও বহির্মঙ্গোলিয়া। রাশিয়া ও চীনের প্রভাব পড়েছে দেশটির ওপর। বহির্মঙ্গোলিয়া স্বাধীন মঙ্গোলিয়া প্রজাতন্ত্র-রূপে পরিচিত হ'লেও রাশিয়ার প্রভাব এখানে খুব বেশী। অর্থনৈতিক ব্যাপারে এবং সন্ধির শর্ত অনুসারে বহির্মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বিদ্যমান। এখানে সোভিয়েট সৈন্যও মোতায়েন রাখা হয়।

সিংহল

ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত থেকে কিছুদূরে ভারত মহাসাগরের মধ্যে প্রাকৃতিক শোভার নিকেতন সিংহল দ্বীপ। চারিদিকে ভারত মহাসাগরের সবুজ জলরাশি, সূর্যকরোজ্জ্বল তীরভূমি তাতে সারি সারি অজস্র নারিকেল গাছ। কূর্মপৃষ্ঠের মত দেশের মধ্যভাগ উঁচু পাহাড়ময়। অসংখ্য নদী-নালা পাহাড়ের উচ্চ অংশে উৎপন্ন হ'য়ে সমুদ্রে এসে পড়েছে। এর মধ্যে চারিটি বেশ বড়। মহায়েলি গঙ্গা ২০৬ মাইল দীর্ঘ। কিন্তু নদীগুলিতে দেশীয় নৌকা ছাড়া অন্য কোন যান চলাচল করতে পারে না। দ্বীপটির আয়তন ২৫,৩৩২ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৬৭ লক্ষ। সিংহল বিষুবরেখার উত্তরে ৬ ডিগ্রী অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। এখানে সূর্যতাপ প্রচণ্ড; উষ্ণতা খুব বেশী হওয়ার কথা কিন্তু সমুদ্রবেষ্টিত হওয়ায় সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাবে উষ্ণতা কমে যায়। কলোম্বোর উষ্ণতা সারা বছরই ৮০ ডিগ্রীর কাছাকাছি থাকে। দেশের ভিতরের দিকে উচ্চ পাহাড়ময় অংশে তাপ অনেক কম। সমুদ্রের মধ্যে অবস্থানের ফলে সিংহলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু যেমন বৃষ্টি নিয়ে আসে তেমনি উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুও আনে প্রচুর বর্ষণ। দেশে তাই দুইবার বর্ষাকাল। ভূমির উর্বরতা খুব বেশী; গাছপালা সতেজ এবং খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে।

কৃষি, শিল্প

সিংহলের সমৃদ্ধি প্রধানতঃ কৃষির ওপরই নির্ভর করে; শিল্পের প্রসার এতদিন বিশেষ ছিল না, সম্প্রতি শিল্পায়ন সুরু হয়েছে। দেশের তিন ভাগের দুই ভাগ ভূমি বনে আবৃত। বন থেকে সেগুন, ইবোনি প্রভৃতি মূল্যবান কাঠ সংগৃহীত হয়। নারিকেল এদেশের প্রধান ফসল। দশ লক্ষ একরের বেশী জমিতে নারিকেলের বাগান। ফল ধরে প্রচুর।

দেশের চাহিদা মিটিয়ে নারিকেল তেল, শুক্‌না নারিকেল শাঁস, নারিকেল মালা, ছোবড়া যথেষ্ট পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। দেশের সর্বত্র নারিকেল ও নানাজাতীয় পামগাছ দেখা যায়। নারিকেল ও পামপাতা দিয়ে গরীব লোকদের ঘরের ছাউনী হয়। নারিকেলের সঙ্গে সিংহলীর জীবন নিবিড়ভাবে জড়িত।

সিংহলীদের প্রধান খাদ্য ভাত। দেশের প্রায় ৯ লক্ষ একর জমিতে ধান চাষ হয় কিন্তু যে পরিমাণ ধান জন্মে তাতে দেশের চাহিদা মেটে না। বাইরে থেকে বিশেষ ক'রে ব্রহ্মদেশ থেকে অতিরিক্ত চাউল আমদানি করতে হয়। ধান-চাষের জন্য অনেক কাল আগে থেকেই বৃষ্টির জল ধ'রে রাখার উপযোগী জল-রক্ষণাগার স্থানে স্থানে তৈরি করা হয়েছিল। এগুলি এখনও ধানের জমিতে জল-সরবরাহের জন্য ব্যবহার করা হয়।

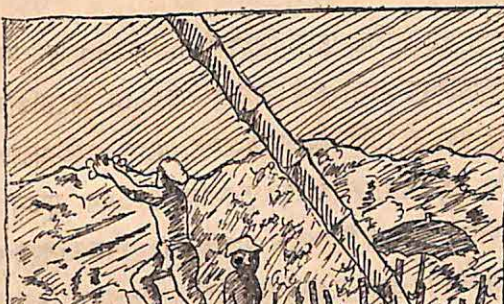


সিংহলের চা সংগ্রহ

পাহাড়ের গায়ে এবং উপত্যকা ভূমিতে রবার চাষ হয়। এ ছাড়া চা সিংহলের একটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ১৯৫০ সালে ৭৫ কোটি সাড়ে ১৬ লক্ষ টাকার চা এবং ৪০ কোটি সাড়ে ৫৪ লক্ষ টাকার রবার উৎপন্ন

হয়েছিল। প্রায় সবগুলি চা-বাগান এবং বেশীর ভাগ রবার বন ইংরাজ কোম্পানির হাতে।

সিংহল সরকার দেশের মধ্যে কিছু কিছু শিল্প-কারখানা গ'ড়ে তুলেছেন —যেমন প্লাই-উড, চামড়ার জিনিস, কাগজ, কাচ, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ-পত্র প্রভৃতি তৈরির ব্যবস্থা। বস্ত্রশিল্প, ইস্পাত তৈরির



সিংহলে মূল্যবান রঙিন পাথর তোলা হচ্ছে

কারখানা, উৎকৃষ্ট নারিকেল তৈল তৈরির কারখানা ও জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা অনুসারে দেশে বৃহৎ যন্ত্রশিল্প স্থাপনের চেষ্টা চলেছে।

সিংহলের মূল্যবান রঙিন পাথর বিখ্যাত। মরকত মণি—নীল ও হলদে, চন্দ্রপাথর, লাল চুনি, গাঢ় সবুজ পাথর, উজ্জ্বল নীল ও বাদামী বিবিধ রঙের উৎকৃষ্ট পাথর অলংকার সজ্জায় বিশেষ উপযোগী। গর্ত খুঁড়ে পাথর কেটে কেটে তুলে পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে তার ভিতর থেকে দামী পাথর বাছাই ক'রে নেওয়া হয়।

অধিবাসী

বর্তমান বাসিন্দাদের বেশীর ভাগ সিংহলী। অনেক যুগ আগে বাঙালী রাজকুমার বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় ক'রে এর নাম দিয়েছিলেন সিংহল। সেই সময় যে-সব বাঙালী বিজয়সিংহের সঙ্গে অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা সেখানে গ'ড়ে তুলেছিলেন এক নূতন উপনিবেশ। বর্তমান সিংহলীরা তাঁদেরই স্বজন বংশধর। বিজয়সিংহ গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। এর পরে দক্ষিণ ভারত থেকে তামিলদের অভিযান হয়। তামিলরা কয়েক শতাব্দী সিংহলে আধিপত্য করে। সিংহলীরা উত্তর অংশ তামিলদের ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণ অংশে স'রে যায়। এখনও সিংহলের উত্তর অংশে তামিল এবং দক্ষিণ অংশে সিংহলীরা প্রধান।

১৫০৫ সালে পর্তুগীজরা সিংহলের পশ্চিম উপকূল অধিকার ক'রে কতকগুলি সুরক্ষিত উপনিবেশ স্থাপন করে। এর প্রায় দেড়শো বছর পরে ওলন্দাজরা পর্তুগীজদের বিতাড়িত ক'রে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে। সর্বশেষে আসে ইংরাজরা। ১৭৯৬ সালে ইংরাজ সৈন্য ওলন্দাজদের কাছ থেকে সিংহল কেড়ে নেয়। সিংহল ইংলণ্ডের উপনিবেশ হিসাবে শাসিত হ'তে থাকে। অবশেষে ১৯৪৮ সালে সিংহল স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতের মত সিংহলও বৃটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থের অন্তর্ভুক্ত থেকে দেশকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলার চেষ্টা করছে।

বাঙালী এবং দক্ষিণ ভারতের লোকেদের সঙ্গে সিংহলের অধিবাসীদের দৈহিক আকার ও পোষাক-পরিচ্ছদে অনেক মিল আছে। বেশীর ভাগ

লোকই বৌদ্ধ। সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা সিংহলে প্রথম বৌদ্ধধর্মের বাণী বহন ক'রে নিয়ে যান। সিংহলের দন্তমন্দির—বুদ্ধদেবের একটি দাঁত এখানে যত্নসহকারে রক্ষিত আছে—একটি পবিত্র দর্শনীয় বস্তু। সিংহলে কিছুসংখ্যক মুসলমান এবং খ্রীষ্টানও আছে।

সিংহলের প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শককে মুগ্ধ করে। নীল পাহাড়ের গায়ে থরে থরে সবুজ বন; উপকূলে সুদৃশ্য নারিকেল-কুঞ্জ; পাহাড়ের গা ব'য়ে রূপালি নদীর ধারা কুলুকুলু ঝংকার তুলে ছুটে নেমে আসে। বনে আছে বিচিত্র বর্ণের পাখী। সুন্দর এই দ্বীপটিকে কবি মহাসাগরের কপালে একটি টিপ ব'লে বর্ণনা করেছেন। সিংহলের বিবরণ দিতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন ঃ

ওই সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ!
ওই চন্দন যার অঙ্গের বাস, তাম্বুল যার কেশ!
যার উত্তাল তাল-কুঞ্জের বায়—মন্থর নিশ্বাস!
আর উজ্জ্বল যার অম্বর, আর উচ্ছল যার হাস!

সমাপ্ত